সতীনাথ ভাদুড়ী
জীবন ও সাহিত্য

শ্রীঅরূপকুমার ভট্টাচার্য এম. এ., পি. এইচ. ডি.
অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলিকাতা

: পরিবেষক :
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা ১৩৬৬

স্বত্ব : গ্রন্থকার

প্রকাশক :
শ্রীরুশো মিত্র
সাহিত্য প্রকাশ :
৯১ জেমস্ লঙ্ সরণি
[পূর্বতন, সত্যেন রায় রোড]
কলিকাতা ৩৪

প্রচ্ছদ :
শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী রেখা দে
শ্রীহরি প্রিণ্টার্স
১২২/৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা ৪

পরমপূজনীয় পিতৃদেব

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

॥ পরিচায়িকা ॥

বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ী প্রেরণায় ও পদ্ধতিতে ছিলেন অনেকটাই প্রচলিত রীতি থেকে মুক্ত। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা সাত। এই সাতখানি উপন্যাসেই সতীনাথ বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূরীদের স্বভাব থেকে সরে এসেছেন।

পূর্বাগত ধারার থেকে আলাদা হয়ে নতুন কিছু করার চেষ্টা আগে কেউ করেননি তা নয়। কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে নতুনত্বের আকাঙ্ক্ষা উগ্রভাবেই দেখা দিয়েছিল। সে জন্য তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে গিয়েছেন এবং সেই অনুপাতেই অনুকরণ করতে গিয়েছেন য়ুরোপীয় কন্টিনেন্টাল সাহিত্য। এই অনুকরণের মধ্যে দুদিকই ছিল। বাস্তবকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা এবং মুক্ত জীবনচেতনার রোমান্টিক ভাবাবেগ। তাঁদের মধ্যে থেকে শক্তিশালী কয়েকজন লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই চতুর্থ দশকের লেখক। দুজনের লেখাতেই ছিল আঞ্চলিক বাস্তবতার ছাপ। একজন রাঢ় অঞ্চলের, আর একজন পদ্মা-পারের। উপন্যাস মাত্রেই একটা কোনো সমাজ বা সমাজস্থ পরিবারকে নিয়ে লেখা হয়। সেই অর্থে উপন্যাস মাত্রেই কোনো না কোনো অঞ্চলের ছাপ পড়বেই। কিন্তু সেই অঞ্চলের জনজীবনগোষ্ঠী ও ভৌগোলিক প্রকৃতি উপন্যাসে প্রতিফলিত না হলে উপন্যাসকে ঠিক আঞ্চলিক বলা যায় না। তারাশঙ্কর-মানিকের উপন্যাসে [বলা বাহুল্য মানিকের সব উপন্যাসের কথা হচ্ছে না] জনজীবন ও ভৌগোলিক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ দুজনের আঞ্চলিক উপন্যাস সুপরিচিত। সতীনাথ ভাদুড়ী লিখেছেন এদের পরে--অর্থাৎ এদের লেখক জীবনের উত্তরার্ধে। তাঁর উপন্যাস বিশেষ ভাবেই আঞ্চলিকতায় চিহ্নিত। কিন্তু সে বাংলাদেশের কোন অঞ্চল নয়। বিহারের পূর্ণিয়া তাঁর উপন্যাসের পটভূমি। বিশেষ করে ঢোঁড়াইচরিত মানস তো জনজীবনেরই কথা।

সতীনাথের আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজের। তাঁর উপন্যাসে নানা চরিত্রের ভীড়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আগষ্ট আন্দোলনের ফলে জনজীবনে যে সাড়া এসেছিল, সেটা কোনো রোমান্টিক কল্পনা নয়। তখন সাম্যবাদী আন্দোলন জোরালো নয়। গান্ধীবাদী আন্দোলনই জোরালো। তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের জনজীবনেও যথেষ্ট পার্থক্য। প্রথম যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া যত প্রত্যক্ষ ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া। রাজনৈতিক প্রভাব অনেক স্পষ্ট ও প্রখর। এই কারণেই সতীনাথের বিশিষ্টতা পূর্ববর্তী কারো সঙ্গে সমান সাদৃশ্যযুক্ত নয়। বিহার অঞ্চলের জীবনে যুগচেতনার নির্দিষ্ট, স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ রূপ দিয়েছেন সতীনাথ। এই অঞ্চলকে উপন্যাসে পটভূমি

রূপে গ্রহণ করায় সতীনাথের যতখানি অভিনবত্ব, উপন্যাসে তাকে রূপায়িত করতেও অভিনবত্ব কোন অংশেই কম নয়। এখানেও তাঁর প্রতিভার পরিচয়। মননশীল ঔপন্যাসিক তিনি। উপন্যাস প্রকরণে তিনি যথার্থ আধুনিক।

পূর্বতন কালে ছিল প্লটের অত্যাবশ্যকতা। সে আবশ্যকতা ক্ষয় পেয়ে এসেছে। তাঁর বিরল প্লট উপন্যাসগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে লেখকের মননে, সে মনন প্রকাশ পেয়েছে চেতনার প্রবাহ-রীতিতে। এই রীতি তাঁর উপন্যাসে এক্সপেরিমেণ্ট রূপে আসেনি, এসেছে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ প্রয়োজনে। তাঁর মনন সৌখিন ইন্‌টেলেকচুয়ালিজম নয়—বাস্তব সমাজজীবন সম্পৃক্ত। এসব দিক দিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী অনন্য।

'সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবন ও সাহিত্যে'র লেখক ডক্টর অরূপকুমার ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থের বিষয় নির্বাচনে নিঃসন্দেহে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সতীনাথ শক্তিশালী লেখক হিসেবে স্বীকৃত। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পাঠ্যতালিকায় তাঁর উপন্যাস ইতিমধ্যেই স্থান পেয়েছে। ক্লাসিক লেখক হিসেবে গণ্য হলেও সতীনাথের উপন্যাস নিয়ে সর্বাত্মক আলোচনা হয়েছে বলে জানি না। তাঁর গ্রন্থাবলী সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য স্মৃতি কথাও এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে; কিন্তু শ্রীগোপাল হালদার মশায়ের 'সতীনাথ : সাহিত্য ও সাধনা' বইখানার কথা মনে রেখেও বলতে হয় সতীনাথের উপন্যাস-গল্পের সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা এই প্রথম হল। ড· ভট্টাচার্য সতীনাথের জীবনের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সবই দিয়েছেন। সতীনাথের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য বুঝবার পক্ষে তথ্যগুলি খুবই মূল্যবান। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করে সতীনাথের স্বকীয়তা তিনি চমৎকার বুঝিয়েছেন। তাঁর আলোচনার ধারায় সতীনাথের অনুগ্র অথচ দৃঢ় অভিজাত লেখক-ব্যক্তিত্বটি ফুটে উঠেছে।

সতীনাথের সাহিত্যিক প্রবণতা লেখক স্পষ্ট করেই নির্দেশ করেছেন। সাহিত্যমূল্য নির্ণয়ে তিনি প্রধানত নিজের চিন্তার উপরেই নির্ভর করেছেন। অন্যের বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার অথবা অন্যের বক্তব্যের নির্বিচার পুনরুক্তি তিনি করেননি। করবার উপায়ও ছিল না। কারণ এ আলোচনা আগে তেমন হয় নি। তবু যে সাহস করে তরুণ সমালোচক নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—এজন্যে নিঃসন্দেহে তিনি সাধুবাদযোগ্য।

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ী একজন প্রতিভাশালী কথাশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেন নি। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে তিনি বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতার সঙ্গে বিশেষ কোন যোগাযোগ রাখেন নি। বিহারের পূর্ণিয়াতেই তাঁর জন্ম ও জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেছেন। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিও সেখানেই। সেখানকার মানুষজনের কথাই তাঁর সাহিত্যে বিধৃত হয়েছে। বাংলা ভাষার সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে তাঁর সাহিত্যের জগৎ এবং মানুষ অপরিচিত বলে তা তাঁর গ্রন্থপাঠের অন্তরায় হয়েছিল। কিন্তু মনের বৈদগ্ধ্যে, জীবনের রস সন্ধানে, তিনি বাংলার সমকালীন কথাসাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের সঙ্গে একাসনে বসতে পারেন। সুধীসমাজে তিনি 'লেখকদের লেখক' বলে পরিচিত হলেও তাঁর সাহিত্য-সাধনা মুষ্টিমেয় ক-একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তা সমীচীন নয়। সতীনাথ প্রথম রবীন্দ্র-পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনা এবং মূল্যায়ন এখনও হয়নি। আমি এ বিষয়টি নিয়ে সাধ্যমত গবেষণা করে তাঁর সাহিত্যের রসনিষ্কাসনের চেষ্টা করেছি। সাহিত্যিকদের জীবন-পর্যালোচনা ব্যতিরেকে তাঁদের সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন করা যায় না। এই কারণে আমি সতীনাথ ভাদুড়ীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করেছি।

সতীনাথ ভাদুড়ী নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই লিখে যান নি, এইজন্য তাঁর জীবনের তথ্য সংগ্রহ করতে আমাকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ-ব্যাপারে পূর্ণিয়ার কয়েকজন প্রবীণ অধিবাসী, বিশেষত শ্রীযুক্ত হরিদাস গুহ মহাশয় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। জন্মসূত্রে বিহারের বাসিন্দা এবং বিহারের গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত থাকার জন্য সেখানকার মানুষজন আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়, সতীনাথের সাহিত্যে সেই সমস্ত গ্রামেরই নিরক্ষর সমাজের মানুষ নানাভাবে ভীড় করে আছে। তাদের লৌকিক আচার, আচরণ, এমন কি, মুখের ভাষাটি পর্যন্ত তিনি সযত্নে তুলে ধরেছেন। সতীনাথের সাহিত্যের এই দিকটিও আমাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী কেবল আঞ্চলিক লেখক নন, তাঁর সাহিত্যে আঞ্চলিক বিশিষ্টতার সঙ্গে শাশ্বত মানুষের কথাই বিধৃত হয়েছে। তাঁর অল্প কয়েকটি উপন্যাস এবং বহু ছোটগল্প পাঠের মধ্যে আমার কাছে এই ধারণাই স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি কেবল একজন মননশীল লেখকই ছিলেন না, একজন জীবনরস-সন্ধানী সাহিত্যিকও ছিলেন। আমি সতীনাথের সাহিত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান নির্ণয় করবারও চেষ্টা করেছি।

এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করবার জন্য ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নানা ভাবে উৎসাহিত করেছেন, তাঁর তত্ত্বাবধান ব্যতীত এই গবেষণার কাজে হাত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না। এ-প্রসঙ্গে তাঁর সাহায্য বিশেষ-ভাবে স্মরণ করি। এ-ছাড়াও যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ নির্দেশাদি দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন তাঁরা হলেন আমার প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক কবি জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়, অগ্রজা সদৃশ অধ্যাপিকা ড. শ্রীমতী শিপ্রা লাহিড়ী, সহকর্মী অধ্যাপক নিখিলকুমার নন্দী, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে, অধ্যক্ষ ড. মিহিরকুমার চট্টোপাধ্যায়। এঁরা সবাই আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন। অধ্যাপক ড. ভবতোষ দত্ত এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন, তিনি আমার প্রণম্য। আমার সহপাঠী অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ড· হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছেন। আমার প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র নানাভাবে সাহায্য করায় গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। কল্যাণীয়া কুমারী মহুয়া মিত্র গ্রন্থের নির্ঘণ্ট রচনার কাজটি নিপুণ ভাবে করে দিয়ে আমার শ্রমলাঘব করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

সবশেষে অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে সদ্যপ্রয়াত পিতৃদেব বিশিষ্ট লোক-সংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই, আমার এই সামান্য পূজোপচার তাঁরই পাদপদ্মে নিবেদিত হল।

৩২ বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, অরূপকুমার ভট্টাচার্য

কলিকাতা ৭০০০৩৪।

রথযাত্রা, ১৩৯১

সূচী

'...যতদূর জানা গিয়াছে এই উপন্যাসই ['জাগরী'] গ্রন্থকারের প্রথম প্রকাশিত রচনা। আমাদের বিনীত অনুরোধ, জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসাইয়া তিনি যেন অতি শীঘ্র দ্বিতীয় রাজনৈতিক উপন্যাস শুরু না করেন। সে অবসরে রাজনৈতিক জগতের বিভিন্ন কর্ম-প্রণালী ও তাহাদের দার্শনিক ভিত্তি অন্তরঙ্গ ভাবে পর্যালোচনা করিলে তিনি অধিকতর লাভবান হইবেন ও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করিতে সমর্থ হইবেন। গুণী লেখক সর্বদাই নিজের অতীত কীর্তিকে অতিক্রম করিতে সচেষ্ট থাকেন।'

নীরেন্দ্রনাথ রায়।

'পরিচয়' : ভাদ্র ১৩৫৩]

সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ জীবন ও সাহিত্য

প্রথম অধ্যায়

জীবনী

॥ ক ॥

বনফুল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ী অভিমত প্রকাশ করেছিলেন…'লেখা থেকে লেখকের ব্যক্তিগত চরিত্র বা রুচি সম্বন্ধে কোনো ধারণা করে নেওয়া ভুল, জানি; কিন্তু আবার না করেও পারি না।'…[১]

সাধারণভাবে কবি এবং সাহিত্যিকদের জীবন বিধৃত থাকে তাঁর রচনার মধ্যে। নিজের বিষয়ে যাঁরা নীরব থাকতে ভালোবাসেন, নিভৃতে সাহিত্য সাধনা করেই যারা তৃপ্তি পান, জ্ঞান-তাপস থেকে আত্মমগ্ন সাধনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে যান, এমন মানুষ সাহিত্য ক্ষেত্রে সুলভ নয়; সতীনাথ ভাদুড়ী এমনই একজন মানুষ ছিলেন, যিনি নিজের সম্পর্কে খুব কম কথাই বলেছেন, তাঁর ডায়েরিতেও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বেশী নেই। বন্ধুবান্ধব এবং পরিজনের মধ্যে থেকেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছিলেন।

'পূর্ণিয়া জেলা স্কুল শতবার্ষিকী' সংখ্যায় প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে রচিত স্মৃতিকথায় সতীনাথ লিখেছিলেন…'আমি মরে যাবার দেড় শ' বছর পরে, আমার পোঁতা গাছ স্কুলের সৌন্দর্য বাড়াবে, এ ভাবে ভাবতে পারেন কজন শিক্ষক? জ্ঞান, সুরুচি, দূরদৃষ্টি, কর্তব্যনিষ্ঠা ছাড়াও, এর জন্য দরকার হয় আত্মবিলোপনের ক্ষমতার।'[২] এই আত্মবিলোপনের সাধনায় তিনি নিজে আজীবন মগ্ন ছিলেন।

কিন্তু কোনো একটি বিশেষ রচনায় ব্যক্তি সতীনাথ প্রচ্ছন্ন থাকলেও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যান নি। তাঁর সমগ্র রচনার মধ্য দিয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঋষি-সুলভ সাধনা, সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিক জীবনবোধ ও বুদ্ধিশুভ্র দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী সচেতন পাঠপিপাসু মানুষটিকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না, সতীনাথের সাহিত্যের সাক্ষ্যেই তাঁর জীবনসাধনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত, সচেতন দরদী পাঠকের উন্মোচনের অপেক্ষায়।

বস্তুতঃ তিনি নিজেকে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না। গুণমুগ্ধ সাহিত্যিক বিমল কর তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, 'সংস্কৃতির পীঠস্থানে প্রণামী ফেলতে আসার লোক তিনি নন।'[৩]

…'তাঁর সাহিত্য তাঁর বাগানের সখের মতন। নিরিবিলি বসে, দিনে দিনে, কত অসংখ্য সুন্দর ফুল লতা এনে তিনি সেই বাগান রচনা করেছেন। এবং তিনি তাঁর বাগানের ফুল কলকাতার সাহিত্য পাড়ায় এনে দিয়ে বলেননি—এর একটা একজিবিশন্ করুন। আমার প্রাইজ চাই।'…[৪]

সতীনাথ ভাদুড়ী গ্রন্থ রচনা অপেক্ষা গ্রন্থপাঠেই অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। বনফুলকে তিনি এক সময় বলেছিলেন, 'বলাইদা, আমি লেখক নই, পাঠক'। অদম্য পাঠস্পৃহাই ছিল তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান আকর্ষণ। তাঁর চিত্রিত 'লেখকে'র বর্ণনায় সতীনাথের নিজস্ব সত্তার প্রতিফলন ঘটেছে। নিজের সম্পর্কে নীরব মানুষটির এই ক্ষণপ্রকাশটুকু অনুধাবন যোগ্য। তিনি লিখেছেন—

…'লিখতে তাঁর ভাল লাগে না, তবু সে হয়ে পড়েছিল লেখক দশচক্রে পড়ে। বড় লেখক সে যে হতে পারবে না, তা সে জানে; কেন না খুঁটিনাটির উপর তাঁর এত ঝোঁক যে আসল জিনিষটাই যায় কলম এড়িয়ে। ভাল লাগে তাঁর পড়তে, কিন্তু পড়া জিনিসটা হজম করার মত ধৈর্য তার নেই। তাই জ্ঞানের বদলে মনের উপর চেপে বসেছিল অসংখ্য খবরের বোঝা—যাকে সরল লোক বলে পাণ্ডিত্য। এই বোঝার চাপে তার হাঁফ ধরেনি কোনদিন, বরঞ্চ এর ওজন ও পরিধি বাড়ানোর নেশা তার চিরকালের।'[৫]

সতীনাথ নিজেকে সাহিত্যিক মনে করতেন না। নিজেকে পাঠক মনে করতেন। সেই পাঠ যে কত গভীর ব্যাপক এবং বিচিত্রমুখী ছিল, তাঁর সযত্ন আহৃত বিভিন্ন পুস্তক সম্বলিত লাইব্রেরীটি সে সাক্ষ্য বহন করছে।

দেশের সাহিত্য তিনি সযত্ন মমতায় পাঠ করেছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, উর্দুতে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। ফার্সী এবং অন্যান্য দু একটি ভারতীয় ভাষার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁর জ্ঞানপিপাসা এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পৃথিবী, বিশেষ করে ইউরোপীয় সভ্যতার উৎস সন্ধানে এবং তাদের চিত্তের ভাবরস সন্ধানে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে বিবিধ বিদেশী ভাষার সঙ্গে সম্যক পরিচয় তাকে সবিশেষ সাহায্য করেছিল। আর পাঁচজন ভারতীয়ের মত শুধুমাত্র ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপকে জানার চেষ্টা তিনি করেননি। এ ভাবে জানার মধ্যে ফাঁক থাকতে বাধ্য, এ কথা তাঁর অনুসন্ধিৎসু

বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে তিনি সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই ইংরেজীর মতই তিনি ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, জার্মান এবং রাশিয়ান ভাষার সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর পাঠাভ্যাসের পিছনে সব সময়ই এক বৈজ্ঞানিক চেতনা সক্রিয় ছিল। তাই আপোষ-হীনতার সঙ্গে খুঁটিনাটি বিষয়েও তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। স্নেহাস্পদা বন্ধুকন্যা শ্রীমতী গৌরী রায়কে তিনি একবার বলেছিলেন…'সায়েন্স না পড়লে আর্টস্‌ও ঠিক বোঝা যায় না।'

জেলের মধ্যে সতীনাথ পড়াশুনা নিয়েই দিন কাটাতেন। তিনি যে জেলটিতে থাকতেন তাতে নিভৃতে পড়াশুনা করার সুযোগ ছিল, বইয়ের তাকে বাংলা ইংরেজী উপন্যাস এবং এম. এন. রায়ের বইপত্র। অসীম পাঠতৃষ্ণায় তিনি জেলে থেকেও বন্ধু-বান্ধবদের বই পাঠাবার জন্য চিঠি দিতেন এবং তার জন্য বিপুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন। বিজ্ঞানী বন্ধু বিভুবিলাস ভৌমিককে এ বিষয়ে লেখা একটি চিঠি—

Bhagalpur Central Jail
From Satinath Bhaduri
Security prisoner

Cell No 4
'T' Cells
Bhagalpur Central Jail
30. 1. 43

ভাই বিভু,

তোমার চিঠি অনেকদিন আগেই পেয়েছি। তুমি লিখেছিলে বই পাঠাচ্ছি। কিন্তু এতদিনের মধ্যে না পাওয়ায় মনে হ'ল যে তোমাকে খবর দেওয়া দরকার। কেন না তুমি যদি পাঠিয়ে থাক আর তা সত্ত্বেও আমি যদি না পেয়ে থাকি তা হলে তোমার জানা দরকার, কেন না পোষ্ট অফিসে লেখাপড়া করতে হতে পারে। —ইত্যাদি

তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থগুলি যে শুধু সুনির্বাচিত তাই নয়, সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল্যবান্ উৎসস্বরূপ। তাঁর মৃত্যুর পর চন্দননগর 'অ্য ইনষ্টিটিউটে' বইগুলি সমর্পণ করা হয়। এই উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীমতী বাণী রায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনায়—

'১৯শে জানুয়ারী রবিবার (১৯৬৯) আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। সুযোগ্য কর্মকার মহাশয় (শ্রীযুক্ত কালীচরণ কর্মকার—চন্দননগর অ্য ইনষ্টিটিউটের ডেপুটি ডিরেক্টার) অক্লান্ত পরিশ্রমে বইগুলি বাঁধিয়ে ক্রমিক

নাম্বার দিয়ে আলমারী পালিশ করিয়ে অজস্র পুষ্পসম্ভারে উৎসবক্ষেত্র সজ্জিত করেছেন। সস্ত্রীক ফরাসী কন্সাল জেনারেল সহ বহু ফরাসী ও বাঙ্গালী অভ্যাগতের মধ্যে গানে, কবিতায়, স্মৃতিচারণে স্মরণসভা সমুজ্জ্বল। বনফুল প্রমুখ সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন, তিনিই সভাপতিত্ব করলেন। অসংখ্য লোকের উপস্থিতি-ধন্য সভায় শ্রীযুক্ত কালীচরণ কর্মকার ফরাসী ভাষায় সতীনাথের বন্দনা করলেন।'[৬]

সতীনাথের এই সংগ্রহ, ডায়েরি এবং অন্যান্য আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রুস্ত ও তৎপরবর্তী ফরাসী ঔপন্যাসিকরা তাঁর বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল—ভ্যালেরি, কামু প্রভৃতি সমসাময়িকরাও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন।

মধুসূদনের উপর ফরাসী কবি La Fontaine-এর প্রভাব বিষয়ে তিনি যে আলোচনা করেছিলেন কিংবা প্রুস্ত ও জোলার মৌলিক গুণগত পার্থক্য এবং সর্বোপরি ফরাসী জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন মতামত, জিজ্ঞাসা, আশা ও নৈরাশ্যবোধ তাঁর পাঠবিষয়ে নিমগ্নতার পরিচায়ক। ফরাসী দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি তিনি গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন, কখনও গভীর আস্থার সঙ্গে বলেছেন, 'ফরাসী সাহিত্যের ধারা কখনও শুকিয়ে যাবে না'। আবার কখনও অনুযোগ করেছেন,··· 'গভীর সাহিত্যের প্রতি যে দেশের লোকেদের এত অনুরাগ তারা রোমাঁ রোলাঁর বই পড়তে ততটা ভালোবাসে না কেন ?'

আধুনিক ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে সতীনাথের জ্ঞান ছিল ব্যাপক ও গভীর। 'দেশ'-এর ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যায় তিনি নিজের প্রিয় সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। Henri Bosco-এর Mas Theotime বইটিকে রসের অভিনবত্বের জন্য তিনি অনুবাদের সুপারিশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বাংলা অনুবাদের সামগ্রিক অপ্রতুলতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

বিদেশী ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটি বিশিষ্ট মত ছিল। হিন্দী লেখক কৈলাস বিহারী সহায়কে তিনি বলেছিলেন, 'ফরাসী ভাষা শিক্ষার সহজতম উপায় হচ্ছে অভিধানের সাহায্যে ঐ ভাষায় রচিত পুস্তক সমূহ পাঠ করা।'

তিনি নিজে এই উপায়ে স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান ভাষার শ্রেষ্ঠ

উপন্যাসগুলি পাঠ করেছিলেন। খুব কম ভারতীয় লেখকই মূল ভাষায় এই উপন্যাসগুলি পাঠের সুযোগ পেয়েছেন। সতীনাথের অধ্যয়ন ও জ্ঞানের পরিধি বিস্ময়কর ছিল। কিন্তু সেই অধীত বিদ্যাকে তিনি সর্বসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়াস কখনও করেননি। এ বিষয়ে তাঁর বিরাগ ও বিরূপতা যে কত প্রবল ছিল একটি সামান্য ঘটনাতে সে পরিচয় পাওয়া যায়। একবার ওঁর বাড়ীতে তথাকথিত এক পণ্ডিত ফরাসী সাহিত্যের উপর সারগর্ভ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ শোনার পর সতীনাথ উঠে গিয়ে নিজের লাইব্রেরী থেকে ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয় মূলক একটি বই এনে পণ্ডিতকে দিলেন। বইটি পড়ে তাঁকে আবার আসতে অনুরোধ জানালেন।

শুধু বিদেশী সাহিত্যই নয়, দেশের সাহিত্যও তিনি সযত্নে পাঠ করেছিলেন।

হিন্দীতে তাঁর জ্ঞান সংশয়াতীত ছিল। 'জাগরী'র হিন্দী অনুবাদককে নারায়ণ প্রসাদ বর্মা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন, কি ভাবে স্বয়ং লেখক এ বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন—

'কিছু কিছু অনুবাদ করে তাঁর কাছে পাঠাতাম; সে সব পড়ে যথোচিত পরিবর্তন, পরিবর্ধনের পরামর্শ দিয়ে তিনি আমার কাছে ফেরত পাঠাতেন। এইভাবে অনুবাদ কাজে তাঁর পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।'[৭]

সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর বেশীর ভাগ লেখাতেও হিন্দী এবং স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। রক্ষণশীল বাংলা ভাষার পক্ষে সেটা বৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। 'জাগরী'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন 'স্থানীয় বর্ণ বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অনেক স্থলে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।'[৮]

সতীনাথের পরিবেশিত গ্রাম্য গীত, প্রবাদ প্রভৃতি তাঁর রচনায় এক অনাস্বাদিত পূর্ব সজীবতা এনে দিয়েছে এ কথা অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ সতীনাথ ছিলেন বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের মধ্যে সেতুস্বরূপ। হিন্দী সাহিত্যেও তিনি একটি বহু আলোচিত নাম।

॥ খ ॥

"Gardening—aesthetics বা hobby নয়। It is a constantly expanding field of experiment.'

অধ্যয়ন ব্যতীত চিরকুমার সতীনাথের আর একটি নেশা বা শখ ছিল ফুলের বাগান। বনফুল স্মরণ করেছেন, 'তাঁর বন্ধু ছিল তার বাগানটি। গোলাপ ফুল আর অর্কিড ভালবাসত। আমার সঙ্গে যখনই তার আলাপ হয়েছে তখন তা সাহিত্য বিষয়ে হয়নি, গোলাপ নিয়ে হয়েছে। আমার সঙ্গে যখন সে দেখা করতে এসেছিল আমার জন্য বই আনেনি, এনেছিল, একটা অর্কিড।'[৯]

স্বভাব লাজুক, সংযতবাক্ সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে হিন্দী লেখক ফণীশ্বরনাথ রেণু মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি দুই মাসে যত কথা জেলে বলেছিলাম, ভাদুড়ীজী তিন বছরের মধ্যে ওর চেয়ে অনেক কম কথা বলেছিলেন নিশ্চয়ই।'[১০]

কিন্তু মিতবাক্ আলাপে অপটু এই মানুষটিই এক সামান্য তরুলতা কিংবা বাগানের প্রসঙ্গে স্বচ্ছন্দ উদ্ভাসিত এবং স্থানবিশেষে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর পরিচিত বহু মানুষই তাঁর এই প্রিয় প্রসঙ্গে তাঁকে জানবার কিঞ্চিৎ সুযোগ পেয়েছেন। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সতীনাথের সঙ্গে আলাপচারিতার সূত্র পেয়েছিলেন এই পথেই। নিজের সাহিত্য সম্পর্কে কোনও কিছু জানাতে অস্বীকৃত হলেও গাছপালা সম্পর্কে আলোচনায় সতীনাথের কোন কুণ্ঠা নেই। বিভূতিভূষণের ভাষায় সেই আলাপের কিছু অংশ—

'কয়েক ভ্যারাইটির অর্কিড নিয়ে এলাম আপনার জন্য—শখ আছে আপনার অর্কিডের?—বড় যত্ন চায়, একেবারে ছেলের মতন—আমার বাগানে সবগুলো ছিল না—নিয়ে আসতে হোল অন্য জায়গা থেকে ··দুটো একেবারে দেশী ভ্যারাইটি···এই যে এই দুটো···একটু বেশী নজর রাখতে হবে।'

'এই আপনার সাদা তরুলতার বিচি। আমার নিজের কাছে ছিল না। তাড়াতাড়িতে খুঁজতেও পারলাম না। আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে আসতে হোল। একটু দেরিও হয়ে গেল তাইতে।'[১১]

সতীনাথের মুখ বিপুল সার্থকতায় উদ্ভাসিত। প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষটির সাহিত্যের উৎসপথে এর প্রতিক্রিয়া অপরিসীম ছিল।

সতীনাথের নিজের জীবনের মত তাঁর বাসস্থানেরও একটি নিরুচ্চারিত স্থির বিশিষ্টতা ছিল। সে বৈশিষ্ট্য শুধু সযত্ন সংগৃহীত পাঠাগারটিতেই

সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর সস্নেহ লালিত বাগানটিও তাঁর বাসগৃহের মূল্যবান্ সম্পদ ছিল। গৃহের বইপত্রগুলি যদি গৃহস্বামীর বৈদগ্ধ্য ও পাঠ-পিপাসার সাক্ষ্য দেয় তবে বাগানটি সৌন্দর্যপ্রিয় রুচিবান অথচ অপার কৌতূহলী এক প্রকৃতি বিজ্ঞানীকে চিনিয়ে দেয়।

তাঁর বাগান খুব সুসজ্জিত ছিমছাম ধরনের ছিল না। প্রদর্শন অপেক্ষা সীমাহীন কৌতূহলে অজস্র রকমের ফুলফলের জীবনচর্যা পর্যবেক্ষণ করাই তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল। সেই আগ্রহের মধ্যে যে কি অপরিসীম আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা মিশে ছিল একটি ঘটনার উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

'রাত্রিতে আমরা গল্প করছি—একবার টর্চ নিয়ে সতীনাথ নীরবে বেরুলেন। একটু পরে ফিরে এলে জানালেন—একটি ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছিল, কতটা ফুটেছে তা দেখে এলেন। শুনতে পেলাম—কোন কোনদিন তিনি মাঝরাত্রে এই উদ্দেশ্যে ঘুম ছেড়ে উঠে বাগানে যান। ফুলের একটু একটু করে ফোটা, এমন তার কাছে কৌতূহলোদ্দীপক, শুধু বিশেষ এক জাতের ফুলের প্রীতি নয়—নানা ফুলের প্রতিই তাঁর এই দৃষ্টি।'[১২]

শুধু ফুলই নয় সেই বাগানে উড়ে আসা পাখীরাও তাঁর বিশেষ অনুরাগের অংশীদার ছিল। গোপাল হালদার স্মরণ করেছেন কি গভীর ও সস্নেহ মমতায় তিনি এই পাখীদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

'পরদিন সকালবেলা, ৮টা ৯টা হবে। চা খাওয়ার পর বারান্দায় বসে আমরা গল্প করছি, হঠাৎ সতীনাথবাবু একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি কান খাড়া করে আছেন, বললেন, শুনছ? বাড়ির সীমান্তে বড় বড় গাছগুলির মধ্যে একটি পাখির ডাক! ঋতু পরিবর্তনের আগন্তুক পাখি। সতীনাথবাবু উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চোখে বললেন, এবার নয়দিন আগে এল, গত বৎসর এসেছিল,—তারিখ বললেন—গত বৎসর একটু দেরী হয়েছিল। এবার বেশ আগে এল, সাধারণতঃ আরো দিন চার পরে আসে। তিনি সহজভাবে পূর্বেকার দুচার বছরের তারিখ বললেন—যেন বাড়ীর ছেলেমেয়ের জন্ম তারিখ—মনে গাঁথা।'[১৩]

চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই সতীনাথকে আজীবন আপোষহীন জীবন ও সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত রেখেছিল। 'সত্যমূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি চুরি করার মত শৌখিন মজদুর' তিনি ছিলেন না, তাঁর ব্যক্তি

জীবনের কয়েকটি প্রিয় অভ্যাস ও শখ থেকে এই সত্যে সহজেই উপনীত হওয়া যায়।

তাঁর বাসভবনের পরিবেশ ছিল আশ্রমের মত। এক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও এক অনাবিল সৌন্দর্যে বিভাসিত বাগান সেই বাসভবনের সম্পদ ছিল। এই ভাব-পরিমণ্ডলে আত্মমগ্ন সতীনাথ নীরবে সাধনা করবার অবাধ অখণ্ড স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছিলেন।

বস্তুত বই এবং ফুল ছাড়া সতীনাথকে কল্পনাই করা যেত না।

সুলেখিকা বাণী রায় তাঁর সঙ্গে সতীনাথের প্রথম সাক্ষাৎকারটি বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

"সতীনাথ ভাদুড়ীর কথা মনে পড়লেই একখানি উজ্জ্বল চিত্র দেখতে পাই।

পূর্ণিমায় তাঁর বাসভবনের ফটক দিয়ে বার হয়ে আসছি। তিনি নিজের হাতে বাগানের গাছ থেকে একগুচ্ছ সাদা বিদেশী ফুল আমাকে উপহার দিচ্ছেন।

প্রসন্ন – নির্মল প্রভাত। সতীনাথের সযত্ন-রচিত উদ্যানে দাঁড়িয়ে আমি, সতীনাথ ও স্থানীয় দুইটি তরুণ।"[১৪]

এই নির্মল প্রসন্নতাই সতীনাথের জীবন ও সাহিত্যের একমাত্র সাধনার ধন ছিল।

বিভিন্ন সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, মানুষ সতীনাথকে উদ্যানপ্রিয় বলে জেনেছেন। সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষতঃ নিজের রচনা সম্পর্কে তিনি মুখ খুলতেই চাইতেন না, সভা-সমিতি সবিনয়ে এড়িয়ে চলতেন। তাঁর মনের মধ্যে প্রবেশাধিকারের একমাত্র চাবিকাঠি ছিল গাছপালা, ফুল, পাখির আলোচনা। এতেই সতীনাথের হৃদয়ের উৎসমুখ খুলে যেত। তিনি স্বচ্ছন্দ অনাড়ষ্ট আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন এবং নিজের সংগৃহীত নমুনা অপরকে উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট হতেন।

সতীনাথ একদিকে যেমন নিজের বাগানটির পরিচর্যায় ব্যাপৃত থাকতেন, তেমনই এই বাগান করা সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন মতামত এবং অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।

সেইরকম কিছু লিখে রাখা মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

বাগানের আসল আনন্দ expectation বা সম্ভাবনা। অনিশ্চয়তার

আশঙ্কা মেশানো—ফুল ফল হবার পর যে আশার উদ্দীপনা অর্ধেক হয়ে যায়।

স্কুল প্রভৃতি সর্বমানবিক বাড়িগুলির বাগানে স্থায়ী বড় গাছ পুঁততে হবে।

অনেক ফুল সন্ধ্যায় ফোটে (সন্ধ্যামণি), অনেক ফুল শুধু সকালটুকু (Morning glory), অনেক রাতে ফোটে (Bridal creeper), অনেক ফুলের রাতে গন্ধ। রাতে সাদা ছাড়া অন্য রঙ দেখা যায় না। এই সব পয়েন্ট-গুলো মনে রেখে বাগান করতে হবে। যাঁরা সকালের বাগান বিকালের বাগান আলাদা রাখা afford করতে না পারেন, তাঁরা নজর রাখবেন—সব সকালের ফুল বা বিকেলের ফুল যেন একই জায়গায় না পড়ে যায়।

বাগানের যেখানে বীজের bed করবেন দেখবেন বেড়ালে খুঁড়বে রোজ, ফুলের গাছ পুঁতলে দেখবেন কুকুর খুঁড়বে—সুন্দর triangular plot এ ঘাস রেখেছেন, invariably দেখবেন তার মধ্য দিয়ে চলবার রাস্তা হয়ে গিয়েছে। পিঁপড়ে পোকামাকড়দের কথা বাদ দিলাম। ছেলেপিলেরা রাত থাকতে চুরি করতে আসবে—উপড়ে নিয়ে যাবে গাছশুদ্ধ যাতে তাদের বাড়ির উঠানেও না লাগে।

বাগান করতে ধৈর্য চাই—সমদৃষ্টি চাই—সমদর্শী হওয়া চাই—সকলের অধিকার আছে, কীটপতঙ্গ থেকে আরম্ভ করে পাড়ার প্রত্যেককে, এইরূপ সাম্যবাদে বিশ্বাস করা চাই।

আভিজাত্য রাখতে হলে delicate গাছ লাগাতে হয়—কিন্তু যে মালীর খরচ করতে না পারে তাকে hardy গেরস্থ পোষার গাছ পুঁততে হবে।

এমন গাছ লাগাও যা দেখতেও ভাল আবার ফলও হয়—ডালিম, লিচু। গন্ধও হয়, দেখতেও ভাল, ফলও হয়—বাতাবি লকেট।

বাংলার মতো ভাল ভাল নাম করে নেওয়া বিদেশী ফুলের ধ্বনির নকলে আশ্চর্য। রবিবাবুর নীলমণিলতা নয়। একেবারে মালীদের করা। হেলেকৃষ্ট ফুল, রাখপুরী, বেগমফুলি বা বেগুনফুলি, আম, কুচকুলিয়া।

কলার গাছ বিলাতের ফুলবাগানে; মানকচুর গাছ রাজপুতানার রাজাদের বিখ্যাত বাগানগুলোর পাতাবাহার হিসাবে আছে, ঝিঙে ফুল, কুমড়ো ফুল, ঢ্যাড়সের ফুল মেস্তা—সব দেখতে ভাল, কিন্তু যেখানে খুব common সেখানে এগুলি অকাজের, বাগানে লাগিয়ে লাভ নেই।

observe করতে করতে নিজেকে বড় botanist মনে হবে—কবে থেকে

(নীলমাটির) পাতার সাদা মার্বেল লাগছে (ঝড়ে পড়বার আগে নাকি ?) পেয়েরা নিচ থেকে পাকে—আম বোঁটার দিক থেকে পাকে কেন, কোন্ variety ডালিমের ফুল কেমন—বিভিন্ন আমপাতার গন্ধ—হ্যামিলটোপিয়ার ডগা ভাঙলে গাঁদালেরও গন্ধ—সফেদা ফলের শিকড়ে ঝাঁজ গন্ধ—বাইরের গন্ধ—ল্যান্টানায় সাইওাফর্মের মতো গন্ধ—খেজুরের কচি সাদা পাতা দিয়ে কারিকুরি—আতার পাতা পুড়িয়ে Eczemaর ওষুধ।"

"কেউ বাগান দেখতে এলে আপনার ভাল ভাল রঙ বেরঙের গোলাপগুলো দেখাবার সময় বলবেন না যেন আমার গোলাপগুলো সাধারণ। বললেই দেখবেন সমজদার লোকটি বিজ্ঞের মতো কথাটি সমর্থন করে বললেন—আমার কাকার উঠনে একটা গাছ ছিল, ইয়া বড় বড় আর কী খোসবাই—আতরের। একেবারে ভুর ভুর করত ইত্যাদি। এই শ্রেণীর সমজদারই শতকরা ৯৯ জন। কাজেই নিজের বাড়িয়ে বলতে যদি বাধে তাহলে চুপ করে থাকবেন।"

"পাখির ডাক। ভাষার সঙ্গে পাখির ভালমন্দ, কারুণ্য, কঠোরতা, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য ইত্যাদির ভাবানুষঙ্গ। খোকা, বউ কথা কও—হিন্দীতে বলে 'ফলনা পাকো'। বিলিতি কাউকে ডাকবার সুর কোকিলের। 'চোখ গেল'র কারুণ্য বোধহয় বাংলা ছাড়া অন্য ভাষার লোকেরা ধরতে পারে না। plaintive ঘুঘুর ডাক—কিন্তু গোপাল জাগো জাগো বলে কি অন্য কোনো ভাষায় ? ছাতারের ডাক কর্কশ - কিন্তু যেই seven sisters বল অন্য একটা ভাবানুষঙ্গ পাবে।"

"সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে দিন গুণছি গোলাপটার কবে কচিপাতা বার হচ্ছে - দুপুরে রৌদ্রের তাপ কী রকম কমছে—সারের গরম সইবে কিনা—রাতে কী রকম হিম পড়তে আরম্ভ করছে—ভোর রাতে খালি গায়ে শোয়া যায় কিনা—ভোরে ফুল পাহারা দিতে উঠে প্রথমেই দেখি ঘাসের পাতায় কতটা শিশির পড়েছে ; সন্ধ্যায় বাইরে আড্ডা দিতে বসে মাঝে মাঝে feel করতে চেষ্টা করি গায়ের গেঞ্জি আর মাথায় চুল ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে কিনা।" (ডাইরি থেকে সংগৃহীত অংশ বিশেষ)[১৫]।

মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সতীনাথের জীবনের ব্যাপক অংশ জুড়ে থাকা প্রকৃতি-প্রীতির বিশেষ কোন পরিচয় তাঁর সাহিত্যে নেই। কিন্তু একটু

অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করলে 'অজা-গড়' গল্পে সহাস্য কৌতুকের অন্তরালে উদ্যানপ্রিয় সতীনাথকে আবিষ্কার করা যায়।

"যে গোলাপফুলের চাষ করতে চায় তার কি কাঁটার ভয় করলে চলে? বাধা বিপত্তি ওজর আপত্তি আসবেই, জানা কথা। গোলাপ ফুল সম্বন্ধে অজ্ঞ বাড়ির লোকজনের উপর তাঁর মায়া হয়। স্ত্রীর কথা বাদ দাও, তাঁর ছেলেরা জানে না যে, প্রাচীন কবি স্যাফো গোলাপকে ফুলের রাণী বলেছেন। কবি সাদীর 'গুলিস্তান'-এর মানে যে গোলাপবাগান সে খবর এরা জানে না। গোলাপের পাপড়ি থেকে হয় ইউনানী ওষুধ আর শিকড় থেকে হয় তামাক টানবার পাইপ।"[১৬]

'আমি আর কালিদাস' প্রবন্ধে মহাকবির অনুসরণে সতীনাথের বিবিধ পরীক্ষা ও তার ফলশ্রুতি বর্ণনায় লেখকের বাগান করার অভিজ্ঞতা আরও স্পষ্ট রূপলাভ করেছে।

"একটা বাতাবিলেবুর গাছে 'পেট্রিয়া' লতা তুলে দিয়েছিলাম, পেট্রিয়া হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নীলমণিলতা। শুধু লতা পাদপ-মিথুন নয়, সুগন্ধ আর রঙের মিলন, বাতাবির চারা আর 'নীলমণিলতা' কাবিতা দুইটির মিলন, কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথের মিলন। ওটাতেই হয়েছিল আমার বাগানে কালিদাসের পদ্ধতির নিপুণতম প্রয়োগ। বাতাবি লেবুর গাছ যখন পুষ্পে পল্লবে ভরে ওঠে, ঠিক তখনই নীলমণিলতা তার নীল ফুলের ডালি সাজিয়ে বসে। ফুলের সময় প্রেট্রিয়া লতার পাতা ঝরে যায়। শুধু নীল। সেই জন্যই অত সুন্দর দেখতে লাগে। সেই নীলকে আমি নষ্ট করেছিলাম বাতাবি পাতার সবুজের বোঝা চাপিয়ে। নিজের ভুল বোঝবার পর আর এক মুহূর্তও দেরি না করে পেট্রিয়া লতাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে লাগালাম দোলনচাঁপা গাছের পাশে। নীলমণিলতায় যখন ফুল ফোটে, দোলনচাঁপা গাছে তখন পাতা থাকে না।"[১৭]

॥ গ ॥

অভিজাত, মার্জিত, ও বিদগ্ধ, সতীনাথের কিন্তু সমাজের অবহেলিত মানবতার প্রতি দরদের অন্ত ছিল না। অকপটভাবে তিনি তাদের সঙ্গে মিশেছেন।

তাঁর বৈদগ্ধ্য তাঁকে পাঠাগারের নিভৃতে আশ্রয় দিয়েছে, তাঁর মনের

সুরুচি এবং সৌখিনতা ফুলবাগানের মধ্যে তৃপ্তি দিয়েছে, আর নিঃসীম দরদী হৃদয়টি তাঁর প্রিয় কুকুরকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর প্রিয় সেই সারমেয়টি কিন্তু নিতান্তই অনভিজাত এবং দেশী ছিল।

জন্মগত কোন কৌলীন্যই তার ছিল না, তবু সেই সতীনাথের বিশেষ পরিচর্যা এবং মনোযোগের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। সেই নিতান্ত অন্ত্যজ প্রাণীটি সতীনাথের মৃত্যুকালে তাঁর একমাত্র সাক্ষী হয়ে প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতার মূক স্বাক্ষর রেখেছিল। নিঃসঙ্গ সতীনাথ মৃত্যুর সময়েও স্বজনবিহীন একা ছিলেন। নিজের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলে কাউকে বিব্রত করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। অনুরাগীর কিংবা স্নেহাস্পদের সেবার অধিকারকেও তিনি স্বীকার করতে চাইতেন না। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য কেউ-ই প্রস্তুত ছিলেন না। নিজের বাড়ীর কুয়োর পাশে তাঁর মৃতদেহ যখন আবিষ্কৃত হয় তখন ঘটনার আঘাতে সবাই হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন ; কিন্তু যাকে নিজের হাতে যত্ন না করলে সতীনাথের কিছুতেই মন ভরত না, সেই অখ্যাত পথে কুড়িয়ে পাওয়া জন্তুটি শুধু তার মৌন অব্যক্ত বেদনার বোঝা নিয়ে প্রভুর পাশেই ছিল।

সতীনাথ এই কুকুরকে শুধু লালনই করেননি। 'ঈর্ষা' গল্পে তাকে চিত্রিত করে চিরস্থায়িত্ব দিয়ে গেছেন। কুকুরটির একটি অভিনব নামকরণও তিনি করেছিলেন—'পাহারা'। 'ঈর্ষা' গল্পে বর্ণিত পাহারার চিত্রটি নিম্নরূপ—

'খাঁকি খাঁকি রং, পোড়া কালো মুখ, খাড়া কান, গুটানো লেজ—একেবারে নির্ভেজাল পেডিগ্রি খেঁকি কুকুর।'[১৮]

এই কুকুরকে কেন্দ্র করে লেখকের অভিজ্ঞতা রোজই সম্প্রসারিত হচ্ছে।

"কুকুরছানা পোষা যে কি মারাত্মক ব্যাপার, তা যিনি পুষেছেন তিনিই জানেন। হেন কাজ নেই, যা করতে হয় না। এতকাল অবাক হতাম লোকে একদিন প্রতিজ্ঞা করে সিগারেট ছেড়ে দেয় কি করে? একদিনে নেশা ভুলে গেলাম কি করে তা ভেবে অবাক হবার পর্যন্ত আমার সময় নেই তখন। অষ্টপ্রহর ডিউটি কুকুর সেবার।"[১৯]

অবশ্য এই সেবার মধ্যেও তৃপ্তি পেতে দেরী হয় নি। তাই—

'জন্তু জানোয়ারের মন নিয়ে এর আগে কখনও মাথা ঘামাইনি। এখন এতে রস পেতে আরম্ভ করি। অবিকল মানুষের মতো। যত পাহারাকে দেখি অবাক হয়ে যাই।[২০]

সতীনাথের জীবন যাপন প্রণালী বরাবরই নিস্তরঙ্গ সমাহিত। তাঁর বন্ধু ছিল তাঁর বাগান। মনের খোরাক জোগাত বই আর সঙ্গী বলতে ছিল, বাগানের মালী, কুকুর পাহারা আর রান্নার ঠাকুর। এই তিনটি প্রাণীর প্রতিই সতীনাথের অপরিসীম মমত্ব ছিল। বিপথগামী রান্নার ঠাকুর বাবাজীকে তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে চিকিৎসা করে সুস্থ করেছিলেন, দাঙ্গার সময় তিনি মুসলমান দরিদ্র মালীটির জন্য খুব বিচলিত ও উদ্বিগ্ন থাকতেন। যদি ধর্মান্ধ গোয়ালারা এই নিরাহ খেটে খাওয়া মানুষটির কোনো ক্ষতি করে এই চিন্তায় তিনি নিদারুণ অস্বস্তি ভোগ করতেন।

॥ ঘ ॥

অকৃতদার সতীনাথের গৃহে অতিথি সমাগমের বাহুল্য ছিল না। তবে নিতান্ত কাছের দু চারজন বন্ধুকে নিজের রন্ধনকুশলতার পরিচয় দিয়ে আপ্যায়িত করতেন। সতীনাথ নিজে ছিলেন অত্যন্ত মিতাহারী: কিন্তু খাবার সময় বিভিন্ন রান্নার গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে খেতে ভালবাসতেন। সন্দেশ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। নিজে খেতে ভালবাসতেন, অন্যকেও খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন। বন্ধু পত্নী সরমা ভৌমিকের (বিজ্ঞানী বিভুবিলাস ভৌমিকের পত্নী) রান্না অম্বলকে তিনি 'রাঢ়ের টক' নাম দিয়েছিলেন।

জেলে থাকাকালীন তাঁর দৈনন্দিন আহার তালিকা নিতান্তই বাহুল্যবর্জিত ছিল, কিন্তু সেই সামান্য আহারটুকু তিনি সুচারু নিষ্ঠার সঙ্গে স্বহস্তেই প্রস্তুত করতেন।

সকালবেলা পাউরুটি, ডিম সেদ্ধর সঙ্গে চা খেতেন। তারপরে আবার এক-দু'বার চা। দিনের বেলায় ভাত, আলুসেদ্ধ, কলাসেদ্ধ, দু চামচ মাখন এবং দই। বিকালবেলা বিস্কুট সহ চা। রাতে আবার চার স্লাইস পাউরুটি মাখন। এটাই সাধারণভাবে সতীনাথের আহার তালিকা ছিল। কিন্তু তিনি খুব ভালো চা এবং চমৎকার টোষ্ট ও ডিমের পুডিং তৈয়ারী করতে পারতেন।

চা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ এবং উৎসাহ ছিল। তিনি বিশ্বপ্রসিদ্ধ চা-রসিকদের খবর রাখতেন এবং তারা কে কত কাপ চা খেতেন সে হিসাবও তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। পাঁচ পট চায়ের লিকারে যে নিকোটিন থাকে এক টুকরো

সুপুরিতে যে তার থেকে অনেক বেশী থাকে ইত্যাদি তথ্যও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে মনে রাখতেন।

রন্ধন ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ এবং রন্ধনপটুতার নিদর্শন তাঁর পরিচিত বন্ধু বান্ধবেরা প্রায়ই পেতেন। জেলে থাকাকালীন সতীনাথের অনুরাগী হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেণু লিখছেন,

"মুঙ্গের জেলার যমুনাবাবু ভালো রান্না জানতেন—প্রায় সব রকমের রান্না ওঁর জানা ছিল।...ভাদুড়ীজী একবার যমুনাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—আপ 'কচুমর' বনানা জানতে হ্যাঁয় ? ওঁর এই প্রশ্ন শুনে ওখানে যাঁরা ছিলেন—সবাই হেসে ফেলেছিলেন। আমরা জানতাম যে মার মার কর 'কচুমর' বানানা একটা চালু হিন্দী প্রবাদ। যমুনাবাবু একদিন বাইরের থেকে বুনো ওল জাতীয় কোন আলুর পাতা আনিয়ে সযত্নে 'কচুমর' তৈরি করেছিলেন।' এর পরিবর্তে ভাদুড়ীজী একটি 'মোতঞ্জন' (এক রকমের পোলাও) রান্না করে যমুনাবাবুকে অবাক করে দিয়েছিলেন। যমুনাবাবু নিরামিষভোজী ছিলেন। এককালে প্রচুর খেতেন। এখন রান্না করে অন্যদের খাইয়ে সুখ পান। উনি ভাদুড়ীজীর তৈরী মোতঞ্জনের রং দেখে এবং 'খুসবু'তেই বুঝেছিলেন—ওস্তাদ হাতের রান্না। বললেন—হম্ তো সমঝতে যে কি আপ আলু কেলা সিদ্ধ করনা ছোড়কর আউর কুছভি নহী জানতে হ্যাঁয়। লেকিন আপতো সিদ্ধহস্ত পাকশস্ত্রী নিক্‌লে।"[২১]

স্নেহাস্পদ অনুজসদৃশ ডাক্তার বীরেন ভট্টাচার্যও সকল কাজে সেরা বলে সতীনাথের প্রতি তাঁর ভক্তি ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন। সতীনাথের বিভিন্ন শখ ও বিচিত্র কর্মধারার উল্লেখ করে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন।—

"রান্না করা ও মিষ্টি তৈরী করাতে সতুদার সখ ছিল প্রচুর। নারকেল নাড়ু, গোকুল পিঠে, নারকেল চিংড়ী, দইবড়া নিজে হাতে বানিয়ে আমাদের খাইয়েছেন অনেকবার। যখন বলি সুন্দর হয়েছে তখন বলতেন 'তোর মার চেয়ে ভাল অবশ্য নয়, তবে এসব যে মেয়েদেরই একচেটিয়া ব্যাপার নয়, তা প্রমাণ করেছি তো ?"[২২]

সতীনাথের এই রন্ধনবিষয়ক জ্ঞান 'জাগরী'তে বিলুর মায়ের মুখে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ 'জাগরী'র 'আওরৎ কিতা' অংশের এই অত্যন্ত আন্তরিক ও মানবিক চিত্রগুলিই এর প্রধান আকর্ষণ।

বিলুর মা যখন বলেন—

"সরস্বতী কি শুক্‌তো রাঁধতে জানে? গোকুলপিঠের নাম শুনেছে? বিলু অড়রের ডাল পছন্দ করে না। আর ওরা অড়রের ডাল ছাড়া আর অন্য কোনো ডাল ভালবাসে না"

"এরা কি একটা ভালো মিষ্টি তোয়ের করতে জানে? মিষ্টির মধ্যে ঐ এক 'পুয়া'—সব পূজায়-আচ্চায়, ঝোলে, অম্বলে সর্বঘটে আছে। জলে একটু আটা গুলে নিয়ে, তাতে একটু গুড় দিয়ে কোনোরকমে ভেজে ফেলতে পারলেই হয়ে গেল 'পুয়া'। না আছে রসে ফেলা, না আছে কিছু।...আর তারই সঙ্গে আমি আমার বিলুর বিয়ে দিতাম। এতো আর একদিন দু দিনের কথা নয়। সারা জীবন রসুন আর গোলমরিচ খেয়ে কি আর বাঙ্গালীর ছেলে বাঁচতে পারে।"[২৩]

এই বর্ণনার নিখাদ অকৃত্রিমতাটুকু সতীনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল—এ কথা বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা চলে।

নিজে সংসারী না হলেও সংসার থেকে সবপ্রকার রসগ্রহণ করতে সতীনাথ আগ্রহী ছিলেন। নিজের বৌদিকে কাছে বসে শেখাতেন নানারকম জেলি, পায়েস, পিঠে; সেলাইতেও সতীনাথের উৎসাহ ছিল। ভাইঝিদের বিবাহ কিংবা দাদাদের জন্য বাড়ীঘরের ব্যবস্থাপনায় সাগ্রহে যোগ দিতেন। ভাট্টাবাজারের গৃহসংস্কারের প্লান ও পূর্ণিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে লিখিত পত্রের অনুলিপি (৩১শে মার্চ ১৯৬১) তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে।

খুঁটিনাটি সকল কাজেই স্বনির্ভরতা তাঁর চরিত্রের একটী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। সতীনাথের বৌদি শ্রীমতী রেণুকা ভাদুড়ী বলেছেন, 'অন্য কেউ তাঁকে জল গড়িয়ে দেবে একটু কিংবা ধুয়ে দেবে তাঁর ব্যবহৃত জামা-কাপড়—একথা তিনি ভাবতেও পারতেন না।'

ডাঃ বীরেন ভট্টাচার্য একদিন তাঁকে হাতুড়ী দিয়ে ঝামা ভাঙতে দেখেন। প্রশ্ন করে উত্তর পান- 'বাগানের গেটটা সিমেণ্ট কংক্রিট করবো তারই ব্যবস্থা করছি। আমি মরে যাওয়ার পর লিখবি তো—সতীনাথ শুধু রাজনীতি ও সাহিত্য করতো না, রাজমিস্ত্রীর কাজও জান্‌তো।'[২৪]

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে 'জাগরী'র এই উক্তিটি—

"১৯২১ এর পর হইতে তো ইচ্ছা করিয়াই কাহারও নিকট হইতে কোন-

প্রকার সেবা লই নাই। বিলুর মার ইহা লইয়া কত কান্নাকাটি, কত অভিযোগ।"[২৫]

॥ ৬ ॥

আদর্শবাদী অবিবাহিত সতীনাথের জীবনে তথাকথিত প্রেম বা কোন রমণীর প্রতি কোন বিশেষ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁর সমগ্র জীবনে একরকম কোন নারীর অস্তিত্বের কথা আমাদের জানা নেই। অবশ্য 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'র সত্যি কথাটা তার যথার্থ ধরে নিয়ে 'অ্যান' নামে বাৎসল্য-পরায়ণা নারীটির প্রতি সতীনাথের ক্ষণিক দুর্বলতার একটি আভাস পাবার প্রয়াস করা যায়। তবে এই প্রয়াসও নিতান্তই অনুমান নির্ভর। কারণ, সতীনাথ আর কখনও কোনভাবে সেই মনোভাবকে স্পষ্টতায় মেলে ধরেননি। এমন কি, তাঁর নিকট পরিজনেরাও তার কিছু পরিচয় পাননি। বরং,

"তার ভাবপ্রবণ মনে একটা আদর্শবাদিতার মোহ জন্মেছিল ছোট-বেলাতেই। এর প্রাবল্যেই সংসারধর্ম করবার কথা তার মনের কোনায় উঁকিঝুঁকি মারবার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি"[২৬]—লেখকের এই স্বীকৃতিই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য।

কিন্তু স্ত্রী জাতির প্রতি তাঁর সুগভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। নীলু বিলুর মা, জিতেনের মা, মীনাকুমারী অথবা শান্ত শ্রীময়ী অবাঙালী কিশোরী সরস্বতী সর্বত্রই তাঁর সেই সুগভীর মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর নায়িকারা কেউই উচ্চশিক্ষিতা বা অভিজাত নয়। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'র নায়িকা 'অ্যান' তো একজন সাধারণ হোটেলের পরিচারিকা। নারীর বৈদগ্ধ নয়, নিছক নারীত্বই সতীনাথের আকর্ষণের বিষয় ছিল। স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ঈর্ষা সব কিছু মিলিয়ে সাধারণ নারীকেই তিনি সাহিত্যে উপজীব্য করেছিলেন। স্ত্রী চরিত্র বিশ্লেষণে তিনি এক আশ্চর্য কুশলতা এবং সততার নিদর্শন রেখেছেন। তাই নীলু বিলুর মা আমাদের চোখকে অশ্রু সজল করে, মীনাকুমারী নির্বাক করে দেয়, রামিয়া আমাদের বিস্মিত করে। নারীর মধ্যে অতি সাধারণ নারীত্ব মণ্ডিত বাৎসল্যময় রূপই সতীনাথ খুঁজেছেন।

"অ্যানির মধ্যে একটা বাৎসল্যের ভাব আছে। এটা না থাকলে মেয়েকে মেয়ে বলেই মনে হয় না লেখকের। এরা ব্যথা না দিয়ে বকতে জানে না, নিজে রেঁধে খাইয়ে আনন্দ পায়, ঘরে গোড়ালি ছেঁড়া মোজা

দেখলেই বাড়ি থেকে সেলাই করে নিয়ে আসে শার্টের বোতাম, ছেঁড়া দেখলে তখনি স্থঁচ-স্থতো নিয়ে বসে গলায় বাঁধা টাইটা আরও সোজা করে বসিয়ে দেয়। বেরুবার সময় ওয়াটারপ্রুফ না নিলে বকে, গেঞ্জি ও আণ্ডারউইয়ার তাকে দিয়ে না কাচালে কেঁদে ভাসায়। খাওয়ানোর সময় তাদের চাউনিতে অজ্ঞাতে আসে একটা নিবিড় কোমলতা। মরা মায়ের কথা শুনতে শুনতে তাদের চোখের ছলছলানিতে বাঁধা পড়ে সাগরের গভীরতা।”[২৭]

সতীনাথের জীবনে তাঁর মায়ের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। রাশভারী পিতার খুব নিকটে যাবার অবকাশ বিশেষ ঘটত না। সতীনাথের লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয়ে তিনি মার কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবন মাতৃস্নেহে প্লাবিত ছিল। বিশেষতঃ তিনি নিজেও মাতৃভক্ত ছিলেন। ফলে সতীনাথের জীবনে তার মাত্র ২২ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ একটা বিশেষ মর্মান্তিক ঘটনা।

১৯২৮ এর ৪ঠা এপ্রিল সতীনাথের মা রাজবালা দেবীর মৃত্যু হয়। তারই অব্যবহিত পরে বৃদ্ধা মাতামহী এবং জ্যেষ্ঠা ভগ্নীরও মৃত্যু হয়। এই সকল ঘটনা, বিশেষ করে মাতৃবিয়োগ সতীনাথের আত্মমুখী মনে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তিনি সবিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে পূর্ণিয়ার দুজন স্নেহময়ী মহিলা সতীনাথের কাছে মাতৃস্নেহের প্রতীক রূপে এসেছিলেন। সতীনাথ কুসুমকুমারী দেবীকে (খোকা ডাক্তারের মা) মা বলতেন, আর ছিলেন দাক্ষায়ণী দেবী, এঁদের স্নেহে সতীনাথ মায়ের অভাব ভুলতে চেষ্টা করেছেন।

কাহিনীর দিক থেকে না হলেও চরিত্রের দিক থেকে কুসুমকুমারী দেবী ‘জাগরী’র জ্যাঠাইমা এবং বিশেষ করে ‘অচিন রাগিণী’র নতুন দিদিমার মধ্যে শিল্পরূপ লাভ করেছেন, এই চরিত্রটি আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় বিধৃত। কুসুমকুমারী দেবী এই চরিত্রের প্রাণকেন্দ্রে অমর হয়ে আছেন।

লেখক হিসাবে সতীনাথের সততা ও চরিত্রচিত্রণে অকৃত্রিম সহৃদয়তা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি নিজে আকণ্ঠ নিমগ্ন না হয়েই বোধহয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ ও সামগ্রিক রূপটি ধরতে পেরেছিলেন এবং আপন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তাঁর শিল্পধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সতীনাথের অঙ্কিত স্ত্রীচরিত্রগুলি এই প্রত্যয়কে আরও দৃঢ় করে তোলে।

গোপাল হালদারের ভাষায় "সতীনাথের সৃষ্টি নৈপুণ্য বিশেষ করে বিস্মিত অনুমোদন লাভ করে সেই সব স্থানে, যেখানে সতীনাথ নারীর চোখ দিয়ে পরিবেশ দেখেছেন, কিংবা নারীর মুখ থেকে বা অন্তরালাপ থেকে (interior monologue) শুনেছেন, তাঁদের ভাষা—সে নারী 'জাগরী'র মা-ই হোন কিংবা হোন্ নতুন দিদিমা, দুখিয়ার মা, ফুল ঝরিয়ার মা, রাখিয়া, সাগিয়া ('ঢোড়াই-চরিত-মানস') কিংবা গুজরাতির মা (সংকট) বা নিম্নশ্রেণীর যে কোন নারী। প্রত্যেকেই তাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি—বাচন-ভঙ্গিতে বিশিষ্ট, বিশিষ্ট বাগ্‌ধারায়, দৃষ্টির এই যাথার্থ্য ও গ্রহণের অব্যর্থতা লেখকের শিল্প তাদগত্যকে (objectivity) সুদৃঢ় করে পাঠকের অনুভূতিতে দ্বিধাহীন প্রতীতি (Conviction) জাগায়।'[২৮]

॥ চ ॥

সতীনাথের জীবনে বহির্মুখী ক্রিয়াকাণ্ড অপেক্ষাকৃত কম। যদিও ওকালতি করার প্রথম যুগে তিনি কিছু কিছু জনসেবা মূলক কাজ করেছিলেন, তথাপি তাঁর রুচি ও মানসের সঙ্গে এই ধরণের কাজের এক অন্তর্নিহিত বিরোধ ছিল। সেই কারণে এইসব কাজে তিনি দীর্ঘদিন নিবিষ্ট থাকতে পারেননি। এ সময়কার মনোভাব তিনি তাঁর এক বন্ধুকে পত্র মারফং জানিয়েছিলেন—

"Daily routine বলছি—৭টা থেকে ৯টা good boy আইন পাঠ। ৯টা থেকে বারোটা—কেদার বাঁড়ুয্যে সাহিত্যিকের বাড়ী আড্‌ডা। খাওয়া দাওয়ার পর ছোট্ট একটি ঘণ্টা-তিনেকের ঘুম। ঘুম থেকে চা পানের সঙ্গে খবরের কাগজ পাঠ। তারপর সান্ধ্যভ্রমণ। তারপর নটা রাত পর্যন্ত বাজী রেখে Bridge খেলা, রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সাহিত্য চর্চা। 'নবশক্তি' পড় না বোধ হয়। ওতে আমার লেখা গোটাকয়েক Satire বেরিয়েছে। এখন দ্বিগুণ উৎসাহে লিখছি। হ্যাঁ,—বলতে ভুলে গিয়েছি, এছাড়া একটু ড্রয়িংও করচি—নমুনা পাঠালাম। এই হচ্ছে বাঁধা routine এছাড়া বাহাদুরী আর বাহবা নেবার জন্য কতকগুলি public activity দেখাচ্ছি। টুলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতাও মেরেচি। একটা Public Trust Fund দেখবার জন্য এখানকার লোকদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছি। পূজোয় বলি তুলে দেবার জন্য mass meeting আহ্বান করছি। বাড়ী

এসে নিজেরই হাসি আসে এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর জন্য"।[২৯]

সতীনাথের আত্মমগ্ন ও ভাবুক প্রকৃতির চরিত্রে কতকগুলি স্ববিরোধ ছিল, তা কখনই তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিত না। সামাজিকতা ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী না হয়েও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় তিনি একটি লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। রাতে লণ্ঠন হাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সতীনাথ বই সংগ্রহ করতেন। সেই সব বই দিয়ে তৈরী হয় ১৯৩৫ সালে পূর্ণিয়া লাইব্রেরী। এছাড়া ভাট্টাবাজারে দুর্গাপূজার পর প্রতি বছর বিজয়াদশমী উপলক্ষ্যে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সতীনাথই শুরু করেন।

সতীনাথের স্বাস্থ্য সাধারণ পর্যায়ের ছিল। বাইরের খেলাধূলায় বেশী অংশ নিতেন না। তবে মার্বেল খেলায়, ক্যারাম আর ব্যাডমিণ্টনে অসাধারণ নিপুণ ছিলেন। পূর্ণিয়ার ওকালতী জীবনে স্থানীয় ষ্টেশন ক্লাবে নিয়মিত টেনিস খেলতেন। এক সময় পূর্ণিয়া টাউন ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন এবং তাঁর উৎসাহে এবং আগ্রহে কলকাতা থেকে নামী খেলোয়াড়ের দল পূর্ণিয়া যেতো।

টেনিসে তাঁর ভালই দখল ছিল। কখনও কখনও চ্যাম্পিয়ানও হয়েছেন। "জানো? ছোটবাবু এবার ষ্টেশন-ক্লাব এর টেনিস-ম্যাচে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। ক্লাবের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের হল্দি বুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।"[৩০]

জেলে থাকতেও সতীনাথ 'ভলিবল' খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং খেলার বিষয়ে তাঁর মতামত সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। যে কোন সুস্থ স্বাভাবিক যুবকের খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করা উচিত বলে সতীনাথ মনে করতেন। জেলে থাকাকালীন তিনি ফণীশ্বরনাথ রেণুকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ভলিবল খেলতে জানো না? ব্যাডমিণ্টন? টেনিস? কেন? কোনো খেলাধুলোয় মন দিলে স্টুডেণ্ট-ফেডারেশনের সদস্য থেকে নাম কেটে দেওয়া হয় বুঝি।"[৩১]

স্বাস্থ্যচর্চায় উৎসাহিত করবার জন্য সতীনাথ নিজের বাড়ীতে পাড়ার ছেলেদের জন্য ব্যায়ামাগার তৈরী করে দিয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে সতীনাথের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা যুগপৎ ঘটেছিল। সাধারণ ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের স্বীকৃতি পেতে দেরী হয় অনেক। একথা সতীনাথও তাঁর ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন।

"দেশ সাহিত্যিক আর কবি conscious হয় ঠিক কবি বা লেখকের

মৃত্যুর পর। মৃত্যু একটা rude shock দিয়ে লোককে সচেৎ করিয়ে দেয়, একটু অনুতাপ একটু ভাব এঁর উপর বুঝি বা অবিচার করা হয়েছে! মৃত্যুর অব্যবহিত পরই রবীন্দ্রপুরস্কার পেয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—নরসিং-দাস প্রাইজ পেয়েছেন মোহিতলাল—ভারত সরকারের Academy Prize পেয়েছেন জীবনানন্দ দাস।"

কিন্তু সাহিত্যরসিকেরা 'জাগরী'কে প্রকাশ মুহূর্তেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। সতীনাথ রবীন্দ্র পুরস্কারের প্রথম যুগ্ম-প্রাপক। তৎকালীন সাহিত্য সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় 'জাগরী' সম্মানিত হয়েছিল।

অতুল গুপ্ত, গোপাল হালদার, মণীন্দ্র রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্য রসিকের বিভিন্ন রচনা, বিবিধ পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে মানুষের এই স্বতঃঅভিনন্দন তিনি কিন্তু এতটুকু বিচলিত বা আন্দোলিত হননি। স্থিতধী সতীনাথ আরও বেশী করে সাহিত্য রচনা এবং পাঠে তন্ময় হয়েছেন। কিন্তু কি লিখছেন সে বিষয়ে কাউকে জানাবার আগ্রহ সতীনাথের ছিল না। কলকাতার 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর মোটামুটি যোগাযোগ ছিল, তাতেও তাঁর রচনা প্রকাশে প্রায়ই অনীহা দেখা দিত, সম্পাদককে দেখি মৃদু অনুযোগ করতে—"গল্প এখন আপনি লিখছেন কি না জানি না, লিখলেও জানবার উপায় নেই। কারণ, নিজে থেকে জানাবার মানুষ আপনি নন, যতক্ষণ না খুঁচিয়ে বার করি।"[৩২]

লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর স্বভাবতই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সভা সমিতির কাজে সতীনাথের ডাক আসতে লাগল, এইরকম কয়েকটি বিশিষ্ট আহ্বান—'অল ইণ্ডিয়া পীস কাউন্সিলের সদস্যপদ (১৯৫২), পি. ই. এন. এর সদস্যপদ (১৯৫৩), শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলায় কথাসাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠের আহ্বান (১৯৫৩) ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর এশিয়ান সলিডারিটি (১৯৫৫) অথবা কমিটি ফর এশিয়ান রাইটার্স কনফারেন্স (১৯৫৬) এর সদস্যপদ, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রিসেপসন কমিটির অন্যতম সদস্যপদ (১৯৫৮)।

কিন্তু সবিনয়ে সতীনাথ এই সমস্ত আহ্বান এড়িয়ে চলেছেন। সতীনাথের প্রিয় পাঠক এবং ভক্তবৃন্দের তাই নিয়ে অভিযোগের অন্ত ছিল না। শ্রীমতী বাণী রায় একবার নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে লেখেন—

"সাহিত্য গৃহকোটরের সামগ্রী নয়; বাইরের জগতকে বর্জন করা স্বাভাবিকতার লক্ষণ নয়"।[৩৩]

কিন্তু কোনো অভিযোগ বা অনুযোগে সতীনাথের ধ্যানতন্ময়তা ভাঙত না, কখনও কখনও অবশ্য স্নেহাস্পদ কাউকে তাঁর সঠিক মনোভাবটি ব্যক্ত করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

এইরূপ একটি চিঠি—

"স্নেহাস্পদ বিবেক, তোমার চিঠি পেলাম। কারোও অনুরোধ না রাখতে পারা বড়োই লজ্জার কথা। তোমরা তো পূর্ণিয়ার ছেলে—আমার ছোটো ভাইয়ের মতো। মুখে যে জিনিষ বলা যায় না, চিঠিতে তা লেখা যায়। তাই তোমাকে এখন ঘরোয়া চিঠিতে লিখছি যে সভাসমিতি থেকে আমি পারতপক্ষে দূরে থাকতে চাই। ওসব তো অনেক করেছি। ও'গুলো শান্ত মনকে চঞ্চল করে, মনকে পিছনে টানে। সরাসরি চিঠিতে অবশ্য আমি কোথাও এই আসল কথাটা লিখতে পারি না। কেন না লিখলেই তারা এর ভুল অর্থ করে আমাকে দাম্ভিক এবং অভদ্র ভাববে। কিন্তু তোমরা তো আমাকে চেনো। দুঃখিত হয়োনা। আশীর্বাদ জেনো।"[৩৪]

বস্তুতঃ কোনো ব্যাপারেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা, উত্তেজিত হওয়া সতীনাথের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল।

বনফুল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

"চায়ের আড্ডায়, তাসের আসরে, খেলার মাঠের হৈ-হৈ বা নিমন্ত্রণ বাড়ির হট্টগোলে তাকে বড় একটা দেখা যেত না। পরনিন্দার গুজগুজ-ফুস ফুসেও আনন্দ পেত না সে। নিজের চারিদিকে স্বাতন্ত্র্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে নিরালার নির্জন মহিমা উপভোগ করতেই সে ভালবাসতো। পাদ-প্রদীপের সামনে এসে গলায় মালা পরে হাততালি কুড়োবার লোভ ছিল না তার। কোথাও নামজাদা সাহিত্য-সভায় তাকে সভাপতিত্ব করতে দেখিনি। ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বার্ষিক উৎসবে একাধিকবার তাকে আমন্ত্রণ করেছি, কোনও না কোনও ছুতো দেখিয়ে সবিনয়ে সে এড়িয়ে গেছে।"[৩৫]

স্বভাব বিনীত, মার্জিত মানুষটি কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে স্পষ্ট ও নির্মম হতে জানতেন।

"একবার বহু অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূর্ণিয়া জেলা স্কুলে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে

তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। তৈলচিত্র উন্মোচন করলেন, বক্তৃতাও দিলেন। তারপর হঠাৎ শুরু হলো কলকাতার শিল্পীদের সিনেমা সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র। উঠে দাঁড়ালেন সতীনাথ। কবিগুরুর তৈলচিত্র পর্দা দিয়ে আবার ঢেকে সভা থেকে ধীর পদক্ষেপে নেমে বেরিয়ে গেলেন।"[৩৬]

এই অকৃত্রিম এবং আপোসহীন স্থির প্রত্যয় সতীনাথের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

॥ ছ ॥

সতীনাথ সচেতন শিল্পী ছিলেন। তিনি এমন একজন দ্রষ্টাও ছিলেন কোনো কিছুই যাঁর নজর এড়ায় না। অনুজ সদৃশ হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বর নাথকে বলেছিলেন—"এবার লেখার কাজ আরম্ভ করো। যা দেখেছ যথেষ্ট। লেগে পড়ো''।

কিন্তু নিজের জীবনে দেখার শেষ হয়নি কখনও। এই দেখার মধ্যে যেমন ছিল অপরিসীম জানবার আগ্রহ, তেমনই ছিল মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা। মানুষের প্রতি এই ভালবাসাতেই শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ সতীনাথ নিজের কৃষ্টি ও পরিধিকে অতিক্রম করে দেশের জনপথে নেমে আসতে পেরেছিলেন। কংগ্রেস কর্মী রূপে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দিনের পর দিন কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও গরুর গাড়ীতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সামান্যতম উপকরণে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন। অতি সাধারণ মানুষের আতিথ্যের উষ্ণ স্বাদ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন। জীবনকে সত্যরূপে এই মানবাত্মার মধ্যেই আবিষ্কার করলেন। মানুষকে চিনলেন সতীনাথ, তাদের কাছ থেকে জানলেন, তাদেরই একজন হয়ে উঠলেন, তবু নিজের মধ্যেই আত্মস্থ রইলেন।

সতীনাথের এই জীবন-অভিজ্ঞতার ফসল ফলল 'জাগরী'তে 'ঢোড়াই চরিত মানসে' এবং এরকম আরও গল্প ও উপন্যাসে।

সতীনাথ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে বাস্তবকে শুধু দেখেই ক্ষান্ত হননি, তাকে সাঙ্গীকৃত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। এইখানেই লেখক হিসাবে সতীনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সতীনাথের বিদেশ ভ্রমণের মূলেও ছিল এই জানা ও দেখার আগ্রহ।

"পাশ্চাত্য দেশের বিশেষ করিয়া ফ্রান্স, রাশিয়া ও স্পেনের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ১৯৪৯ সালে প্যারিস যান।"[৩৭]

তার ইউরোপ যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সেখান থেকে রুশ যাত্রা—সে সুযোগ ইউরোপ থেকে সংগ্রহ করা সহজতর হবে—এই ধারণা তাঁর হয়েছিল।

'রুশের নূতন সভ্যতার নূতন মানুষ দেখবার ইচ্ছাও তাঁর খুব। ভিসা-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো প্যারিস থেকেই রুশের ভিসা জোগাড় করা সহজ।''[৩৮]

কিন্তু বিদেশ যাত্রার অনুমতি তিনি সহজেই লাভ করতে পেরেছিলেন, যদিও রুশ যাত্রার অনুমতি লাভ করতে পারেন নি। এটি তাঁর পক্ষে বিশেষ দুঃখের কারণ হয়েছিল। তিনি বেশ কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন এই ব্যাপারে।

"রুশে যাবার অনুমতিপত্র পেল না লেখক, অধিকারী বর্গের কাছ থেকে। গত বিশ বছর থেকে তার রুশে যাওয়া নিয়ে এত জল্পনা কল্পনা, এ সম্বন্ধে এত বই পড়া। সেখানে পৌঁছেই যাতে সেখানকার নূতন মানুষদের নূতন সভ্যতা শুষে নিতে পারে, তার জন্য এতদিন থেকে মনটাকে তৈরী করা। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এত সময় ও উৎসাহ খরচ।''[৩৯]

এই ভ্রমণ সতীনাথের শিল্পদৃষ্টি ও মানসিকতা গঠনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর প্রবন্ধ, ডায়েরি প্রভৃতিতে ইউরোপের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়ে গেছে।

সতীনাথের ইউরোপ ভ্রমণ, পর্যটকের দেশভ্রমণ নয়, তিনি দেখেছিলেন, যা সাধারণ মানুষ দেখে না। তিনি প্রায় দু বৎসর কাল বিদেশে কাটিয়েছেন। কৃষ্টি, সভ্যতা, মনোরম দৃশ্য ও কীর্তির সম্ভার তিনি সাগ্রহে দেখেছেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে যা দেখেছেন তা হল সেই দেশের অন্তর যা আকাশ বাতাস মাটিতে লালিত সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাই……

"মধ্যে মধ্যে সে বেড়িয়ে আসে প্যারিসের বাইরে। গ্রামাঞ্চলেই যায় বেশি। সে চায় সাধারণ মানুষকে জানতে। দেশের নামজাদা লোকদের সঙ্গে দেখা করবার স্পৃহা তার নেই। ফরাসীদের কথা ভাবতে গেলেই, কেবলই মনে পড়ে একরাশ দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পী আর গণনায়কের নাম। কিন্তু যুগ যুগ ধরে যে লক্ষ লক্ষ ফরাসী নিজেদের নাম মুছে দিয়ে এই বড় কয়জনের নাম বড় হরফে লিখবার জায়গা করে দিয়েছে, সে বুঝতে চায় তাদের।…

সাধারণ লোকের অনায়াস সরল মনের গতি সে পেতে চায়। সাধারণ হওয়াটাই মানুষের চরম বিকাশ।''[৪০]

মানুষকে দেখেই তিনি অভিজ্ঞতার পুঁজি বাড়াতে চেয়েছেন, আর সেই অভিজ্ঞতাই শিল্পীর চেতনার রঙে রঙিন হয়ে সৎ সাহিত্যের রূপ নেবে। তাই…"পড়তে নয়, স্বাস্থ্যের জন্য নয়, সে এসেছে গাঁটের পয়সা খরচ করে মনের প্রসার বাড়াতে। কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতার পুঁজি কিছু বাড়িয়ে নিয়ে দেশে ফিরলেই কি তার চলবে? সে বাড়াবে লেখার পুঁজি।"[৪১]

সতীনাথের এই ভ্রমণের ফলশ্রুতি 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী।' 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' শুধু একখানি ভ্রমণ কাহিনী বা নিছক উপন্যাস মাত্র নয়। ইউরোপের সংস্কৃতির বিশ্লেষণে ও জীবনের তদ্গত উষ্ণতায় বাংলা সাহিত্যে 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' অনন্য।

অনেকে এর মধ্যে সতীনাথের জীবন-কাহিনীর সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। সে প্রয়াস সার্থক হওয়ার সম্ভবনা নেই বললেই চলে, তবে অন্যান্য রচনার তুলনায় সতীনাথ 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'-তে অনেক বেশী উন্মুক্ত এ কথা অনস্বীকার্য।

১৯৫১ সালের পর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সতীনাথ সাধাণভাবে নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করেছেন। এই সময় তিনি এক স্থিতধী আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন।

মাঝে দু একবার কলকাতা বা অন্য কোথাও গিয়েছেন দু এক দিনের জন্য। একবার বৃন্দাবন গিয়ে এক বৈষ্ণব আশ্রমে কিছুকাল বাস করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠ করে তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তবুও নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমিক দিনযাপনকে অনুসরণ করে এই বিশেষ ধর্মীয় জীবনযাপনকে আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কোন কিছুকেই বিশেষভাবে না জেনে সাহিত্যে তাকে রূপ দেবার কথা সতীনাথ ভাবতে পারতেন না। তাঁর সাহিত্যিক সততা ও সত্যনিষ্ঠা এতই প্রবল ছিল। তাঁর শেষ উপন্যাস 'দিগভ্রান্ত'-এর উপকরণ ও জীবনসত্য তিনি বৃন্দাবন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভ করেছিলেন।

বিদেশে ভ্রমণের পর পূর্ণিয়াই ছিল তাঁর স্থায়ী আবাস এবং এখানকার জীবন যাত্রাও ছিল নিয়মানুবর্তিতায় বৈচিত্র্যহীন। বস্তুতঃ পূর্ণিয়াই ছিল তাঁর বেশীর ভাগ রচনার ইতিহাস ও ভূগোল। চরিত্র, পরিবেশ, সংস্কৃতি সবই এই পূর্ণিয়াকে ঘিরে।

"পূর্ণিয়া ও পূর্ণিয়ার লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর ও অর্ধশিক্ষিত লোকদের যেমন জানতে পেরেছি সতীনাথের লেখার মাধ্যমে, সতীনাথ ভাদুড়ীকেও বার বার

খুঁজে পেয়েছি ধামদাহা হাটে ('চকাচকী' গল্পে) নাগর নদীর নড়বড়ে পুলের পাশে, আরুয়াখোমা বাজারে ('গণনায়ক' গল্প) কুশী নদীর বন্যার পট-ভূমিকায় রহিকপুরা গ্রামে, হরিণ-কোল সড়কে ('বন্যা' গল্প), গোবরাহার ঘূর্ণী, রিলিফ ক্যাম্পে, ডিউর‍্যাণ্ডার বেড়ায় ঘেরা ধবধবে চূনকাম করা 'আণ্ট-বাংলায়' বা ভঁইসদিয়ারা চরে। সৃষ্টি আর স্রষ্টার এত ঘনিষ্ঠ একাত্মতা খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা যায়।"[৪২]

॥ জ ॥

সতীনাথের জীবনাচরণের সর্বাধিক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এর চমকপ্রদ বৈপরীত্য তথা বৈচিত্র্য। তিনি একাধারে নিমগ্ন আত্মমুখী সাধক অন্যদিকে নিষ্ঠাবান বহির্মুখী কর্মী। অন্তর্মুখিতা আর বহির্মুখিতা উভয়ই তাঁর স্বভাবধর্ম। তাই তাঁর রচনায় ভাব ও রূপের আশ্চর্য সমন্বয়। বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে মিশেছে তন্ময় আত্মনিবিষ্টতা। কি অন্তর্জগত, কি বহির্জগত সর্বত্রই সতীনাথের অসামান্য পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের স্বাক্ষর। সতীনাথের প্রত্যেকটি লেখা বিষয়বস্তু ও চরিত্রসৃষ্টিতে অনন্য ও বিশিষ্ট। সতীনাথের নিজের জীবনে যেমন অন্বেষণের শেষ ছিল না, তেমনই তাঁর রচনায় বিষয়ের অভিনবত্বও সন্ধানের ত্রুটি ছিল না। তাই ক্লান্তিকর পুণরাবৃত্তি সতীনাথের রচনায় বিস্ময়কর ভাবে অনুপস্থিত।

মানুষ সতীনাথের কতকগুলি স্ববিরোধ ছিল এবং তারই ফলশ্রুতি তাঁর রচনা।

মৃত্যুভয়হীন মানুষটিকে যখন সামান্য রক্তপাতে বিচলিত হতে দেখি তখনই তাঁর প্রকৃতিগত বৈপরীত্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"অবিবাহিত—ভবিষ্যতের Security আছে, দুশ্চিন্তা সেদিক দিয়ে নয়। তবে কেন? আবছাভাবে বোঝা জিনিষ—স্পষ্ট বোঝা গেল একটি ছোট ঘটনায়। ডাক্তারে যেদিন বলল হার্ট খারাপ, সেদিন থেকে। মনের উপর থেকে বোঝা নেবে গিয়েছে। এখন বোঝে যে তার মনের আসল দুশ্চিন্তা ছিল যে যদি সে বুড়ো বয়সে খুব ভুগে মরে, যদি পক্ষাঘাত হয়, বহুকাল শয্যাগত ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। তাহলে? এখন হার্টের অসুখ শুনে তার মনে হলো যে যাক। আর তবে অনেককাল ভুগে মরতে হবে না—হঠাৎ মারা যাবে; মন শান্ত হয়ে আসে মুহূর্তের মধ্যে, সকলের

guess ব্যর্থ করে। কেন না আত্মীয় স্বজনরা ভাবছিলেন তার Heart disease এর খবরটা তাকে জানানো উচিত কি না—পাছে আবার মন খারাপ হয় ভেবে।"[৪৩]

"অথচ কিছুদিন আগেই পাউরুটির স্লাইস কাটবার সময় ওঁর আঙুল সামান্য একটু কেটে গিয়েএক ফোঁটা রক্ত বেরিয়েযায়। আর রক্ত দেখেই উনি হাতে কাটা স্লাইস নিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। হুঁশ হবার পরে বলেছিলেন—"ও কিছু নয়, আমি 'ব্লাড স্ট্যাণ্ড' করতে পারি না।"[৪৪]

নিজের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে সতীনাথ বিশেষ কিছু বলতেন না। তাঁর লেখার জন্য তাগিদ দিতে হত প্রকাশককেই, অথচ তিনিই আবার কোন স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীকে স্বেচ্ছায় সদ্যরচিত কোন রচনা পড়ে শোনান।

"বৈঠকখানার বারান্দায় চেয়ারে বসতে বললেন। আমরা দ্বিধাশঙ্কিত চিত্তে দাঁড়িয়ে আছি। ঘর থেকে একটা পত্রিকা হাতে বেরিয়ে এলেন, বললেন বোসো, বোসো, তোমাদের জন্মাতে দেখলাম, আমাকে লজ্জা কী? এখন কোন ক্লাসে পড়ো?

দশম শ্রেণীতে।

তাহলে বুঝতে পারবে। পড়ে শোনাই।

নীলমণিলতাকে উপলক্ষ করে একটা সরস রচনা লিখেছিলেন। পড়ে শোনালেন।"[৪৫]

সংসারধর্মে উদাসীন, কিন্তু সামাজিক ক্রিয়াকর্মে তিনিই অগ্রণী, ভাইঝিদের বিবাহ ব্যাপারে তিনিই কর্মকর্তা, তিনিই পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তায় মধ্যস্থতা করেন।

বইয়ের প্রকাশনা ব্যাপারে আগাগোড়া নিস্পৃহ থাকলেও 'জাগরী' মুদ্রনের ব্যাপারে একবার মামলা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এরকম বিপরীতমুখী মন ছিল বলেই পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচনেও সতীনাথ বৈচিত্র্যের সন্ধানী ছিলেন। তাই তাঁকে সমান উৎসাহে মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে 'চৈতন্য-চরিতামৃত' পড়তে দেখা যায়।

সতীনাথ মানুষকে চিরদিন ভালবেসেছেন। পিতার মত তিনিও ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না। প্রাণপণে তিনি একটা কিছু বিশ্বাস করতে চেয়েছেন। 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ' এই ভেবে মনে জোর আনতে চেয়েছেন। আঘাত এসেছে, শিথিল হতে চেয়েছে আস্থার ভিত,

আর আমৃত্যু সতীনাথ এই বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এক অনলস সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

'দিগভ্রান্ত'উপন্যাসে তাঁর এই সাধনার রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই সংগ্রামে অজেয় মনোভাব নিয়ে মার্জিত বিদগ্ধ, পরিশীলিত সতীনাথ নিরক্ষর, অবহেলিত মানবতার সন্ধান করে ফিরেছেন। সতীনাথের মানবিকতার এবং তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার এই বৈপরীত্যই হচ্ছে মূলসূত্র।

তাঁর মনঃপ্রকৃতির এই বিশেষ দিকটির সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাঁর অধিকাংশ রচনার তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ হবে।

জগৎ ও জীবনের সত্যান্বেষণে অক্লান্ত দ্রষ্টা সতীনাথ তাঁর শিল্পকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিভূমিতে পরম সততায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আবার তিনিই গভীর আত্মমুখী নিবিষ্টতায় মানুষের মনের অন্তর্লীন রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।

সতীনাথের ব্যক্তিসত্তায় মিশেছিল একদিকে অন্তর্মুখী জীবন জিজ্ঞাসা বা আত্মান্বেষণ অন্যদিকে বস্তুমুখী মানবসত্য বা জীবনান্বেষণ। এই দুই ধারার সম্মিলনে সতীনাথ এক নিরাসক্ত মানসিক স্থিতি অর্জন করতে পেরেছিলেন, তা তাঁর শিল্পকে অভিপ্রেত বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। স্বভাবের স্বাভাবিক প্রবণতাতেই মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন দুয়েরই সহৃদয় দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা হতে পেরেছিলেন।

সতীনাথের রচনায় তাই শৌখিন মজদুরি নেই কোথাও, নেই সচেতন কষ্টকল্পিত কোন কারুকার্য।

তাঁর রচনার ভিত্তি তাঁর ব্যক্তিসত্তায়, তাই শিল্পী হিসাবে তাঁর সততাও সন্দেহাতীত।

"জনজীবনের ব্যাপক সত্য ও অন্তর্জীবনের একান্ত সত্য, দুই-ই তাঁর সাহিত্যের বিষয়, সৃষ্টি-সাধনায় যথাযথ স্বীকৃত।"[৪৭]

বহির্জগতকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে তাকে আত্মস্থ করাই সতীনাথের জীবন ও সাহিত্য-সাধনার অভীষ্ট ছিল।

১৯০৬ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবনকাল বিস্তৃত। দেশ ও জাতির পক্ষে এ কালের তাৎপর্য অপরিসীম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বব্যাপী এক সংকটের পরিস্থিতি। পর পর দুটি যুদ্ধেও এই সংকট প্রশমিত হয়নি। জড় ও চেতনা সংক্রান্ত মানুষের পুরানো বিশ্বাসের ভিত্তি বৈজ্ঞানিকরা সমূলে নাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে মানুষের জীবনচেতনা

আচরণবিধি, ন্যায় অন্যায় বিচারের নিরিখ অবিশ্বাস্য ভাবে বদলে গেল। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্রুত ক্রমোন্নয়ন বিশ্বকে যেমন কাছাকাছি এনে দিল, তেমনি মানুষকে এক অসহায় সংশয়ের দ্বারে পৌঁছে দিল। এই রূপান্তরের তাপে ঈশ্বরাস্তিত্বে সংশয় ও বস্তুর প্রাণময়তায় বিশ্বাসী এক নতুন সাহিত্যের জোয়ার এল।

শরৎচন্দ্রের রচনাকাল মুখ্যতঃ দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকাল। অথচ দেশ কালের মানসলোকে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, তা শরৎচন্দ্রের রচনায় আশ্চর্যজনক ভাবে অনুপস্থিত।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যে পঞ্চাশ বছর সতীনাথের জীবনের বিশিষ্ট পটভূমি তা সতীনাথের মনোগঠনে অনন্য ভূমিকা নিয়েছে। এই সময়ে বিশ্বব্যাপী জড়, বিজ্ঞান ও মানুষের অভাবনীয় গতিশীলতার সঙ্গে ভারতবর্ষেও কতকগুলি বিশিষ্ট ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ের মধ্যে আছে ভারতবর্ষের প্রথম স্বদেশী যুগের (১৯০৫—১৯০৮) অভ্যুদয়, পরে গান্ধীযুগের বিস্তার এবং সবশেষে দেশের খণ্ডিত মুক্তি।

এই পটভূমিকা সতীনাথের জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ ছাড়া আর একটি অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, সতীনাথ এক বিশিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর উন্নতরুচি এবং জ্ঞানানুসন্ধিৎসু মানসিকতার জন্য তাঁর পারিবারিক আবহাওয়া মূলতঃ দায়ী ছিল।

১৮৬৯ সালে নদীয়া জিলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী সম্ভ্রান্ত খাঁ ভাদুড়ী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দুভূষণের পিতামহ সুধাময় খাঁ কৃষ্ণনগরের বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি ছিলেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর মাতামহী মুক্তকেশী দেবী (মৃত্যু ১৯২৮, জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না) উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক রামতনু লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রসাদ লাহিড়ীর কন্যা ছিলেন। অর্থ, প্রতিপত্তি, এবং শিক্ষা, বাংলার নবজাগরণের এই ত্রিমুখী ধারায় ইন্দুভূষণ ভাদুড়ীর পরিবার পুষ্ট ছিল।

কৃষ্ণনগরে, বাংলাদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রথম দিকেই ভাদুড়ী বংশের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ীরা পাঁচ ভাই ছিলেন। কনিষ্ঠ ক্ষিতিভূষণ ব্যতীত অপর চার ভ্রাতাই উচ্চশিক্ষিত এবং সকলেই অধ্যাপনায় ব্রতী ছিলেন।

শশধর খাঁ ভাদুড়ীর প্রথম পুত্র চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী কলকতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র কুলভূষণ ভাদুড়ী লক্ষ্ণৌ-এর ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী পিতার তৃতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি নিজেও কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে স্বর্ণপদক নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেন। ইন্দুভূষণ ভাদুড়ীর অনুজ জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী, তিনিও একই কলেজে অধ্যাপনা করতেন। একই কলেজে একই বিভাগে তিন ভাই থাকার জন্য তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান আপত্তি করেন। তখন ইন্দুভূষণ নূতন করে আইন পাঠ আরম্ভ করেন এবং আইন পাঠ সমাপন করে জীবিকান্বেষণে পূর্ণিয়ায় যান। পূর্ণিয়া সে সময়ে বাংলাদেশেরই অন্তর্গত ছিল। বাংলা বিহারের কৃত্রিম বিভাগ তখনও হয়নি। পূর্ণিয়া শহরে বাঙ্গালী সমাজের পত্তন হয় ইংরাজ আমলের প্রথম দিকে, সিপাহি বিদ্রোহের কিছু পরে। ইংরাজ সরকারের অধীনে চাকুরির জন্য অনেক বাঙ্গালী সন্তান সেখানে বসবাস আরম্ভ করেন। এছাড়া আদালতে আইনজীবী, মোক্তার এবং চিকিৎসক হিসাবেও অনেক বাঙ্গালী বিশেষ সুনামের সঙ্গে বসবাস আরম্ভ করেন। এদের কেন্দ্র করে পূর্ণিয়া শহরে এক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

পূর্ণিয়া শহরে সেই সময়কার বাঙ্গালীদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন স্থর, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাধিকা দে, ভুবন লাহিড়ী, পার্বতী সেন, ডঃ কামাক্ষা প্রসাদ ঘোষ, জানকী ভট্টাচার্য প্রভৃতি অন্যতম ছিলেন।

পুরানো গেজেটে দেখা যায় সেই সময় এই অঞ্চলে দু'শোর বেশী নীলকর সাহেব পরিবার বসবাস করতো, তাদের দাপটে সমস্ত জেলা সন্ত্রস্ত থাকত। তাদের বিচিত্র খেয়াল এবং মর্জিরও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে।

কিন্তু সাহেবদের কাছ থেকে সম্মান এবং সমাদর বাঙ্গালী বাবুদের প্রাপ্য ছিল। সেই সময়ে পূর্ণিয়া কোর্ট ছিল উকিলদের কাছে স্বর্ণভাণ্ডার স্বরূপ। ভাগলপুর থেকে সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছুকাল পূর্ণিয়া কোর্টে ওকালতি করেছিলেন।

কিন্তু ওকালতির পক্ষে সুবর্ণযুগ হওয়া সত্ত্বেও এই সীমান্ত জেলায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল উত্তেজনাহীন, সহজ ও নিস্তরঙ্গ।

ফণীশ্বর নাথ রেণুর বর্ণনায় পাওয়া যায়—"আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত পূর্ণিয়া জেলার গ্রামসমাজের সাধারণ গৃহস্থেরা নিজের ঘরে বাংলা শিশুবোধ, কৃত্তিবাসি রামায়ণ, কাশীরামদাসী মহাভারত এবং বাংলা পঞ্জিকা রাখা অতি আবশ্যক মনে করতেন, পড়ুয়া ছেলেদের প্রশ্ন করা হত…বাংলা রামায়ণ-মহাভারত পডতে পারো? ভগতাই গায়নে রাজাহরিশ্চন্দ্রের পালা গাইতে পারো? প্রত্যেক গ্রামে একাধিক বারোয়ারি বা ব্যক্তিগত খোল নিশ্চয়ই থাকত। খোল মানে সরাসরি নদীয়া থেকে আনানো শ্রীখোল। তাই ভাদ্রমাসের রাত্রে—শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর কয়দিন আগে থেকেই, আগের রাত পর্যন্ত খোল—করতালের তালে তালে ভগতাই গায়েনের কলিগুলো বাতাসে ভেসে বেড়াত।···সারা জেলায়—রেলওয়ে ষ্টেশন মাষ্টার থেকে আরম্ভ করে স্কুলের মাষ্টার উকিল-মোক্তার, হাকিম, ডাক্তার-বৈদ্য, রোড সরকার পর্যন্ত—বাঙ্গালীদের 'রাজ' ছিল।"[৪৭]

ইংরাজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসার জন্য কলকাতা বাঙ্গালী সমাজের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল এবং পূর্ণিয়ায় যারা নতুন করে এক অভিজাত মহলের অবতারণা করলেন, তারাও সকলে কলকাতারই নব-আলোক প্রাপ্ত ছিলেন। এই নব-আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্থানীয় অনগ্রসর মানুষের কোন ভাবেরই আদান প্রদান সম্ভব হয়ে উঠেনি। এর ফলে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা এবং সংস্কৃতির ব্যবধান রচিত হয়। নবশিক্ষিত কৃষ্টিসম্পন্ন যুবকেরা মনের দিকে একাকী হয়ে পড়ে, কলকাতার শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজাত পরিবারের যুবকেরা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হওয়ার চেষ্টা করলেও তাদের অজ্ঞাতেই একটি অদৃশ্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল।

সতীনাথ ভাদুড়ীর অগ্রজ ভূতনাথ ভাদুড়ী বলেছেন—'আমাদের পারিবারিক শিক্ষা ও কৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছিলেন আমাদের ঠাকুমা রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। কৃষ্ণনগরে ইংরাজি ধরনের শিক্ষার প্রচলন প্রথম দিকেই। আমাদের পারিবারিক motto ছিল 'Plain living and high thinking।' এই পরিবেশে মানুষ সতীনাথ। পরবর্তীকালে তিনি যখন রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন তখন তিনি গান্ধীজীর নির্দেশিত পথই অনুসরণ করেন। অতি সাধারণ ভাবে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন, অর্থ এবং খ্যাতির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিলাস ব্যসনে নিজেকে নিয়োজিত করেননি। মনে হয়, পারিবারিক প্রভাব তাঁর মধ্যে অতিমাত্রায়

সক্রিয় ছিল। তিন ভাই, চার বোনের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ী ভাইদের সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। সতীনাথ ১৯০৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর পূর্ণিয়া শহরের ভাট্টাবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। অথচ ছোট একটি নোট বইয়ে সতীনাথ তাঁর পাশপোর্টের বিবরণে নিজের হাতে লিখে রেখেছেন, Date of birth 28.10.06।

তাঁর জন্মদিনটি যে বৃহস্পতিবার সেই প্রসঙ্গে 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'তে একটুখানি মন্তব্য আছে, 'বৃহস্পতিবারের সঙ্গে লেখকের জীবনটা গাঁথা হয়ে যাচ্ছে বারে বারে।'[৪৮]

॥ ৩ ॥

সতীনাথ ভাদুড়ীর পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি সতীনাথ ভাদুড়ীকে শিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় প্রেরণ করেননি। স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য সতীনাথ কলকাতায় আসেন নি। কলকাতার সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর কোন সম্পর্ক ছিল না। এমন কি, পরবর্তীকালে যখন তিনি সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তখনও তিনি কলকাতার বই-পাড়া অঞ্চল কলেজ ষ্ট্রীটের কোলাহল থেকে নিজেকে নির্বাসিত রেখেছিলেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর স্কুল জীবন শুরু হয় পূর্ণিয়ার ভাট্টাবাজার 'ইনফ্যাণ্ট স্কুল'-এ। এই স্কুলে তিনি ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কাটান। তার পরে পূর্ণিয়ার জেলা স্কুল। তাঁর দাদা ভূতনাথও পড়েছেন ওই একই স্কুলে, সেই পুরানো বাড়ীটি এখন আর দেখা যায় না। কিন্তু সেই পুরানো বাড়ীর বৃক্ষবহুল প্রাঙ্গনটিই সতীনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

শিক্ষক বা শিক্ষাবিষয়ক অন্য কোন কিছুর প্রতি সতীনাথের আকর্ষণ জন্মাবার বিশেষ সুযোগ ঘটেনি। তাই তাঁর স্মৃতি রোমন্থনে কোন বিশেষ শিক্ষক কোন বিশিষ্ট আদর্শ নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হননি। এর কারণ সম্পর্কে সতীনাথ নিজে পরবর্তী কালে বিশ্লেষণ করেছেন—

'জেলা স্কুলে পড়বার একটা মস্ত অসুবিধা যে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যে রকম নিবিড় ও স্থায়ী সম্বন্ধ থাকা উচিত তা গড়ে উঠতে পায় না। গুরু শিষ্যের মধ্যের সম্পর্কটুকু সেখানে কেবল ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। আমি জেলা স্কুলের শিক্ষকদের ত্রুটির কথা বলছি না। তাঁদের মধ্যে কেউ

কেউ ভাল পড়াতে পারতেন। অনেকে হয়তো শিক্ষা বিভাগের নিয়মকানুন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন ; কিন্তু এতকালের ব্যবধানের পর সে সব কথা মনে সাড়া জাগায় না। মনে থাকত যদি তিনি আমার স্কুল জীবনের অসুখের সময় একদিন বাড়ীতে দেখতে আসতেন, মনে থাকতো যদি নির্ঝঞ্ঝাটে চাকরি করা ছাড়া অন্য কোন আদর্শে আমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারতেন। এই জন্যই জেলা স্কুলের ছাত্ররা পরবর্তী জীবনে সাধারণতঃ গুরুদের কথা মনে রাখে, শুধু সংস্কার বশে, হৃদয়ের টানে নয়। এ অবশ্য আমার নিজের ধারণা মাত্র, ভুল হলে আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না। পরস্পরের মধ্যে এই মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি বলে, স্কুল জীবনের স্মৃতির দৈবাৎ রোমন্থনে যে আনন্দের আমোদটুকু পাই, তার মধ্যে শিক্ষকদের স্থান নেই।'[৪৯]

বাল্যাবস্থা থেকেই পাঠে খুব মনোযোগী থাকার জন্য তিনি সকলেরই স্নেহের পাত্র ছিলেন। স্কুল জীবনেই তাঁর মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। স্কুলের হেড্‌মাষ্টার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং সংস্কৃত পণ্ডিত তুরন্তলাল ঝা সতীনাথকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ক্লাসের সেরা ছাত্র হওয়ার জন্য তিনি সতীনাথকে 'ক্লাস্‌কী রোশনী' বলতেন।

ছাত্র জীবনের পণ্ডিত মশাইয়ের স্মৃতি সতীনাথের পরবর্তী সময়েও ছিল, এই পণ্ডিতমশাইকে 'তুরন্তলাল মিশ্র 'রূপে' 'বৈয়াকরণ' ছোট গল্পটিতে পাওয়া যায়।

বাল্যাবস্থা থেকেই পাঠে মনোযোগ থাকার জন্য তিনি বাইরের উত্তেজনায় বেশী অংশ গ্রহণ করতেন না। সুবোধ বালক বলতে যা বোঝায় সতীনাথ অনেকটা সেই প্রকৃতির ছিলেন।

সেই সময় সতীনাথের সহপাঠী ও সমসাময়িক ছিলেন কৃপানাথ ভাদুড়ী, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সত্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, কালিপদ মৈত্র, ফণিগোপাল সেন, প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। কৃপানাথ ও সতীনাথের মধ্যে পরীক্ষার সময় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। তবে বেশীর ভাগ সময় সতীনাথই প্রথম হতেন।

এ বিষয়ে 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'তে লেখক স্মরণ করেছেন 'স্কুলে প্রতি পরীক্ষার পর তার উপরের মন ভাবতো যে সে কিছুতেই পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হতে পারবে না ; কিন্তু ভিতরের মনটা জানতো যে সে নিশ্চয়ই ফার্ষ্ট হবে। আর ভিতরের মন কখনও ভুল বলেনি।'[৫০]

পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী অত্যন্ত রাশভারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সতীনাথ পিতাকে সমীহ করে চলতেন। সতীনাথ যখনই ক্লাসের প্রথম পুরস্কার নিয়ে আসতেন, ইন্দুভূষণ স্বভাবগত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলতেন, 'বেশ আছে, রেখে দাও।'

সতীনাথের পড়াশুনায় উৎসাহ ও প্রেরণার মূলে ছিলেন তাঁর মা।

অদম্য পাঠের নেশা সতীনাথের বাল্যকাল থেকেই ছিল। ফলে আর পাঁচজন দুরন্ত বালকের মত অন্য কোন আকর্ষণে তিনি বাধা পড়েননি।

স্কুল জীবনে একবার বিজয়া দশমীর দিন কৌতূহলবশে বন্ধুদের সঙ্গে সতীনাথ সামান্য সিদ্ধি খেয়েছিলেন। তার ফল হয়েছিল ভয়ানক। অন্যান্য বন্ধুরা যখন নেশা কাটানোর জন্য কাঁঠালপাতা চিবিয়েই সুস্থ হয়, সতীনাথের জন্য সেখানে ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। ফলে কয়েকদিন তিনি গৃহবন্দী ছিলেন।

ছোটবেলায় একবার 'ডবল নিমোনিয়া'য় তিনি ভুগেছিলেন। এছাড়া সতীনাথের স্বাস্থ্য ছিল সাধারণ স্তরের। বাইরের খেলাধূলায় বেশী অংশগ্রহণ না করলেও, মার্বেল খেলা, ক্যারাম খেলা এবং ব্যাড্‌মিণ্টনে সতীনাথ অসাধারণ নিপুণ খেলোয়াড় ছিলেন।

সতীনাথ বাহ্যজীবন এবং ঘটনা অন্তরের সঙ্গে মিশিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন তখন বাল্যাবস্থার অনেক স্মৃতিই তিনি ভুলতে পারেন নি।

সতীনাথ ভাদুড়ী পূর্ণিয়ায় যে জিলা স্কুলে শিক্ষারম্ভ করেন, সেই স্কুল তখন স্থানীয় সদর হাসপাতালের কাছেই ছিল। পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ী 'আণ্টা বাংলা' নামে একটি ছোটগল্প রচনা করেন। এটি একটি রোমান্টিক গল্প, স্কুলে থাকাকালীন বালক বয়সে প্লাণ্টার্স ক্লাব অর্থাৎ 'আণ্টা-বাংলা' তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, তা তিনি বয়সকালেও ভুলতে পারেননি। তিনি অতি বাস্তবধর্মী লেখক ছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার এবং চেনা মহলের বাইরে তাঁর গল্প উপন্যাসের সংখ্যা নগণ্য বললেই চলে। তিনি যে অল্প কয়েকটি রোমান্টিক-ধর্মী কাহিনী রচনা করেছেন, তার মধ্যে 'আণ্টা বাংলা' অন্যতম।

এই 'আণ্টা বাংলা' বা প্লাণ্টার্স ক্লাব—স্কুল থেকেই দৃশ্যমান ছিল। বালকের কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তিনি দূর থেকে যখন 'প্লাণ্টার্স ক্লাব'টি দেখতেন তখন

থেকেই তাঁর বালকমনে এক অপার রহস্যের ছাপ পড়ে, তা পরবর্তীকালে এই রোমান্টিক গল্প রচনার প্রেরণা দিয়েছিল। 'আণ্টা বাংলা'র যে নিখুঁত চিত্ররূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন সতীনাথ তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

'একটি বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে বিলাতী কটেজের ধরনের বাড়ী। ধবধবে চুনকাম করা দেওয়ালের উপর সোনালী খড় দিয়া ছাওয়া জ্যোতির্মণ্ডলীর মধ্যে শ্বেত হস্তীর মতো। ডিউর‍্যাণ্ডার বেড়ার উপর দিয়া বহুদূর হইতে লোকে দেখিত ভীতি, কৌতুহল ও সম্ভ্রমের সহিত। তর্জনী সংকেতে সঙ্গীকে দেখাইয়া দিত, 'ঐ ভাখ আণ্টা-বাংলা"। সাহেবদের কুকুরগুলি পর্যন্ত ছিল বিলাতী। ক্লাবের মেথর 'দুসাধ' চাকরগুলো আর কেরানীবাবু ছাড়া কোনো নেটিভ দেখে নাই বারান্দায় পাতা সারি সারি চেয়ারগুলি, ছাতার মতো গুগ্ গুল গাছটার তলায় পাতা চেয়ার, টেবিল, টিপয়। কোনো, ইণ্ডিয়ানের কানে পৌছায় নাই, ঘরের ভিতরের বিলিয়ার্ড বলের শব্দ, কাচের গ্লাসের নিক্কণ; সাহেবদের কোচম্যান সহিসগুলোও পর্যন্ত নয়। তাদের গাড়ি দাঁড় করাইতে হইত ফটকের বাহিরে, অশত্থ গাছের তলায়। চীনের প্রাচীরের মতো রহস্যভরা ডিউর‍্যাণ্ডার বেড়া—এমন সমান করিয়া ছাঁটা যে, মনে হয় বুঝি বা উহার উপর শোয়া যায়—ভিজা মেঝে, এমন কি, পেটনিচু খাটিয়ার চাইতেও আরামে শোয়া যায়।'[৫১]

'জাগরী' উপন্যাসেও প্লাণ্টার্স ক্লাব অর্থাৎ 'আণ্টা বাংলা'র উল্লেখ আছে।

"হাইস্কুলের পাশে প্ল্যাণ্টারর্স ক্লাব। দুই কম্পাউণ্ডের মধ্যে তারের বেড়া। ক্লাবে একটি চ্যারিটি মেলা না কি হইতেছে। মেমেরা নানাপ্রকার শৌখিন জিনিসের দোকান খুলিয়াছে। নীলু আর বিলু ঐ তারের উপর চড়িয়া সাহেব মেমদের উৎসব দেখিতেছে।"[৫২]

সতীনাথের স্কুল জীবন পূর্ণিয়ায় অতিবাহিত হলেও উচ্চশিক্ষা পাটনায়। ১৯২৪-১৯৩১ সাল পর্যন্ত সতীনাথ পাটনায় কাটান। সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন বিভূবিলাস ভৌমিক, তুলসী মুখোপাধ্যায় ও ছকু মুখোপাধ্যায়। পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটনা কলেজের ইংরাজী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীদেবীদাস চট্টোপাধ্যায়, বিহারের প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা কলিম আহমদ, ফজলুল রহমান প্রভৃতিও সতীনাথের সহপাঠী ছিলেন।

পাটনায় সতীনাথ প্রথমে একটি বাঙালী মেসে থাকতেন। পরে বি. এ.

পড়ার সময় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মহামেডান হষ্টেলে' চলে যান। এই ঘরেই যশস্বী লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় পাঠ্যাবস্থায় ছিলেন।

সতীনাথ ১৯২৬ সালে পাটনা সায়েন্স কলেজ থেকে আই. এস. সি পাশ করেন দ্বিতীয় বিভাগে। এরপর তিনি পাটনা কলেজে বি. এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে ইকনমিকসে অনার্স নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩০ সালে দ্বিতীয় বিভাগে ইকনমিকসে এম. এ. এবং তারপর পাটনা ল' কলেজ থেকে বি. এল ১৯৩১ সালে।

ছাত্রাবস্থাতেই (১৯২৮ সালে) সতীনাথের মাতৃবিয়োগ ঘটে। এই দুঃখময় ঘটনা সতীনাথকে তীব্রভাবে আলোড়িত করেছিল। তাঁর অন্তর্মুখী নিরাসক্ত মন জীবনের প্রতি আরও নিস্পৃহ হয়ে পড়ে।

সতীনাথের ছাত্রাবস্থায় ভারতবর্ষের রাজনীতি উত্তেজনার তুঙ্গ মুহূর্তে উত্তীর্ণ। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন পর্যন্ত গান্ধীবাদী রাজনীতির চরম বিকাশ। যে কোন সতর্ক যুবকের সক্রিয় গ্রহিষ্ণু মনে এ'সবের প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সতীনাথের এ বিষয়ে কোন বহিঃপ্রকাশ লক্ষিত হয়নি। কলেজ জীবনে সতীনাথের রাজনীতির সঙ্গে বিশেষ কোন যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি; যতদূর জানা যায়, এই সময় সতীনাথ এম. এন. রায়ের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হন।

স্কুলে পড়বার সময়ে পুলিশের ভয়ে একবার 'আনন্দমঠ' পোড়াতে হয়েছিল, অল্প বয়সের রাজনীতি সম্পর্কে আর কোন ব্যক্তিগত উল্লেখ তাঁর লেখায় দেখা যায় না।

১৯৩১ সালে সতীনাথ 'নবশক্তি'তে 'ইংলণ্ডে গান্ধীজী' নামে প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু তাতেও তাঁকে গভীরভাবে রাজনৈতিক চেতনায় আচ্ছন্ন বলে মনে হয় না, যদিও স্বাদেশিকতার অভিমান তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

॥ ৪ ॥

১৯৩০ সালে পাটনা থেকে অর্থনীতিতে এম. এ এবং পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৩১ সালে বি. এল পাশ করে তিনি ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সাতবছর আইন ব্যবসা করেন। তরুণ আইনজীবী রূপে তিনি অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পান। সতীনাথের মেধা অত্যন্ত প্রখর ছিল। সতীনাথের

পিতা ইন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীও পূর্ণিয়া কোর্টে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ছিলেন। সতীনাথ পিতার সহকারী হিসাবে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন : কিন্তু তাঁর আইন সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান অচিরেই তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। জুনিয়ার উকিল হওয়া সত্ত্বেও জেলা জজেরা অনেক সময় তাঁকে ডেকে এনে নানা রুলিং জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন।

আইন বিষয়ে পাঠ্যাবস্থাতেই সতীনাথ নিজের তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় রেখেছিলেন।

"ওকালতি পড়বার সময়েই ওঁর তৈরী করা 'মিশিল' পড়ে পূর্ণিয়ার বার লাইব্রেরীতে সিনিয়ার উকিলেরা দাতের তলায় আঁগুলি দিতেন—'এতো আর একটা ইন্দুবাবু তৈরী হয়ে গেছে।'"[৫৩]

সতীনাথের স্বভাবই ছিল যখন যে বিষয়টিতে তিনি আত্মনিয়োগ করতেন তাতে আকণ্ঠ ডুবে যেতেন। আত্মসন্তুষ্টির নিশ্চিন্ততা সতীনাথের জন্য নয়। তিনি যখন আইনকে জীবিকা হিসাবে নিয়েছিলেন তখন সে বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। বার লাইব্রেরীতে বইয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন। এই নিবিড় তন্ময়তা রূপ লাভ করেছে 'অনাবশ্যক' গল্পে।

"বার লাইব্রেরী হচ্ছে জেলার 'ব্রেন-ট্রাষ্ট'। কী ছাই ইতিহাসের বই পড়ে লোকে। এখানকার বুদ্ধিদীপ্ত মিঠেকড়া মন্তব্যগুলোই দেশের অলিখিত ইতিহাস—আসল ইতিহাস। এরা প্রত্যহ মুখে মুখে ইতিহাসের ডিক্‌টেশান দিয়ে যাচ্ছে। তবু সেগুলো কিছুতেই লেখা হবে না। ইতিহাসের টেক্‌সট্-বুকের পাতায়। অলিখিত অংশটাই শাঁস, লিখিত অংশ হচ্ছে খোসা।"[৫৪]

আইনশাস্ত্রে সতীনাথ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, কিন্তু জীবিকা হিসাবে আইনকে কোনদিন মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। বাল্যকালেই যে আদর্শবাদিতার ঝোঁক তাঁর মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিল, তার সঙ্গে জীবিকার সংঘাত প্রায়শই হত। তাছাড়া ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করার মানসিক প্রবণতা তাঁর ছিল না। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক অনীহা ছিল। বাবার সঙ্গে যখন তিনি ওকালতি করতেন তখনই তাঁর এই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'বাবা কোর্টে যান গাড়িতে, সতীনাথের ছিল সাইকেল। অনেক সময়ে

বাবা হয়তো চান সতীনাথকে তাঁর সঙ্গেই নিয়ে যেতে, বিশেষত বৃষ্টিবাদলের দিনে। পুত্রবধূকে ডেকে বলেন, জিজ্ঞেস কর তো বৌমা, আমার সঙ্গে ও যাবে না কি আজ। কিন্তু সতীনাথ জানিয়ে দেন তাঁর বৌদিকে, না, একাই যাবেন তিনি।'[৫৫]

দীর্ঘ সাতবছরেও আইন ব্যবসায়ে সতীনাথ যথার্থ মনোনিবেশ কখনই করতে পারেননি। তার কারণ বোধহয় এই যে, তাঁর অনুভূতিশীল মন এই জীবিকার মধ্যে আশ্রয় পেত না। এ বিষয়ে তাঁর নিজের মন্তব্য—

'উকিলের কারবার মন নিয়ে নয়। তার কারবার লেখা আইনের অক্ষর নিয়ে, তারই সূক্ষ্ম চুলচেরা ভেদাভেদ নিয়ে, বড় জোর আসামীর অপরাধের উদ্দেশ্য নিয়ে। অপরাধের উদ্দেশ্যটাকে কোনোরকমে একবার আইনের ধারার ছকে ফেলতে পারলে সে বেঁচে যায়। বাইরে প্রকাশভঙ্গিটা যে মনের খোলস, তা উকিল বুঝবে না। আসল জিনিস রইল পড়ে যেমন কে তেমন; ছায়া ধরতে ধরতেই জীবন গেল। এই অবজ্ঞার প্রতিহিংসা নেয় মন সুবিধা পেলেই।'[৫৬]

কাজেই সতীনাথেরই ভাষায় 'পাটোয়ারী মাথাটার সঙ্গে অধ্যবসায়ী লাজুক মনের লড়াই বেশীদিন চলল না।' ব্যবহারজীবী সতীনাথ আইন ব্যবসায়ে ইস্তফা দিলেন। যদিও সতীনাথের ওকালতী জীবন সুদীর্ঘ হয়নি তথাপি এই সময় তাঁর মধ্যে এমন কতকগুলি বৃত্তির স্ফূরণ দেখা যাচ্ছিল যা পরবর্তী কালে মহীরুহরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকাকালীন সতীনাথ রাজনীতি, সাহিত্য ও নানা জনহিতকর কাজে জড়িয়ে পড়েন।

সতীনাথের চরিত্রের সর্বাধিক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল তাঁর দ্বৈতসত্তা। একদিকে তাঁর অন্তর্মুখী মননের জগৎ, অন্যদিকে বহির্মুখী কর্মের আলোকময় বিশ্ব। এই সময়টিতেই সতীনাথের এই দ্বৈতসত্তার সর্বাধিক প্রকাশ ঘটে। আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে দুরন্ত অধ্যবসায়, সযত্ন ভাষা-শিক্ষা, সাগ্রহ চিত্রাঙ্কন এবং সর্বোপরি উন্মুখ সাহিত্যচর্চার যে বিদগ্ধ পরিমণ্ডল তারই সঙ্গে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, বলিপ্রথা তুলে দেবার জন্য আন্দোলন, মদের দোকানে পিকেটিং, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিবিধ কর্মসূচীতেও সতীনাথ নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

পরবর্তীকালের রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক সতীনাথের প্রস্তুতিপর্ব এই সময়েই শুরু হয়েছিল।

॥ ৫ ॥

মানুষের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ মানব-জীবনের অপার রহস্য এবং দশের জন্য কাজ করার দুর্দমনীয় নেশা তাঁকে বারবার ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিল। এরই জন্য তিনি পরিণত বয়সে রাজনীতিতে অনেকটা আকস্মিকভাবেই যোগদান করেন। রাজনীতিতে যোগদানের বিশেষ কোন প্রস্তুতি পূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। এইজন্য তাঁর কংগ্রেসে যোগদানে সেদিন অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

সতীনাথ ভাদুড়ী ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে সর্বোদয় নেতা বৈদ্যনাথ চৌধুরীর টিকাপট্টি আশ্রমে যোগদান করেন। সক্রিয় কর্মী হিসাবে সতীনাথের কংগ্রেসে যোগদান সেদিন পূর্ণিয়া শহরে তুমুল আলোড়ন আনে।

বৈদ্যনাথ চৌধুরীর টিকাপট্টি আশ্রম পূর্ণিয়া শহর থেকে ২০।২৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। সতীনাথ ভাদুড়ীর অগ্রজ শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী পিতা শ্রীইন্দুভূষণ ভাদুড়ীর টেলিগ্রাম পেয়ে সতীনাথ ভাদুড়ীকে ফিরিয়ে আনার জন্য টিকাপট্টি আশ্রমে যান, কিন্তু সতীনাথ সেদিন পিতার অনুরোধ উপেক্ষা করে দাদাকে ফিরিয়ে দেন। দেশমাতৃকার সেবাই তখন সতীনাথের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে গৃহের বন্ধন তাঁর কাছে একান্তই মূল্যহীন ছিল। এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে ভূতনাথ ভাদুড়ী বলেছেন—

"টিকাপট্টি আশ্রমে গিয়েছিলাম তাকে ফিরিয়ে আনতে, আমার সহযাত্রী ছিল সতুর অন্তরঙ্গ বন্ধু পূর্ণিয়ার দ্বারিক স্থর ও কুর্শেলা থেকে কমলদেব নারায়ণ সিন্‌হা। সে আমাকে ফিরিয়ে দেয়।"

সতীনাথ ভাদুড়ীকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন, যাঁরা তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থিত স্পন্দনের শিহরণ অনুভব করতে পারতেন, তাঁদের অনেকেই সেদিনের আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, কেননা তাঁর মত একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির পক্ষে অর্ধশিক্ষিত আশ্রম পরিচালকের সঙ্গে একাসনে বসে কাজ করা কিছুটা দুরূহ ছিল।

নেতৃত্ব দেবার গুণাবলী নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তীক্ষ্ণ

বুদ্ধি, অসাধারণ মেধা এবং গভীর রসবোধ ছাত্রাবস্থাতেই সতীনাথকে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছিল।

লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যিক জীবনের উৎসমূলে ছিলেন। তিনি সতীনাথ ভাদুড়ীকে নানাভাবে সাহিত্য-জীবনে প্রেরণা দিয়েছিলেন—তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

'২৭.৯.১৯৩৯—কালকে বল্‌লে সতু টিকাপট্টি গিয়েছে। Law practice ছেড়ে দিলে, কথাটা বিশ্বাস হয়নি। আজ শুনছি সত্যই সে Congress-এর কাজ করবে, তাই গিয়েছে। ওরূপ intellect-এর ছেলে, চাকরী কি Court attend করতে উৎসাহ পায় না। তারা বরাবর বড় aspiration পোষণ করে, সাধারণে যা করে তাতে মন বসেনা।

কিন্তু Congress circle-এই বা তার মন তুষ্ট থাকবে কি করে? সে হল একটি ক্ষুরধার intellect-এর ছেলে, সত্যপ্রিয়, বিদ্যাপ্রিয়, Sincere, কিন্তু ও circle-এ যে প্রায়ই মূর্খ মিথ্যাভাষীর সঙ্গ জুটবে, মনের মতো দোসর বা বন্ধু পাবে না। কারো সঙ্গে বনবে না, কি করে কাটাবে?" ৫৮

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সস্নেহ আশঙ্কা পরবর্তীকালে সত্যে পরিণত হয়েছিল।

সতীনাথ ভাদুড়ীর রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৯৩৯ সাল থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুও ১৯৩৯ সাল থেকে। বিশ্বব্যাপী এই বৈপ্লবিক অস্থিরতার মধ্যে কোনো মতেই সতীনাথ নিজেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাখতে পারলেন না। তিনি সরাসরি কংগ্রেসে যোগদান করলেন। যদিও সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন ১৯৩৯ সালে, কিন্তু রাজনীতির মত জটিল বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ তাঁর দীর্ঘদিনের। তিনি বিবিধ বিষয়ের আগ্রহী পাঠক ছিলেন। তাঁর মধ্যে রাজনীতির মত জটিল শাস্ত্রও অন্যতম ছিল, যা তিনি নিষ্ঠা সহকারে পাঠ করেছিলেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গী এবং অনুজ প্রতিম ডঃ বীরেন ভট্টাচার্য সাক্ষ্য দিয়েছেন—

'মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ, র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম্, প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন তিনি। ক্যাপিটালিজম্, স্যোসালিজম্, রাশিয়ার অর্থনীতি বৃটিশ ডেমোক্রেসি সব ছিল তাঁর নখদর্পণে। নতুন চিন্তামূলক বই পেলে সতীনাথ সব ভুলে যান। পড়া তাঁর নেশা ছিল। গবেষণা করা ছিল তাঁর পেশা।'৫৯

সতীনাথ ভাদুড়ী মোট নয় বছর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই নয় বছরের মধ্যে তিনি তিনবার কারাবরণ করেছেন। প্রথম ১৯৪০ সালের জানুয়ারী। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য, স্থানান্তরিত হন হাজারীবাগ জেলে। সেখানে তার পাশের জেলে থাকতেন পূর্ণিয়া কংগ্রেসের অনাথকান্ত বসু, প্রাক্তন পার্লামেণ্ট সদস্য ফণিগোপাল সেন প্রভৃতি। ঐ জেলে সেই সময় ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, বিহারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি। হাজারীবাগ জেলে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেন যে ঐ সময় সতীনাথ অবসর সময়ে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। 'দরজার পর্দা একটু ফাঁক, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় সতীনাথ তুলসীদাস রামায়ণ পড়তেন, অজস্র নোট নিতেন এবং উর্দু, ফরাসী ভাষার চর্চা করতেন।'[৬০]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তখন শেষলগ্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। স্বভাবতই তখন দেশের জনসাধারণ খুব উত্তেজিত, বিশেষ করে রাজনীতিবিদ্‌দের উদগ্রীব, উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকারই কথা।

হাজারীবাগ সেণ্ট্রালজেলের প্রতিটি কক্ষ কংগ্রেস কর্মীতে ভর্তি হয়ে গেছে। এই কোলাহলের মধ্যে নীলকণ্ঠের মত ধ্যানমগ্ন জ্ঞান-তাপস সতীনাথ ভাদুড়ী তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠে নিমগ্ন ছিলেন।

এই সাধনার অবকাশটুকু সৃষ্টি করে নেবার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় 'সেলে'র জীবন বেছে নিয়েছিলেন। ফণীশ্বরনাথ রেণু, তখন তিনি এ সময় জেলে সতীনাথের সঙ্গে ছিলেন, স্মৃতিচারণ করেছেন, 'ভাদুড়ীজী একদিন জেল সুপারিটেন্‌ডেণ্ট্‌কে বললেন, সাহেব! আপনাদের টি-সেলের 'ডিগ্রি' গুলো তো খালি আছে, ওখানে আমাদের রাখা যায় না? ইংরেজ জেল সুপার অবাক হয়ে একবার ভাদুড়ীজীর দিকে তাকালেন, নিজের ইচ্ছায় সেলে থাকতে চায়? এ কেমন 'প্রিজ্‌নার'রে বাবা! বললেন 'আমরা জোর করে কাউকে ওখানে পাঠাতে পারি না। তবে স্বেচ্ছায় যারা ওখানে যেতে চায়, তাদের ওখানে ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।

"কিন্তু নিজেকে নিজেই এই দণ্ড কেন দিতে চাইছেন বুঝতে পারলাম না। টি সেলে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে ভাদুড়ীজী কেন এই সেলের জন্য জেল সুপারিটেন্‌ডেণ্টের কাছে 'ওজুর' করেছিলেন। লেখাপড়ার জন্য এমন চমৎকার জায়গা এই জেলে আছে আমরা জানতাম না।"[৬১]

তিনি নিজেই শুধু বিদ্যাচর্চা করতেন না, যে বৈদ্যনাথ চৌধুরী সতীনাথকে কংগ্রেসে টেনে এনেছিলেন, ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে সতীনাথ তাঁকে ইংরাজী পড়াতেন। গান্ধীবাদী বৈদ্যনাথ চৌধুরী এক হাতে চরখা কাটতেন আর একই সঙ্গে ভাদুড়ীমশায়ের কাছে ইংরাজী পড়তেন। ভাদুড়ী-মশায়ের শিক্ষকতায় মাত্র পনেরো দিনে চৌধুরীজী ইণ্ডিয়ান নেশনের সম্পাদকীয় অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। জেলে সতীনাথের জীবনচর্যা ফণীশ্বরনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, "জেলে আসবার আগেই শুনেছিলাম—মানুষের আসল চেহারা জেলের ভিতরে গেলে দেখতে পাওয়া যায়। মুখোস খোলা আসল মানুষ। বাইরে থাকতে গলা ফাটিয়ে যাদের 'জয়জয়কার' করতাম তাঁদের সঙ্গে জেলে মাত্র কয়দিন থেকেই মনের আসনে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের প্রতিমাগুলো নিজেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। অনেক শ্রদ্ধেয় 'মূর্তি'কে নিজের হাতে ভাঙ্গতেও হয়েছিল। ভাদুড়ীজীর সঙ্গে ওই তিন বছর থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল বলে জীবন সংগ্রামের আঘাতে আমি কোনদিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাইনি।"[৬২]

এই নিবিষ্ট সাধকের একটি বিশাল কর্মজগতও ছিল। পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের তিনি কর্ণধার ছিলেন। তখন তাঁর বাড়ীতে অতিথি হিসাবে দেখা যেত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য কৃপালনী প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতাদের। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যসভা সদস্য ভোলাশাস্ত্রী, ভূতপূর্ব বিধানসভা স্পীকার লক্ষ্মীনারায়ণ সিন্‌হা, লোকসভা সদস্য গঙ্গাচরণ সিং, প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধানসভা সদস্য কমলদেও নারায়ণ সিন্‌হা প্রভৃতি ছিলেন সতীনাথের অনুগত শিষ্য। দেশের কাজে সতীনাথের কাছেই এঁদের হাতেখড়ি।

এইসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বাদ দিলে আর যাঁরা সতীনাথের রাজনৈতিক জীবনকে ভরিয়ে তুলেছিল তাঁরা ছিলেন নিতান্ত সাধারণ মানুষ।

রাজনীতির সক্রিয় জীবনে প্রবেশ করার পর সতীনাথের জীবনের পরিধি আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গীর লোকদের সংস্পর্শে তিনি আসেন, এই সকল বিচিত্র চরিত্রের মিছিল তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্যে স্থান পায়।

কংগ্রেসের সাধারণ কর্মী ও নেতাদের মধ্যে তিনি সম্মানীয় ও জনপ্রিয়

ছিলেন। বস্তুতঃ গ্রামের সর্বত্রই সতীনাথ ভক্তি এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বিভিন্ন ঘটনায় জানা যায়, আপামর জনসাধারণ তাঁর মতামতকে কতখানি গুরুত্ব দিতেন। একবার তাঁরই মধ্যস্থতায় একজন কুখ্যাত ডাকাতের হাত থেকে জনৈক ছোট চোরের প্রাণরক্ষা হয়েছিল। ডাকাত সর্দার নির্বিচারে সতীনাথের বিচার মাথা পেতে নিয়েছিল।

এই সময় পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্য সতীনাথ রাত্রিবেলার ট্রেনে ভ্রমণ করতেন। কখনও কখনও গভীর রাতে জল-কাদা ভেঙ্গে বিনা টর্চের আলোয় ১৫/২০ মাইল হেঁটে গিয়ে সভা সমিতি করতেন। শুধু শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনই যথেষ্ট ছিলনা, তিনি আহারাদিও নিতান্ত সাধারণভাবে সমাধা করতেন। জনৈক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ী অতিথি হয়ে একবার তিনি তাঁর জন্য প্রস্তুত কোন উত্তম আহারই গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছিলেন, দেশের লোক যখন এই রকম উপাদেয় খাবার খেতে পারবে, তখনই আমি এই সকল খাদ্য গ্রহণ করতে পারবো।

একবার কাটিহার জুট মিলে ধর্মঘট হয়। সেখানেও সতীনাথ ধর্মঘটকারী মজুরদের একজন হয়ে তাদের সঙ্গে একত্র আহার, মাথায় ইটের বালিশ নিয়ে রাত্রিযাপন প্রভৃতি সর্ববিধ বিষয়ে তাদের সামিল হন। সেই সময় বিহারের শ্রম কমিশনার ব্যক্তিগত জীবনে সতীনাথের বন্ধু স্থানীয় ছিলেন। বন্ধুর এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন ও একাগ্রতা দেখে তিনি সবিশেষ বিস্মিত হন। তারই হস্তক্ষেপে এবং সতীনাথের একান্ত প্রচেষ্টায় ধর্মঘটীদের সকল প্রকার সুযোগ দেওয়া হয় এবং স্ট্রাইক প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে কিষাণগঞ্জে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন হয়। সতীনাথ তখন জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী। তাঁরই উদ্যোগে এই সম্মেলন অসামান্য সাফল্য লাভ করে। এই সম্মেলনে ট্যাব্‌লোর মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়েছিল। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ ব্যক্তিরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

দেশ স্বাধীনতার পরও সতীনাথ জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের ভিতরে স্বার্থের সংঘাত তীব্ররূপ ধারণ করল। সতীনাথের আদর্শবাদী মন এই দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

তাই যখন ১৯৪৮ সালে পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের বিশাল ভবন তৈরী হচ্ছিল, সেই সময়েই সতীনাথ পদত্যাগ করেন।

লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে সংশয় ছিল, সতীনাথের মত বিদগ্ধজনের পক্ষে রাজনীতি মহলের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাজ করা সম্ভব নয়, তা পরবর্তীকালে সত্যে পরিণত হয়েছিল। গান্ধীজির ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তিনি যে রাজনৈতিক দলে যোগদান করেছিলেন, পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তিনি উপলব্ধি করেন যে অধিকাংশ দেশনেতাই দেশ অপেক্ষা নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রতিই অধিক মনোযোগী।

এ অবস্থার সঙ্গে সতীনাথ আপোষ করতে পারেননি। এই আশ্চর্য মনোবল, দৃঢ়তা এবং সঙ্কল্প তাঁর ছিল। জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি কংগ্রেস অফিসের পথে আর পা বাড়াননি। বিহারের সম্মানিত নেতারা সতীনাথকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সতীনাথ নিজে সে বিষয়ে কোনো উৎসাহ প্রদর্শন করেননি।

জনৈক সমাজকর্মীকে তাঁর আচরণের সমর্থনে বলেছিলেন "কংগ্রেসের কাজ স্বাধীনতা লাভ করা ছিল, সে কাজ ত হাসিল হয়ে গিয়েছে। এখন রাজকাজ ছাড়া কোন কাজ নেই আর।"[৭৩]

গান্ধীজির নাম নিয়ে সুযোগ সন্ধানী মানুষের নগ্ন লোভ দেখে সতীনাথ রাজনীতিতে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর গল্পের 'হিসাবী নায়কের' মধ্যে সতীনাথ স্বাধীনতা উত্তর রাজনীতির চিত্র তুলে ধরেছিলেন।

'একটি খদ্দরের টুপি আগেই কিনে রাখলে বোধহয় আরেকটু সুবিধে হতো—হয়তো হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে।' (গণনায়ক ছোটগল্প)[৭৪]

কংগ্রেস ত্যাগের কিছুকাল পর মাস তিনেক বাদে তিনি স্বেচ্ছায় কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির পদগ্রহণ করলেন। ফণীশ্বরনাথ রেণু ছিলেন তাঁর সদস্যপদ গ্রহণের প্রস্তাবক। কিন্তু রেণু নিজেই উপলব্ধি করেছেন 'তাতে কংগ্রেসের যত গুণ দুগুণ ছিল সব আমাদের পার্টিতেও এসেছিল। জেলার সেরা জমিদারের ছেলেরা পার্টিতে ঢুকেছিল, ওরা চাইত না যে পার্টিতে কোনো এই রকম ব্যক্তি আসুক যে সাধারণ কিষাণ মজদুরের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত করে।'[৭৫]

ফলে এ'পার্টিতেও সতীনাথ বেশীদিন থাকতে পারলেন না। এতে জমিদার নন্দনেরা খুশীই হয়েছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ অবশ্য বলেছেন, সতীনাথের

রাজনীতি ত্যাগের কারণ তাঁর চরিত্রগত বিশিষ্টতা। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্যই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার মানসিকতা সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। তিনি জাত সাহিত্যিক, তাই সাহিত্যই তার একমাত্র আশ্রয়।' 'সংকট' উপন্যাসে 'বিশ্বাসজী' তাঁর সেক্রেটারীকে বলেছেন,—

"যতকাল চল্‌ল চালালাম, আর চল্‌ল না। এতে প্রত্যেক মুহূর্তটা এমন কাজের ঠাসবুনুনি ভরা যে শেষ পর্যন্ত এ সবের মানেটা পর্যন্ত হারিয়ে যায়। একাজ থেকে পরের কাজ, তারপরের কাজ সব মুহূর্তগুলো এক রকম। সবগুলো সমান কাজের হলে কোনটা ছোট, কোনটা বড় মুহূর্ত বুঝাবে কি করে? নমস্কার করছ, হেসে কথা বলছ, ভয় দেখাচ্ছ, আশ্বাস দিচ্ছ, সবগুলো একরকম। তোমার টাইপ রাইটারটার-এ যেমন ঠক্ ঠক্ একটা অক্ষরের পর একটা অক্ষরের ছাপ পড়ে সেইরকম। কাজের চিঠিতে যেমন অকাজের চিঠিতেও তেমন। এ সব সময় একরকম। আর চল্‌ল না।"[৩৬]

এই হল সতীনাথের একান্ত নিজস্ব উপলব্ধি। এর বেশী তিনি নিজেকে আর উন্মুক্ত করেননি।

রাজনৈতিক আবর্ত থেকে সরে এসে সতীনাথ তাঁর সেই অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ দিতে ব্রতী হয়েছেন। রাজনীতির জগতে সেই মানব-সঙ্গমে জীবনসত্য ও মানব সত্যের নিগূঢ় রহস্যকে সতীনাথ আপন অন্তরে একাত্ম করে নিতে পেরেছিলেন। সেই উপলব্ধির মুকুরে মানুষের প্রকৃত রূপ উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিল। এই চেনার কষ্টিপাথরে যাচাই হল প্রকৃত মানবচেতনা। সতীনাথ তাই তাঁর সাহিত্যকর্মে এতখানি আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন। ফলে বাংলা সাহিত্য ও তার পাঠকেরা যথার্থ লাভবান হয়েছেন।

বিশিষ্ট সমালোচকের সশ্রদ্ধ বিশ্লেষণে সেই কথাই প্রকাশ পেয়েছে যে, "স্থির নির্মল বুদ্ধি ও আন্তরিক সততার বলেই সতীনাথ সেই মন্থন শেষ বাসুকি বিষ থেকে আপনাকে রক্ষা করলেন; সেই জীবনের ও মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের অমৃত আস্বাদন হৃদয়ে নিয়ে সতীনাথ আপন সাধনার দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করলেন; আত্মপরিচয়ের পর্ব থেকে প্রবেশ করলেন প্রকাশের পর্বে।"[৩৭]

সতীনাথ ভাদুড়ীর মৃত্যু হয় উনষাট বছর বয়সে। জীবন সুদীর্ঘ না হলেও অল্পও বলা চলে না। প্রসঙ্গক্রমে মনে করতে পারি বিভূতিভূষণের

মৃত্যু ঘটেছিল সাতান্ন বছর বয়সে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচেছিলেন আটচল্লিশ বছর। শরৎচন্দ্র বাষট্টি বছর এবং বঙ্কিম চন্দ্র ছাপ্পান্ন বছর। এতো গেল সাধারণ জীবনের কথা, সতীনাথের সাহিত্যিক জীবনও বেশীদিনের নয়। 'জাগরী' প্রচারিত হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ। এর আগে কয়েকটি Satire ছাড়া আর বিশেষ কিছু লেখেননি। উপন্যাস তো নয়ই। সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলেও আমরা বুঝতে পারি তিনি উপন্যাসের সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদ অনুভব করেননি। পাঠকের মন ভরিয়ে দেবার কোন উদ্যোগ তার মধ্যে সক্রিয় ছিল না।

তিনি মূলতঃ মননশীল লেখক। তাঁর চিন্তার জগতে অহরহ যে আলোড়ন হত, তারই প্রকাশ ঘটতো এক একটি উপন্যাসে। এইজন্য তাঁর রচনার স্রোত প্রবাহিত হয়ে ক্রমশ ক্ষীয়মান হয়ে যায়নি। এক একটি গ্রন্থ নতুন নতুন চিন্তার ফসল স্বরূপ রচিত হয়েছে।

এই কারণে সতীনাথের মৃত্যুকে অকাল মৃত্যুই বলা চলে, কারণ, তখনও তাঁর সৃষ্টিতে চিন্তায় দৈন্য দেখা দেয়নি, রচনায় পুনরাবৃত্তির কোন চিহ্ন নেই। অনেক সফল সাহিত্যিকের মত তিনি জীবন সায়াহ্নে নবীনদের অভিনন্দন জানিয়ে সৃষ্টিতে ক্লান্তি প্রকাশ করেন নি। জীবনের শেষেও তিনি সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের উপন্যাসের প্লট নিয়ে ভাবিত ছিলেন। 'জারজ' উপন্যাসেও, যা তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি, তাঁর ভাবনারও এক নতুন দিগন্তের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

পাদটীকা

১। সতীনাথ ভাদুড়ী, গ্রন্থাবলী ৪, শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত, পৃ. ৫৪৫

২। পূর্ণিয়া জেলা স্কুল শতবার্ষিকী ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। ১৯৫৩

৩। বিমল কর, 'সতীনাথ ভাদুড়ী—যেমন ভেবেছি', সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সতীনাথ স্মরণে', (১৯৭২), পৃ. ৮২

৪। প্রাগুক্ত, ৮৬

৫। গ্রন্থাবলী ৪, ২২৭

৬। বাণী রায়, 'উনিশ শ' বাটে সতীনাথ', সতীনাথ স্মরণে, (স-স্ম) প্রাগুক্ত, ৫৩

৭। নারায়ণ প্রসাদ বর্মা, স-স্ম, ৭৬

৮। সতীনাথ ভাদুড়ীর নোট বই থেকে

৯। বনফুল, 'শ্রদ্ধাস্পদ সতীনাথ ভাদুড়ী', স-স্ম, ১৮

১০। ফণীশ্বর নাথ রেণু, 'ভাদুড়ীজি', স-স্ম ৩৫

১১। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, 'শ্বেত-তরুলতা', স-স্ম ৪৩

১২। গোপাল হালদার, 'স্মৃতির পটে', স-স্ম ৫৯

১৩। ঐ সতীনাথ ভাদুড়ী, সাহিত্য ও সাধনা, ৩৩

১৪। বাণী রায়, প্রাগুক্ত, ৪৪

১৫। গ্রন্থাবলী-৪, ধ—র

১৬। ঐ ৩৮৮

১৭। ঐ ৫৫২

১৮। গ্রন্থাবলী-১, ৪২৪ ১৯। গ্রন্থাবলী ৪২৫

২০। ঐ ৪২৯

২১। ফণীশ্বর নাথ রেণু, প্রাগুক্ত ২৮

২২। বীরেন ভট্টাচার্য, সকল কাজের-সেরা, স-স্ম ৬৩

২৩। গ্রন্থাবলী-১, ৯০-৯১ ২৪। বীরেন ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত

২৫। গ্রন্থাবলী-১, ৬৩ ২৬। গ্রন্থাবলী, ৪, ২২৭

২৭। গ্রন্থাবলী, ৪. ৩১৮-৩১৯

২৮। গোপাল হালদার, সতীনাথ ভাদুড়ী, সাহিত্য ও সাধনা ১২৪

২৯। বন্ধু বিভু বিলাস ভৌমিককে লেখা সতীনাথের চিঠি।

৩০। ফণীশ্বর নাথ রেণু, প্রাগুক্ত ২২ ; ৩১। ফণীশ্বর নাথ রেণু, প্রাগুক্ত ২৪

৩২। সতীনাথকে লেখা সাগরময় ঘোষের চিঠি, ৩০শে মার্চ ১৯৪৯

৩৩। সতীনাথকে লেখা বাণী রায়ের চিঠি। ১৯৫২, ৬ সেপ্টেম্বর

৩৪। পাটনা সায়েন্স কলেজের বাংলা সাহিত্য সমিতির আহ্বান প্রসঙ্গে শ্রীবিবেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি, ৯ই আগষ্ট ১৯৫২

৩৫। বনফুল, প্রাগুক্ত, ১৭

৩৬। সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদকের কথা, স-স্ম, (vii)

৩৭। সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবনপঞ্জীর পাণ্ডুলিপি ১৯৫২

৩৮। গ্রন্থাবলী ৪, ২২৪ ; ৩৯। গ্রন্থাবলী ৪, ৩২৮

৪০। ঐ ২৫৪-৫৫ ; ৪১। ঐ ২৩২

৪২। সুধাংশুকুমার চক্রবর্তী, সতীনাথের সাহিত্যে পূর্ণিয়া, স-স্ম ৩৩
৪৩। ১৯৫৪ সালের লেখা ডায়েরী—সতীনাথ ভাদুড়ী
৪৪। ফণীশ্বর নাথ রেণু, প্রাগুক্ত, ৩১
৪৫। শ্রীমতী ইলা সেনগুপ্তার অপ্রকাশিত রচনা, গ্রন্থাবলী-৪ পৃ, ট
৪৬। গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত ১১৪
৪৭। ফণীশ্বর নাথ্ রেণু, প্রাগুক্ত, ১০
৪৮। গ্রন্থাবলী ৪, ৩৪৯
৪৯। ১৯৫৩ সালে পূর্ণিয়া জেলা স্কুল শতবার্ষিকী ম্যাগাজিনে প্রকাশিত রচনা।
৫০। গ্রন্থাবলী ৪, ৮৮
৫১। ঐ ১, ২৬৯-২৭০, ৫২। ঐ ৫৯
৫৩। ফণীশ্বর নাথ রেণু, প্রাগুক্ত, ২২
৫৪। গ্রন্থাবলী-১, ৪০১
৫৫। গ্রন্থাবলী-৪, পৃ. ট ; ৫৬। গ্রন্থাবলী-১, ৩৯৭
৫৭। সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৭
৫৮। ঐ ৮ ; ৫৯। সুবল গঙ্গোপাধ্যায় প্রাগুক্ত, ৮
৬০। ঐ ৯
৬১। ফণীশ্বর নাথ রেণু, প্রাগুক্ত ৩০
৬২। ঐ ২৮ ; ৬৩। ফণীশ্বর নাথ রেণু প্রাগুক্ত ৩৬
৬৪। গ্রন্থাবলী-১, ২৫৪ ; ৬৫। গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত ২৫৪
৬৬। গ্রন্থাবলী-১, ১৪৯ ; ৬৭। গোপাল হালদার প্রাগুক্ত, ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপন্যাসের বিভাগ

কোন লেখককে সমগ্রভাবে বিচার করতে হলে তাঁর রচনাবলীর শ্রেণী বিন্যাস করার প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ কোন লেখকই বাহ্য প্রকৃতির একই উপাদান নিয়ে বার বার উপন্যাস রচনা করেন না। উপন্যাস যেখানে মানুষের জীবনের প্রতিবিম্ব সেখানে উপাদান যাই থাক না কেন মুখ্যতঃ পরিপূর্ণ জীবনই সেখানে আভাসিত হয়। কিন্তু জীবন পারিপার্শ্বিকতার উর্ধ্বে নয়; এই কারণে জীবন সত্যে উপনীত হতে গেলে চারপাশের দৃশ্যমান অবস্থাকে অস্বীকার করা যায় না। শৈল্পিক বিচারে 'আলালের ঘরের দুলাল'কে যথার্থ উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত না করা গেলেও অর্থাৎ জীবনের পরিপূর্ণতা সে উপন্যাসে না পাওয়া গেলেও লেখক তৎকালীন নগর সভ্যতার নানাপ্রকার কদাচার এবং ব্যক্তি জীবনে তার বিষময় প্রতিক্রিয়ার কথাই তুলে ধরেছেন। বঙ্কিম অধিকাংশ উপন্যাসের উপাদান ইতিহাস থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন, বঙ্কিমের কাল থেকে আরম্ভ করে সতীনাথের কালের মধ্যে দীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসরের ব্যবধান। এই দীর্ঘসময়ে বাংলা উপন্যাসে একদিকে যেমন নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, তেমনই সমাজ জীবনেও নানা পরিবর্তন ঘটেছে। চলমান জীবনের পরিবর্তনের বাঁকে বাঁকে উপন্যাসেরও পথ পরিবর্তিত হয়েছে। কোন বিশেষ ধারাই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' তাঁরই সময়ে যেমন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল তেমনি পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাপুষ্ট কল্লোলগোষ্ঠীর উত্তাল কল্লোলও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ব্যতিক্রম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখীন কবিপ্রতিভা তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যেও সমানভাবে সক্রিয় ছিল। এই কারণে তিনি বঙ্কিম অনুসৃত উপন্যাস রচনার পথ প্রথমে অনুসরণ করলেও তার মধ্যে মানসিক মুক্তি খুঁজে পান নি। অচিরেই তিনি চিরন্তন জীবন সত্যের দ্বারেই উপনীত হয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রে বাইরের পোষাকের কোন পরিচিতি থাকলেও অন্তরে তারা বিশ্বজনীন। কাহিনীর বিচারে তাঁর রচনার শ্রেণী বিভাগ করা গেলেও আন্তর ধর্মে তারা অভিন্ন।

সতীনাথের প্রকৃত সাহিত্য জীবন শুরু হয় রাজনৈতিক জীবন অধ্যায়

শেষ হওয়ার প্রাক-লগ্নে। স্বাধীতালাভের অব্যবহিত পরেই তিনি অনেকটা আকস্মিকভাবেই কংগ্রেসী রাজনীতি সক্রিয়ভাবে পরিত্যাগ করেন। এরপর দীর্ঘকাল তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য সাধনা করেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য বাসরে আবির্ভাব অনেক পরিণত বয়সে। তিনি নিজেকে লেখক অপেক্ষা পাঠকই মনে করতেন বেশী।

তাঁর সাহিত্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব হল তিনি কদাচিৎ ফরমাসী সাহিত্য রচনা করেছেন। চলতি জনরুচির মুখাপেক্ষী হয়ে তিনি কোন সাহিত্যই সৃষ্টি করেন নি। এই কারণেই সাধারণ পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সামান্যই তাঁর, তীক্ষ্ণ মননশীলতা, ভাষা এবং শব্দ চয়নের নিপুণতা এবং সূক্ষ্মানুকৃতি (detail) এর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি প্রত্যেকটি গ্রন্থ রচনার জন্য কতদূর পরিশ্রম করতেন। এই কারণে তাঁর এক একটি গ্রন্থ স্বতন্ত্র ভাবনাপুষ্ট, একটি আর একটির পরিপূরক নয়। যদিও তিনি রাজনৈতিক কর্মকালের সমগ্রকার জনজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে 'জাগরী' 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'(দু পর্ব) এবং কিছুটা 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' এ উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তবুও এই তিনটি গ্রন্থকে একই পর্বভুক্ত করা চলে না। 'জাগরী' উপন্যাস মধ্যবিত্ত মানুষের রাজনৈতিক সত্যের অনুসন্ধান, অপরপক্ষে 'ঢোড়াইচরিত মানস' অন্ত্যজ এবং অস্পৃশ্য ভারতের চিত্ত জাগরণের ইতিবৃত্ত। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' শ্রমিক সংগঠনী রাজনীতির কাহিনী। তিনটি উপন্যাসের মধ্যে রাজনৈতিক উপাদান থাকলেও তাদের গঠন কৌশল এবং বক্তব্যের এত পার্থক্য তিনটি উপন্যাসকে একই শ্রেণীভুক্ত করা চলে না।

সতীনাথ ভাদুড়ীর অপর চারটি উপন্যাস যথা 'সংকট, 'অচিন রাগিণী' 'দিগ্‌ভ্রান্ত' এবং 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' এগুলির কাহিনীর অবয়বে রাজনীতির কোন স্পর্শই পাওয়া যায় না। 'অচিন রাগিণী'কে তিনি 'টান ভালবাসার গল্প' বলেছেন। 'অচিন রাগিণী' মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক গল্প হলেও তার মধ্যে সম্পূর্ণ একটি কাহিনী বা প্লট পাওয়া যায়, কিন্তু 'সংকট' উপন্যাসে কোন রকম দৃঢ় পিনদ্ধ কাহিনী পাওয়া যায় না। তাতে মানুষের জীবনের কয়েকটি চরম মুহূর্তের অনুপম বিশ্লেষণ করে কাহিনীর আকার দিতে চেয়েছেন। বহু মুহূর্তের যোগ-ফলই মানুষের জীবন এবং এই জীবনের পরিপূর্ণ রূপদান করাই উপন্যাসের একটি প্রধান ধর্ম; কিন্তু 'সংকট' উপন্যাসটিতে কয়েকটি মানুষের জীবনের বিচ্ছিন্ন সংকট মুহূর্তেরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একদিক থেকে

বিচার করলে 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসটি আধুনিক উপন্যাসের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বর্তমান। এতে একদিকে যেমন পূর্ণাঙ্গ কাহিনী আছে তেমনি আধুনিক মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যক্তিসত্তার চরমতম বিকাশ সাধিত হয়েছে। 'সত্যিভ্রমণ কাহিনী'র সঙ্গে লেখকের অন্যান্য রচনার সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক। এটিকে অনেকাংশে বিশেষ আস্বাদের ভ্রমণ কাহিনী বলা চলতে পারে; কিন্তু এখানেও লেখকের বহির্লোকের পরিচয় অপেক্ষা অন্তর্লোকের পরিচয়ই বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে তিনি কোন বিশেষ ধারার লেখক ছিলেন না। তাঁর চিন্তা এতই সুনিয়ন্ত্রিত ছিল যে, এক একটি গ্রন্থ বিচ্ছিন্ন ভাবেই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, কোন বিশেষ প্রবণতার অনুবর্তী হয়নি। সতীনাথ ভাদুড়ী গ্রন্থকীট ছিলেন, একথা তিনি নিজেই বিভিন্নবার স্বীকার করেছেন। স্বভাবতই বাংলা সাহিত্যের তাঁর সামান্য পূর্বস্বরীদের প্রকাশিত গ্রন্থ যে তিনি পাঠ করেছেন, এ ধারণা আমরা সহজেই করে নিতে পারি; কিন্তু আশ্চর্য রকম ভাবে তাঁর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পূর্বস্বরীদের কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না, যেটুকু সাদৃশ্য আছে, তা রচনার বহিরঙ্গে, আন্তর ধর্মে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি চলিত বাংলা উপন্যাসের ধারা থেকে স্বতন্ত্র। এই সূত্রে সতী-নাথের পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসের ধারা সম্পর্কে একটি ধারণা করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

বস্তুতঃ আত্মমুখী জ্ঞানতাপস মানুষটির সাহিত্য সাধনায় মনন ও হৃদয়ের যে সাযুজ্য, লোকায়ত জীবন ও অভিজাত বৈদগ্ধের যে অকৃত্রিম সঙ্গম তাঁর পূর্বস্বরী বাংলাসাহিত্যে যে আর বিশেষ কেউ ছিলেন না, সচেতন পাঠক মাত্রেই সেটা লক্ষ্য করতে পারেন।

সতীনাথের মানসগঠনে ফরাসী সাহিত্য অধ্যয়নের সুস্পষ্ট ছাপ আছে। অক্লান্ত পাঠক সতীনাথ ইংরাজী, ফরাসী, জার্মানী এবং রুশ সাহিত্য সাগ্রহে পাঠ করেছিলেন। হিন্দী, ফার্সী প্রভৃতি ভাষা অধিগত থাকায় বাংলা ছাড়া অন্যান্য দেশীয় সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর সমধিক পরিচয় ছিল। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে রচনার বহিরঙ্গে কিছু কিছু নিদর্শন থাকলেও আন্তরধর্মে তিনি দেশীয় উত্তরাধিকার কিংবা বিদেশী স্বকীয়করণের কোন পন্থাই সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করেন নি।

'সতীনাথের জীবনচর্চার সর্বাধিক প্রিয় বিষয় ছিল মনের আনন্দে

'ফুল ফোটানোর খেলা' করা কিন্তু তাঁর সেই বাগানে এক খেয়ালী শিল্পীর আলিম্পন দেখা যায়,তা কোনমতেই প্রচলিত রীতিতে সুসজ্জিত বলা যায় না।

দিনের পর দিন আত্মমগ্ন সতীনাথ এই বাগানকে দেশী বিদেশী ফুলে লতায় নিজের খেয়ালে সাজিয়েছেন। কালিদাসের প্রথায় বিবাহ দিয়েছেন দেশী ফুলের সঙ্গে বিদেশী লতার।

বহিরাগত দর্শকের চোখে এই বাগানটির প্রথাগত সংজ্ঞাহীনতা বিস্ময় উদ্রেক করলেও সতীনাথের মনঃপ্রকৃতির স্বরূপ অনুধ্যানে এর ভূমিকা অপরিসীম।

ব্যক্তিগত জীবনের গোলাপপ্রেমিক প্রসাধনহীন বাগানিয়া মানুষটি যখন সাহিত্যের অঙ্গনে মনের বাগানে ফুল ফোটাতে এলেন তখন সেখানেও সেই অন্ধরীতির আনুগত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা সক্রিয় ছিল। সর্বপ্রকার আতিশয্য মেকি প্রসাধন এবং উন্মাদনাকে বর্জন করে স্থিতধী নিস্কম্প সাধনায় বাংলা সাহিত্যের দরবারকে অজস্র ফুল লতায় সমৃদ্ধ করে তুললেন, সেখানে বুনো ফুল, কাঁটাঝোপের পাশেই পাওয়া যাবে বিরল অভিজাত কোন অর্কিডকে। যে খেয়ালের বশে তিনি আজীবন ক্রমাগতই তাঁর বাগানে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন অদম্য উৎসাহে, সেই প্রবল মানসিক সক্রিয়তায় তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি রচনাকে নব নব ভাবনায় তিলে তিলে নতুন করে তুলে ধরেছেন।

তাঁর বাগানটি যেমন ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব সম্পদ তেমনি তাঁর সাহিত্য সাধনাও ছিল একান্ত স্বতন্ত্রতায় চিহ্নিত, একক।

বাংলাসাহিত্যে সতীনাথের সমসাময়িক এবং অগ্রজ সাহিত্যিকদের মধ্যে আছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্রণী লেখকেরা। এঁদের একটি বড় অংশই ছিলেন কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের চিন্তাভাবনার যে বিশেষ নিরিখটি 'কল্লোলযুগ' হিসাবে বাংলাসাহিত্যে চিহ্নিত হয়ে আছে, তার স্বরূপটি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

সযত্নসাধিত আভরণটি খসে গেলে 'কল্লোলযুগ' মৌলধর্মে রোমান্টিক। রীতির কৌশল, আরোপিত বক্তব্য, তির্যক প্রকাশভঙ্গি, অনুভবের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও কল্লোলীয় বয়ঃসন্ধির সাহিত্য যে কোন যুগসন্ধির

সাহিত্যের মতই, এতে নৈরাশ্যের একটি বড় ভূমিকা থাকলেও একটা আশার দিকও ছিল। তাই কল্লোল যুগের নবীন সাহিত্যিকদের শুধু নেতিবাচক নয় 'ইতিবাচক'ও কিছু দেবার ছিল।

তাই 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' ও 'বেআব্রুতা' কে তিরস্কার করেও নবীন সাহিত্যিকদের রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন জানাতে ভোলেননি।

এই সময়কার লেখকদের মানসিকতার চমৎকার বিশ্লেষণ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রেমেন্দ্র মিত্রের লিখিত একটি পত্রাংশে বিষয়টিকে সুচারু রূপে বিধৃত দেখা যায়।

"দুঃখ দেখেছি বটে, দেখেছি কদর্যতা। মার চোখের জল দেখেছি, গলিত কুষ্ঠ দেখেছি, দেখেছি লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের হিংসা, কদাকার অহঙ্কার, উন্মাদ বিকলাঙ্গ, রুগ্ন গলিত শব।" তবু—

'এ দেখেও আবার যখন শান্ত সন্ধ্যায় ঝাপসা নদীর ওপর দিয়ে মন্থর নাও খানি যেতে দেখি স্বপ্নের মতো পাল তুলে, যখন দেখি পথের কোন পর্যন্ত তরুণ নির্ভয় ঘাসের মঞ্জি এগিয়ে এসেছে, দুপুরের অলস প্রহরে সামনের মাঠটুকুতে শালিখের চলাফেরা দেখি, তখন বিশ্বাস হয় না আমার মত না নিয়ে আমায় এই দুঃখভরা জগতে আনা তার নিষ্ঠুরতা হয়েছে।'[১]

কল্লোলের লেখকেরা একদিকে যেমন বৃহত্তর মানব সমাজকে সাহিত্যের উপজীব্য করে জীবনের প্রতি তাদের ভালোবাসার দিগন্তকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন, তেমনি আবার বিদেশী নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারার অনুসরণে আতিশয্যময় অমিতাচারেরও অজস্র নিদর্শন রেখে গেছেন। এঁদের অনেকখানিই যে শৌখিন মজদুরি ছিল এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

মনে রাখতে হবে কল্লোলের কাল ছিল যুগসন্ধির কাল। এর একটা নিজস্ব চরিত্র আছে। "যে কোন যুগসন্ধির যন্ত্রণাই এক, তার তিক্ততার রূপ প্রায় অভিন্ন তার মুক্তির অভীপ্সা সমান উদগ্র, তার দূরাভিসারে অনুরূপ কল্পনা-শাবাল্য। আর এই যুগসন্ধি যেমন ভিত্তিনির্ভর উপন্যাসের দুর্দিন, তেমনি কবিতা এবং ছোটগল্পের মহোৎসব।"[২]

এই কারণে উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প এবং কবিতা রচিত হলেও সদর্থে উপন্যাস এ যুগে সৃষ্টি হয়নি বললেই চলে।

সতীনাথের শিল্পস্বভাব যে কোনো রকম আতিশয্যের বিরোধী ছিল।

ফলে কল্লোলের লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে চিত্তের একাত্মতা সতীনাথ কখনও অনুভব করেননি। কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি বাদ দিলে আর একটি পত্রিকাকে ঘিরে বাংলা সাহিত্যের চর্চা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সেই পত্রিকার নাম 'সবুজপত্র'। সবুজপত্র মূলতঃ মননশীল পত্রিকা রূপেই সমধিক পরিচিত। এর অবদান বুদ্ধিবাদের ক্ষেত্রেই ছিল। এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী মূলতঃ সৃষ্টিশীলতা অপেক্ষা মননশীলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

সতীনাথ ভাদুড়ী বিদগ্ধ মননশীল লেখক ছিলেন সন্দেহ নেই ; কিন্তু তাঁর বৈদগ্ধ্য কখনই শিল্পচেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সতীনাথের অব্যবহিত পূর্বের অগ্রণী সাহিত্যিক ছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে সতীনাথের মতই এঁদের প্রবেশ অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে। কিন্তু সময়ের সেই ফাঁকটুকু তাঁরা একনিষ্ঠ সাধনায় পরিপূর্ণ করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিষয়ের বিচারে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ উভয়েই গ্রামকেন্দ্রিক লেখক। একজন রুক্ষ ধূসর লাল মাটির দেশ বীরভূম অপরজন চব্বিশ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর গ্রামকে তাঁদের রচনায় চিত্রিত করেছেন। কিন্তু উভয়ের মানসিকতার প্রভেদ এতবেশী যে প্রকৃতি দৃষ্টিতেও সেই ভিন্নতা স্পষ্ট।

তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাসে প্রকৃতি প্রেক্ষাপট মাত্র, মূল লক্ষ্য সেই প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষ। অপর পক্ষে বিভূতিভূষণ প্রকৃতি চিন্তায় আচ্ছন্ন বললেই চলে।

এঁরা উভয়েই স্বভাব-শিল্পী ছিলেন। কোনো কষ্টার্জিত রীতিসিদ্ধ প্রয়াস বা আরোপিত কোন চিন্তা এদের রচনায় দেখা যায় না। তবু তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ অপেক্ষা অনেক বেশী সমাজ সচেতন লেখক ছিলেন।

মানব প্রেমের ক্ষেত্রেও উভয়ের সাধর্ম লক্ষণীয়। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম প্রগাঢ় দরদ দুজনেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে প্রকাশ করেছেন। বিভূতিভূষণের মানবপ্রেম সহজ অনাড়ম্বর প্রকৃতিধর্মী।

তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে এই ভালবাসা ব্যাপকতর পরিধিতে ব্যক্ত। তারাশঙ্করের সাহিত্যে যে জনগণের সন্ধান মেলে তারা এই দেশেরই বৃহত্তর জনসমাজ। মানুষের যে আদিম জৈব রূপটি তারাশঙ্কর তাঁর অধিকাংশ গল্প কাহিনীতে ফুটিয়েতুলেছেন তার সঙ্গে কল্লোলগোষ্ঠীর বহিরঙ্গ সাদৃশ্যথাকলেও

মূলতঃ নাগরিক শিক্ষিত বুদ্ধিবাদী কল্লোলীয় চিন্তার সঙ্গে মৃত্তিকা প্রেমিক-গান্ধীবাদী তারাশঙ্করের অন্তরের যোগসূত্র কখনই রচিত হয়নি।

গান্ধীবাদ, আঞ্চলিকতা, মাটির কাছাকাছি মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ প্রভৃতি কতকগুলি মৌল বিষয়ে তারাশঙ্করের সঙ্গে সতীনাথের মিল আছে মনে হলেও তারাশঙ্কর যেমন কোনদিনই সতীনাথের মত মার্জিত বৈদগ্ধ্যের অধিকারী ছিলেন না, ঠিক তেমনই সতীনাথ তাঁর নাতিদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তারাশঙ্করের বিশাল ব্যাপক জীবনবোধকে অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেননি। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি ও মানুষকে কেন্দ্র করে সহজ উষ্ণ হৃদয়বাদের জগতও সতীনাথের অনেক দূরবর্তী ছিল।

প্রখর যুক্তিবাদী মন, তীব্র গাণিতিক বুদ্ধি, বস্তুনিষ্ঠ এবং অগাধ অভিজ্ঞতার সম্পদ নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সিক্ত পরিবেশকে অগ্নিস্নাত করতে এসেছিলেন। সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব আকস্মিক এবং মূলতঃ তিনি বৈজ্ঞানিক হলেও সৃষ্টির সম্ভাবনা বীজ আকারে অনেক পূর্বেই তাঁর চিত্তে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাই সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করার আগেও তিনি বাংলা সাহিত্য নিয়ে রীতিমত ভাবিত ছিলেন। এবং সাহিত্যে যে অভাব, যে অসম্পূর্ণতা তাঁকে তীব্রভাবে পীড়ন করছে তার পূরণ হচ্ছে না এই আক্ষেপ এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ নিয়তির মতই ধ্রুব ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক নির্মোহ আতিশয্য মুক্ত স্থির নিরাসক্ত মনন সর্বোপরি বাস্তব বুদ্ধির সততা, প্রভৃতি সতীনাথের বিচরণক্ষেত্রের পরিধিগত হলেও যে বিশেষ সাম্যবাদী চিন্তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তীকালের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দেখা দিয়েছিল, সতীনাথ সেই বিশ্বাসে প্রত্যয়িত ছিলেন কিনা তা তাঁর রচনার মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি। যদিও সাম্যবাদী ধ্যান ধারণায় তাঁর আগ্রহ ছিল, এ কথা তাঁর জীবন থেকে জানতে পারা যায়, ইউরোপে যাওয়ার নেপথ্যে রুশদেশ ভ্রমণের বাসনা তাঁর মনে ছিল; যদিও সেই বাসনা তাঁর অপূর্ণই থেকে গেছে। 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে' সতীনাথ যে বস্তুনিষ্ঠার সততা প্রদর্শন করেছেন, অবলীলাক্রমে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির সহায়তায় একটি গোষ্ঠীজীবনকে তাদের প্রবাদ-প্রবচন, ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা, নীতিবোধ, সংস্কার প্রথা সব কিছুর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র সঙ্গে বহিরঙ্গে সাযুজ্যযুক্ত এ কথা স্বীকার করা চলে।

প্রকৃতির দিক থেকে পদ্মানদীর তীরবর্তী বাংলাদেশ এবং বিহার প্রদেশের জিরানিয়া অঞ্চল একটি স্পষ্ট ব্যবধান রচনা করেছে। কিন্তু উভয়-ক্ষেত্রেই তথ্যভিত্তিক অভিজ্ঞতাই বাস্তবতার ভিত্তি রচনা করেছিল, তাই 'পদ্মানদীর মাঝি'র কুবের আর জিরানিয়ার ঢোঁড়াই উভয়ই তাদের লৌকিক জীবনচর্যায় বিশ্বস্ত; কিন্তু মার্কসীয় বিজ্ঞানের বহির্মুখী সমষ্টি চেতনায় 'কুবের একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতীক, সে এক শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে জিরানিয়া অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণীর এক বিশেষ মানুষ ঢোঁড়াই গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অধিকার রক্ষার নতুন নতুন আন্দোলনের চিন্তা করে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে লৌকিক আচার প্রবাদ, প্রবচন এবং সঙ্গীতের যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে সতীনাথ ভাতুড়ী এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তাই ঢোঁড়াইর বিয়ের 'পানকাট্টি' 'গোঁসাই জাগানো' প্রভৃতি স্ত্রী আচার, যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়িত, তেমনই হোসেন মিঞাও উদাসমুহূর্তে লোকসঙ্গীতে মনের কথা জানায়। এ ছাড়া বাক্ ভঙ্গিমাতেও তাঁরা স্ব স্ব অঞ্চলের সুচারু, প্রতিনিধিত্ব করেছে সতীনাথের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যা কিছু সাধর্ম তা এই বাস্তব চেতনাতেই নিহিত, অন্তরঙ্গ পরিচয়ে জাতীয়তাবাদী সতীনাথ এবং মার্কসবাদী মানিকের মানসিকতার প্রভেদ সহজেই অনুমেয়।

সতীনাথ ভাতুড়ী বিদেশী সাহিত্য নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর রচনার মূল উদ্দীপনা বিদেশী দুনিয়া থেকে আসেনি। স্বদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গেই বরং তাঁর কিছুটা হৃদয়গত যোগসূত্র ছিল। বাংলাদেশের বাইরে বসবাস করার দরুন তাঁর পরিবেশগত চেতনা বাংলাদেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু তিনি এই দেশেরই লেখক। স্বদেশীয় উত্তরাধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত নন।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে শরৎচন্দ্রের রোমান্টিকতা, বিভূতিভূষণের প্রকৃতিমুগ্ধ সরল সততা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্মোহ বৈজ্ঞানিক মনন, তারাশঙ্করের সুগভীর ঐতিহ্যবাদী অধ্যাত্মবিশ্বাসী জীবনবোধ অথবা কল্লোলীয় বোহেমিয়ান আতিশয্য এর কোনটাই সতীনাথের মনের শরিক হতে পারেনি; বরং মননশীলতার দিক থেকে তিনি অনেক বেশী রবীন্দ্র প্রভাবিত।

তবে সতীনাথের রচনায় চরিত্রের স্বগতোক্তি, চেতনা প্রবাহের রীতি,

আত্মজিজ্ঞাসা, যুগযন্ত্রণা প্রভৃতি স্বীকৃত অনেক রীতি গৃহীত হয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এবং গোপাল হালদারের কয়েকটি উপন্যাসের নাম স্মরণ করা যেতে পারে। চিন্তার দিক দিয়ে তিনি উল্লিখিত লেখকদের অনেক বেশী কাছাকাছি ছিলেন। সতীনাথের শিল্প প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে তিনি দেশীয় উত্তরাধিকার এবং বিদেশী প্রেরণা সব কিছুকে নিজের নিরাসক্ত শিল্পসৃষ্টিতে সাঙ্গীকৃত করে নিয়েছিলেন। তাই রীতির দিক দিয়ে, অনেক সময় চিন্তা ও ভাবের দিক দিয়েও তিনি দেশী বিদেশী অনেকের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত হলেও সামগ্রিক পরিচয়ে সতীনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন কোটীব লেখক ছিলেন। অবশ্য লেখক মাত্রেই স্বকীয়তায় চিহ্নিত হন। কিন্তু সতীনাথ বাংলা সাহিত্যে এতাবৎ বাহিত কোন নির্দিষ্ট ঐতিহ্যের ধারক কিংবা বিশিষ্ট চিন্তার বাহক ছিলেন না। নিয়ত চিন্তাশীল মনন এবং সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি প্রতিটি রচনায় নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই কারণেই স্বীকৃত কোন বাধা-ধরা পথে তিনি বিচরণ করেননি। নিজেকেই নিজে অতিক্রম করে গেছেন বারবার। এই বিশেষ মানস গঠনের জন্যই বাংলা সাহিত্যে তাঁর পূর্বসূরী কিংবা উত্তর সাধক কেউ নেই। "সাহিত্য ও উপন্যাসের এই পটভূমিতে উপন্যাস ক্ষেত্রে সতীনাথ স্বয়ং সম্পূর্ণ"।[৩] বিবর্তন ধর্মী মানসিকতার জন্যই সতীনাথের রচনার সরাসরি শ্রেণীবিভাগ করা দুরূহ।

এই দুরূহ কাজটি আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সতীনাথ ভাদুড়ীর মোট সাতটি উপন্যাসকে স্থূলভাবে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করবো। এ কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে এই শ্রেণী বিভাগ উপন্যাসগুলির বাইরের ধর্ম লক্ষ্য করে, আন্তর ধর্ম লক্ষ্য করে নয়। মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক এবং ভ্রমণ কাহিনী এই তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হলেও মূলতঃ তাঁর সবকটি রচনাই মনস্তত্ত্বমূলক। এই কারণেই তিনি কাহিনী রচনার কোন ক্ষেত্রেই প্রচলিত রীতিটি গ্রহণ করেন নি। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস সার্থক শিল্প সম্মত হলেও জনপ্রিয় হতে পারে নি। তারও অন্যতম কারণ এটি। তিনি কোন ক্ষেত্রে একটি নিটোল গল্প সাজান নি। চিন্তার সূক্ষ্ম সূত্রে ধরে চরিত্রগুলি বিকশিত হয়েছে, এর ফলে কাহিনী বৃত্ত সংহত রূপ নিতে পারে নি। প্রসঙ্গক্রমে সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'জাগরী' উপন্যাসের বাইরের পরিচয় এটি একটি সার্থক

রাজনৈতিক-উপন্যাস ; কিন্তু সমকালীন রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারার সঙ্গে এই উপন্যাসটির সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক। সে সময়কার লেখকদের সম্পর্কে সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন।

"ব্যক্তির স্তরে স্বাধীনতার জন্য অতিরিক্ত উদ্বেগ এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য তদানুপাতিক অনুদ্বেগ তাঁদের মানসিক গঠনে স্বদেশ প্রেমের আপেক্ষিক দৈন্যকেই সূচিত করে মাত্র।" [৪] সতীনাথ ভাদুড়ীর বৈশিষ্ট্য এখানেই। বাংলা সাহিত্যে তাঁর ব্যতিক্রম চোখে পড়ার মত। তিনি ব্যক্তির স্তরে স্বাধীনতার উদ্বেগ অপেক্ষা দেশের স্বাধীনতার জন্য বেশী উৎকণ্ঠিত ছিলেন। 'জাগরী' উপন্যাসে তিনজন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী মানুষের রাজনৈতিক 'মতাদর্শের' সংঘর্ষ দেখা যায়। তাঁরা প্রত্যেকেই দেশের স্বাধীনতার জন্য স্ব স্ব ধারণা নিষ্ঠার সঙ্গে পোষণ করে এসেছে, কিন্তু কোন পথে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হলে দেশে সার্বিক কল্যাণ হতে পারে এ পথ সুনিশ্চিত করে লেখক দেখিয়ে দেন নি। লেখক অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সঙ্গে নিজস্ব মতবাদটি বিশ্লেষণ করেছেন। রাজনৈতিক উপন্যাসে এই নৈর্ব্যক্তিকতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। এর কারণ লেখক রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টিতে মানবজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যেরই উদ্‌ঘাটন করেছেন।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (দু খণ্ড) সতীনাথ ভাদুড়ীর সর্ববৃহৎ উপন্যাস। বাংলা ভাষায় এই উপন্যাসটির সমগোত্রীয় রচনা দেখা যায় না। এই উপন্যাসটির কোন পাত্র-পাত্রীই বাঙ্গালী বা বাংলাদেশের নয়। বিহার প্রদেশের জিরানিয়া গ্রামের অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরাই এর প্রধান পাত্র-পাত্রী। যদিও উপন্যাসটির প্রধান বিশেষত্ব এর আঞ্চলিকতা, কিন্তু এর গঠনে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের ভিত্তি প্রস্তর রয়েছে।

'জাগরী' যে অর্থে রাজনৈতিক উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সে অর্থে একেবারেই নয়। সতীনাথ ভাদুড়ী এ দুটি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

'জাগরী' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মানুষের রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। সেই কারণে রাজনৈতিক মতবাদের সংঘর্ষ সেখানে পাওয়া যায়। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের ঢোঁড়াই দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের গ্রামীণ অনুন্নত মানুষের উন্নতির কথা ভেবেছিল। পঞ্চায়েতের সঙ্গে বিরোধিতা করে ঢোঁড়াই সংগ্রামী জীবনে এসেছিল ;

তার বয়স বাড়ার সঙ্গে মনোজগতের পরিবর্তন হয় এবং রাজনীতির জগতে প্রবেশ করে। রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা সে ক্রমশই উপলব্ধি করতে পারে। ঢোঁড়াই আগষ্ট আন্দোলনে যোগ দেয়, কিন্তু সেখানে সর্বত্রই মিথ্যাচার, ভণ্ডামি, মুখের কথা এবং কাজের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ তাকে হতাশ করে। 'জাগরী' উপন্যাস কেবল একটি রাত্রিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিলু। বিলু ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার হয় ফাঁসীর আসামী রূপে, ফাঁসীর পূর্ববর্তী রাত্রে সারা জীবনের কাজের হিসাব নিকাশ করে। বিলুর বাবা এবং মা একই জেলে অন্য 'সেলে' উদ্বেগের সঙ্গে প্রহর যাপন করেন ছেলের ভবিষ্যৎ আশঙ্কায়। বিলুর ভাই নীলু ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং তারই সাক্ষ্যে বিলু ফাঁসীর আসামী হয়। নীলু জেলের চার দেওয়ালের বাইরে দাদার মৃতদেহ সৎকারের জন্য অপেক্ষমান থাকে। একই পরিবারের সকল সদস্যই রাজনীতির সম্পর্কে এসে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজ নিজ ভূমিকার গুরুত্বের পর্যালোচনা করে। অবশ্য নীলু, বিলুর মার স্বতন্ত্র কোন মতবাদ নেই, তিনি স্বামীর পথই অনুগমন করেন ; কিন্তু ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী ছেলেদেরও অস্বীকার করতে পারেন না। 'জাগরী' উপন্যাসের এই অভিনব পরিকল্পনা করে সতীনাথ ভাদুড়ী একটি পরিবারের মধ্যে প্রাক্ স্বাধীনতা আমলের সমগ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। 'ফাঁসি সেল্' 'আপার ডিভিসন ওয়ার্ড', 'আওরৎ কিতা' ; 'জেল গেট' এই চারটি অধ্যায়ে চারজন মানুষের আত্মকথনে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এই রীতিটি বাংলা সাহিত্যে একেবারে নতুন না হলেও প্রয়োগ রীতিটি সম্পূর্ণ নতুন। বঙ্কিমচন্দ্র চারটি পৃথক্ চরিত্রের আত্মকথনের সাহায্যে 'রজনী' উপন্যাসটি রচনা করেছেন, কিংবা রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশ, বিমলা এবং সন্দীপের আত্মকথনের সাহায্যে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছেন ; কিন্তু এ দুটি উপন্যাসের সঙ্গে 'জাগরী' উপন্যাসের প্রধান পার্থক্য হল 'জাগরী' উপন্যাসে বিলু এবং অপর তিনজনের চিন্তা বিলুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে, কাহিনীর অগ্রগতিতে সাহায্য করেনি, অপর পক্ষে 'রজনী' এবং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে অনেকটা একই রীতি কাহিনীর অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে।

এ ছাড়া 'জাগরী' উপন্যাস স্মৃতিচারণের ইতিবৃত্ত, অপর দুটি উপন্যাস তা নয়। সতীনাথ ভাদুড়ী 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে সম্পূর্ণ অন্য রীতি

গ্রহণ করেন। ঢোঁড়াই আত্মকথনের ভঙ্গিতে রচিত নয়, চেতনা প্রবাহ রীতিও এখানে অনুসৃত হয়নি। তুলসীদাসের 'রামরচিত মানসে'র আদলে তিনি 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি সাজিয়েছেন, নামকরণ অথবা গল্প বলার ভঙ্গিটি লক্ষ্য করলেই এ কথা বোঝা যায়। তিনি 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটিতে তুলসীদাসের প্রায় সবকটি সূক্তিই উদ্ধৃত করেছেন। ভারতবর্ষের গ্রামীণ মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য রাজনৈতিক জাগৃতির উন্মেষ দেখাতে গিয়ে তিনি তুলসীদাসের রামায়ণের কথা ভেবেছেন এবং ঢোঁড়াইকে এ যুগের শ্রীরামচন্দ্র করবার কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। "এ যুগে শ্রীরামচন্দ্র নিজেয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। এখানেই হল ঢোঁড়াই রামের আবির্ভাব আমার মনে।"[৫]

'জাগরী' উপন্যাসে যেখানে তিনি ভারতবর্ষের কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট পথের সংঘাতকে উপজীব্য করে কাহিনী বয়ন করেছেন, 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে সেখানে তিনি তুলসীদাসের রামায়ণের কথা চিন্তা করে গ্রন্থের নায়ককে এযুগের রামচন্দ্র করবার পরিকল্পনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থদুটির রচনায় তিনি কেবল ভিন্ন রীতিই গ্রহণ করেছেন তাই নয়; রাজনৈতিক ভাবনার মধ্যে মৌল পরিবর্তন এনেছেন।

'চিত্রগুপ্তের ফাইল' সতীনাথ ভাদুড়ীর আর একটি রাজনৈতিক উপন্যাস; কিন্তু এই উপন্যাসে আগষ্ট আন্দোলন বা গান্ধীবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন চিত্রিত হয়নি। প্রকাশের দিক থেকে 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' 'জাগরী, উপন্যাসের পরবর্তী অর্থাৎ 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' সতীনাথ ভাদুড়ীর দ্বিতীয় উপন্যাস এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র পূর্বেই প্রকাশিত; কিন্তু 'জাগরী'র সঙ্গে 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র সম্পর্ক সামান্য,নিকটে হলেও'চিত্রগুপ্তের ফাইলে'র সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই নেই। এই কারণে 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটির আলোচনা এ'দুটি উপন্যাসের পরে আসে। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটিও জনজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত, কিন্তু 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে যেখানে কৃষক সম্প্রদায় প্রধান পাত্র-পাত্রী এই উপন্যাসে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষেরাই কুশীলব।

'জাগরী' 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এবং 'চিত্র গুপ্তের ফাইল' এই তিনটি উপন্যাস রচনায় তিনি তিনটি ভিন্নরীতি গ্রহণ করেছেন।

'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি তিনি কাহিনীর প্রধান পাত্রী মিনাকুমারীর আত্মহত্যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ উপন্যাসটি শেষ থেকে শুরু হয়েছে।

বিষয়ের দিক থেকেই যে কেবল এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে মৌল পার্থক্য আছে তাই নয়, রচনার রীতি বিন্যাসেও উপন্যাস তিনটির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বেকার কাহিনী ; কিন্তু 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তী কালের। এই উপন্যাসে গান্ধীবাদী আন্দোলনের কোন বিবরণ নেই ; কিংবা স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য অকারণ আনন্দোচ্ছ্বাসও নেই।

সতীনাথ ভাদুড়ী দেশের স্বাধীনতার জন্য রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই দেশ স্বাধীন হলেও তিনি কোন উপন্যাসেই সদ্য প্রাপ্ত স্বাধীনতার আনন্দঘন বিবরণ দেন নি। তিনি যখন 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি রচনা করেছেন তখন তিনি উপলব্ধি করেছেন শ্রমিক কর্মীরা কত জটিল চক্রান্তের বলি হতে চলেছে। "সামাজিক রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যেই টানা পোড়েনে জড়িয়ে উঠেছে মিল মালিক ও সরকারী কর্তৃপক্ষের শ্রেণী বন্ধুত্ব অর্থ খানাপিনা ও প্রমোদ বিলাসের নানা সুবিদিত বন্ধনে গড়ে উঠেছে জোতদার ও পুলিশের যোগাযোগ"।[৬] 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' স্বাধীনতা প্রাপ্তির রাজনীতি নয়, উত্তর স্বাধীনতার জনজীবনের রাজনীতির উপন্যাস। মধ্যবিত্ত, কৃষক এবং শ্রমিক এই তিন শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই তিনি তিনটি উপন্যাস রচনা করেছেন। 'জাগরী', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এবং 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' এই তিনটি শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করছে। সতীনাথ ভাদুড়ী আশ্চর্য রকমভাবে এই তিনটি উপন্যাস রচনা কালে কাহিনীর বিষয়ানুসারে তিনটি ভিন্নরীতি গ্রহণ করেছেন। কেবল কাহিনীর উপাদানেই নয়,প্রকাশ রীতিতেও এই তিনটি উপন্যাসের কোন মৌল সাদৃশ্য নেই। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাবনা গুলির সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের সাযুজ্যকরণ করেছেন। এই উপন্যাস গুলিকে বাহ্যত রাজনৈতিক এই একটি মাত্র সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও অন্তরঙ্গ পরিচয়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির।

সতীনাথ ভাদুড়ীর শেষ পর্যায়ের তিনটি উপন্যাস ('অচিন রাগিণী' অগ্রহায়ণ ১৩৬১, 'সংকট', আষাঢ় ১৩৬৪, 'দিগ্‌ভ্রান্ত', জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩) যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। অবশ্য আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এই সকল উপন্যাসে বাহ্য ঘটনা অপেক্ষা মনোজগতের উথাল-পাতালই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাহ্য ঘটনাই মনোজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতো, এই

রীতি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে এসে এক বিশেষ দিকে বাঁক নিল, রবীন্দ্রনাথ যে দিন তাঁর উপন্যাসে অাঁতের কথা বলতে চাইলেন, সেদিনই উপন্যাসে ঘটনা অপেক্ষা মনস্তত্ত্বই অধিক প্রাধান্য লাভ করলো। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপনাসটিতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা আছে। কোন কোন সমালোচকের মতে 'রজনী' বাংলা ভাষার প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের দাবীদার হলেও 'রজনী' যথার্থ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস নয়, এই উপন্যাসেও বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের মত ঘটনার আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার বিশেষ প্রবণতা আমাদের দেশে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রবেশ করে। বিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ফ্রয়েডের ভাবনাপুষ্ট হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে অনেক আধুনিক সাহিত্যিক মনোবিশ্লেষণের পরিবর্তে মনোবিকারের ইতিহাস রূপে গ্রহণ করেন। মনোবিজ্ঞান যে কেবল জৈব বাসনার অকপট আলোচনা নয় এ ধারণা অনেক আধুনিক সাহিত্যিকই ভেবে দেখেননি। অর্থাৎ ত্রিশের দশকের সময় আধুনিকতা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নামে যা চালানো হয়েছিল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্বমূলক গল্প উপন্যাসের অন্ধ অনুকরণ মাত্র, জাতীয় জীবন ধারার সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত ছিল না। সতীনাথ ভাদুড়ীর এই উপন্যাসগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এই উপন্যাসগুলিতে ফ্রয়েডীয় ধারণায় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের বাহ্য রীতিটি গৃহীত হয়। সতীনাথ ভাদুড়ী এই তিনটি উপন্যাসে আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের বাহ্যিক রীতিটি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে বাহ্যিক ঘটনা বিন্যাসের তাগিদ বিশেষ অনুভূত হয় নি, পরিবর্তে অন্তর্মুখী চরিত্রায়ণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা এতটাই অনায়াস ছিল যে কাহিনী বর্ণনার সময় তা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর লেখনীর উৎস খুলে দিয়েছে, কোথাও আরোপিত অথবা কষ্টসাধ্য বলে মনে হয়নি। এই ধরণের অন্তর্মুখী বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস রচনার প্রধান অসুবিধা এই যে, এখানে ঘটনা পরম্পরা বলে কিছু থাকে না। কোন বিশেষ মুহূর্তে একজন ব্যক্তির অথবা একাধিক ব্যক্তির মনে যে ভাবের উদয় হয় তাই বিবৃত করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভাব আবার পূর্ব সূত্র ছিন্ন হওয়ার জন্য সবটাই নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই অনেক সময় এই জাতীয় আধুনিক উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর বিকৃত চিন্তা এবং অসুস্থ মনের প্রতিফলন

ঘটে থাকে। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী এই জাতীয় উপন্যাসের কেবল চেতনা প্রবাহের ও মুক্তানুসঙ্গের বাহ্য রীতিটিই গ্রহণ করেছেন, আন্তর ধর্মে তাঁর উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবনাচরণের মধ্যে যে পরিশীলিত এবং মার্জিত মননের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর সাহিত্য রচনাতেও অনুরূপ পরিশীলিত এবং মার্জিত মননের পরিচয় পাওয়া যায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসে একটি অপূর্ণতা থেকে গেছে। তিনি তাঁর কোন কাহিনীতে যুবক-যুবতীর প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করেন নি। প্রণয়কে কেন্দ্র করে কোন সংঘাত কিংবা দ্বন্দ্ব বা আধুনিক তরুণ, তরুণীর দাম্পত্যজীবনের সংকট তাঁর উপন্যাসে একেবারেই অনুপস্থিত। প্রচলিত উপন্যাসের যা যা উপাদান থাকে সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসে তার কোনটির সন্ধান পাওয়া যায় না। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সচেতন ভাবে প্রেমের প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলেছেন, বরং বলা যেতে পারে তিনি অতি আনায়াস ভাবেই মনের গভীর জটিল অবস্থার সহজ উন্মোচন করতে পারতেন। 'অচিন রাগিণী' সতীনাথ ভাদুড়ীর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসগুলির মধ্যে জটিলতম উপন্যাস। লেখক এই উপন্যাসটিকে 'টান ভালবাসা'র গল্প বলেছেন। তা আমাদের অপরিমিত রহস্যলোকে নিয়ে যায়।

'সংকট' এবং 'দিগ্‌ভ্রান্ত' এ দুটি উপন্যাসও মনস্তত্ত্বমূলক হলেও 'অচিন রাগিণী'র সঙ্গে এ দুটি উপন্যাসের কোন সাদৃশ্যই নেই। বস্তুতঃ পক্ষে সতীনাথ ভাদুড়ী এই তিনটি উপন্যাস রচনায় প্রায় একই রীতি গ্রহণ করলেও বিষয় ভাবনায় তাদের এত পার্থক্য যে এই তিনটি উপন্যাসকে নিশ্চিত রূপে এক শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। শিল্পরীতিতে তিনি পূর্বপথটি অনুসরণ করলেও নির্বাচিত বিষয়গুলির মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই।

"বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি একত্রিত করলে 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসে একটি পারিবারিক কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু 'সংকট' উপন্যাসে 'কয়েকটি নির্বাচিত মুহূর্তের ছবি পাই।"[৭]

এক রাজনীতিবিদ্ বাইরের কোলাহলময় জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হন। নির্বাচিত মুহূর্তের মধ্য দিয়ে তিনি মনের বিভিন্ন স্তরে অন্বেষণ করেন। আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য নায়কের আত্মানুসন্ধান। 'সংকট' উপন্যাসে লেখকই এক অর্থে নায়ক। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'দিগ্‌ভ্রান্ত' একমাত্র উপন্যাস যেখানে একটি নিটোল

পারিবারিক কাহিনী পাওয়া যায়। আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা এবং বিচ্ছিন্নতা বোধ ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ প্রভৃতি মৌল জটিল উপাদানগুলি থাকলেও 'দিগ্‌ভ্রান্ত' শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রবাসী বাঙ্গালীর পারিবারিক কাহিনী। 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসটির মধ্যে একটি পরিবার থাকলেও সেখানে মনস্তাত্ত্বিক উপকরণই কাহিনীটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে; কিন্তু 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রচ্ছন্ন থাকাতে সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব, কলহ, মান, অভিমান নিয়ে একটি পরিবার আত্মপ্রকাশ করেছে।' 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসটি প্রারম্ভেই আমাদের অপরিচিত রহস্যলোকে নিয়ে যায়।

"পিলে, নতুন দিদিমা আর তুলসী,তিনজনকে নিয়ে এই টান ভালবাসার গল্প। শোনা পিলের মুখে।"[৮] লেখক এইভাবে 'অচিন রাগিণী'র কাহিনীটি শুরু করেছেন। কাহিনীর আরম্ভেই অভ্যস্ত পাঠক মনকে সচকিত করে তোলে। 'টান ভালবাসা' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য কি? এই বিষয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সব উপন্যাসের প্রেক্ষাপটই বিহারের কোন শহর কিংবা গ্রাম। 'অচিন রাগিণী'ও বিহারের মফঃস্বল শহরের পটভূমিতে রচিত। পাত্র-পাত্রীরাও বিহারের দীর্ঘকালের স্থায়ী বাঙ্গালী বাসিন্দা নতুবা বিহার প্রদেশেরই লোক। কিন্তু 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসের প্রধান পাত্রী নতুন দিদিমা বাংলা দেশের মেয়ে, বিবাহ সূত্রে বিহারে বসবাস করছেন। বাংলা দেশ এবং বাংলা ভাষার উপর প্রবাসী সতীনাথের অসীম মমতা ছিল। তিনি নতুন দিদিমার চরিত্র বিশ্লেষণের সূত্রে প্রায়ই বাংলাদেশের প্রসঙ্গ এনেছেন।

"নতুন দিদিমার কথা মিষ্টি। শুধু মিষ্টি নয় নতুন ধরণের। বাংলা দেশের লোকে হয়তো এর মাধুর্য ধরতে পারবে না। কিন্তু পিলেদের জন্ম বাংলার বাইরে। তারা অন্যরকম বাংলা কথায় অভ্যস্ত। সে ভাষা হয়তো বইয়ের সঙ্গে বেশী মেলে, কিন্তু তার সুর হিন্দির; ভঙ্গি আড়ষ্ট। তাই নতুন দিদিমার কথার সুরে তাদের চমক লাগে। কখনও বাংলাদেশ দেখেনি বলে তারা লজ্জিত। বাধ্য না হলে একথা তারা কারো কাছে স্বীকার করতে চায় না।"[৯]

পিলে আর তুলসী দুই বন্ধু। নতুন দিদিমার সঙ্গে তাদের কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। নতুন দিদিমা তাদের পাড়ার বধূ। বাংলাদেশ থেকে এক

ঠিকাদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়ে স্বামীর সংসার করতে তাদের অঞ্চলে এসেছে। নতুন দিদিমার সঙ্গে তাদের যখন পরিচয় হয়, তখন তারা বাল্য উত্তীর্ণ করে সদ্য কৈশোরে পদার্পণ করেছে। পাতানো দিদিমার সঙ্গে মাতৃহারা দুটি কিশোরের মান অভিমান ভালবাসার টানাপোড়েনের কাহিনী। নতুন দিদিমার কাছে ভালোবাসা পাবার জন্য তুলসী এবং পিলের সব সময় প্রতিযোগিতা চলে। তবে কাহিনীর কথক পিলে বিশ্বাস করে তুলসীকেই নতুন দিদিমা তার থেকে বেশী ভালোবাসে। একদিকে তুলসীর প্রতি ঈর্ষা এবং নতুন দিদিমার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ এই দুয়ের সংঘাতে তার চিত্ত অস্থির থাকে। সতীনাথ ভাদুড়ীর-প্রায় সব উপন্যাসের মতই 'অচিন রাগিণী'তেও বাইরের জগৎ অপেক্ষা অন্তর জগতের কথাই বেশী। এই দুই কিশোরের মনস্তত্ত্ব লেখক নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষ করে ত্রিশের দশকের লেখকদের মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনার যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, তার বেশীর ভাগটাই ছিল পাশ্চাত্ত্য ভারধারা পুষ্ট, নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের জৈব কামনা বাসনার অত্যাধুনিক বিশ্লেষণ, যুগসন্ধির অবক্ষয়িত স্বরূপ প্রকাশেই এক শ্রেণীর আধুনিক লেখক বেশী সজাগ ছিলেন। সতীনাথ ভাদুড়ী পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় জীবনভাবনার উপর বিদেশী কোন তত্ত্বকে আরোপ করে দেন নি। এইজন্য তাঁর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসগুলি স্বকীয় চিন্তায় পুষ্টিলাভ করেছে। তিনি আমদানীকৃত কোন দার্শনিক ভাবনার সাহায্যে 'অচিন রাগিণী' 'সংকট' এবং 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসের শ্রীবৃদ্ধি করেননি।

এই তিনটি উপন্যাস অলোচনা কালে আমরা এ সত্যই উপলব্ধি করতে পারবো। সতীনাথ ভাদুড়ী বিদেশী কোন তত্ত্বকে সরাসরি গ্রহণ করেন নি, দেশ কাল পাত্রানুযায়ী মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন।

"নিশ্চয়ই মনোবিজ্ঞানের ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সতীনাথের পঠিত ও অধিগত ছিল, সে তত্ত্বকে হয়তো একেবারে আজগুবি বলেও মনে করতেন না—অন্ততঃ নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় যতটা তা গ্রাহ্য তা মানতেন। 'অচিন রাগিণী'র পরিবেশটা অজ্ঞাত নয়, তবু তার নিগূঢ়স্থিত মর্মকোষ অচিন। আবার ইওরোপ হলে তা তত 'অচিন'ও হত না, সে মর্মকোষ উদ্‌ঘাটিত হত যথানিয়মে। কিন্তু আমাদের দেশের বিশেষ সমাজের সব রকমের বাধা

তা অগোচর থাকে না। টান ভালবাসাকে সম্মান দিয়ে মানিয়ে নিতে গেলেও তাকে সব সময় মানিয়ে রাখা যায় না। আত্মবঞ্চনায় কেউ বঞ্চিত হয় না, বিকৃত অথবা নাতি স্বাভাবিক আকারে প্রকারে তা তার স্বীকৃতি আদায় করে। 'অচিন রাগিণী' তারই চিত্র। সতীনাথের প্রকাশ পদ্ধতি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার আখ্যান সার গ্রহণ করাও কঠিন। কারণ, বিষয় ও পদ্ধতি এক হয়ে আছে শিল্পগুণে।"[১০] এই শিল্পগুলি সতীনাথ ভাদুড়ীর একেবারেই নিজস্ব। বিষয় নির্বাচনে প্রথাবিরোধ প্রবণতা সতীনাথ ভাদুড়ীকে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকের অন্দর মহলে প্রবেশ করতে দেয়নি একথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য নির্বাচিত বিষয়ের প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ, পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে সেই বিষয়ের বিশ্লেষণ, মানব মনের চেতন-অবচেতন স্তরের অপার রহস্য উদ্‌ঘাটন, তিনি এমন এক নিরাসক্ত শিল্প দৃষ্টির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন যা কি না, তাঁকে সমকালীন লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে পৃথক্ করে রেখেছে।

শিল্পরীতির দিক থেকে 'জাগরী', 'অচিন রাগিণী' এবং 'সংকট' একই শ্রেণীর বলা যেতে পারে। এই তিনটি উপন্যাসই মুখ্যত উত্তমপুরুষে কথিতএবং তাদের বহির্মুখিতা অপেক্ষা অন্তর্মুখিতাই অধিকতর প্রকট, কিন্তু বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'জাগরী' উপন্যাসে যেখানে জনজীবনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেখানে 'সংকট' এবং 'অচিন রাগিণী'তে বিশেষ ব্যক্তিজীবনকে তিনি প্রধান বিষয়বস্তু করেছেন। এই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসটি প্রথমপুরুষে লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসেও জনজীবন অপেক্ষা ব্যক্তিজীবনই গুরুত্বলাভ করেছে। ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর একটি প্রধান বিশেষত্ব হল এই যে তিনি অযথা উপন্যাসের বাইরের কাঠামো নির্মাণে আধুনিক শিল্পরীতি গ্রহণ করেননি, তাঁর আধুনিকতা কেবল অবয়বে নেই, কাহিনীর মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত। 'সংকট' এমনই একটি উপন্যাস, যাকে বাইরের ধর্মে অথবা আন্তর ধর্মের লক্ষণে উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। এই উপন্যাসে সমগ্র ভাবে কোন জীবন সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি, অথবা অখণ্ড চিন্তার স্রোতে কোন পরিপূর্ণ কাহিনীও রূপ লাভ করেনি। জীবনের কয়েকটি মুহূর্তকে নিয়ে বিস্তৃতভাবে ধরে রাখা হয়েছে।

এই কাহিনী যাকে নিয়ে, সেই বিশ্বাসজী একজন রাজনৈতিক নেতা, জনসেবা আর রাজনীতির রোমাঞ্চ উত্তেজনা সাফল্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে

রেখেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাইরের কর্মময় জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেই সবাই অবাক হলেও বিশ্বাসজী আর জনসেবার কাজে দলের কাজে ফিরে গেলেন না। রাজনীতির মধ্যে আত্মতৃপ্তি থাকলেও আত্মানুসন্ধান করার কোন পথ নেই, এই সত্য তিনি উপলব্ধি করলেন। তাঁর এই উপলব্ধিজাত সত্যই 'সংকট' উপন্যাসে বিধৃত। বিশ্বাসজীর আত্মকথনে উপন্যাসটি লিখিত নয়, তাঁর রাজনীতির জীবনের প্রিয় শিষ্য তাঁর সেক্রেটারী তিনিই কাহিনীর কথক। কাহিনী শুরুও হচ্ছে 'সেক্রেটারির কথা', এই প্রস্তাবনা দিয়ে।

"প্রত্যেকের জীবনী বোধহয় বিচিত্র এক আকাঙ্ক্ষা ও অন্বেষণের রহস্য। সে জিনিস কী, কোথা থেকে আসে, সে সব আমি জানি না। একটা ক্ষেত্রে কেমনভাবে এসেছিল, শুধু সেই কথাটা আমার কিছু কিছু জানা। বিশ্বাসজীর কথা বলছি। তাঁর খোঁজের আগ্রহটুকু মোটা লাইনে, চড়া রঙে আঁকা; সেইজন্য আমাদের নজরে পড়েছিল। সুবিধার মধ্যে তাঁর মনের রূপান্তরের ধারা খানিকটা দূর পর্যন্ত তিনি আমার কাছে বলেছিলেন নিজমুখে।"[১১]

লেখক 'সংকট' উপন্যাসের বিভিন্ন উপাখ্যানের সংকটময় মুহূর্তে বিশ্বাসজীকে উপস্থিত করে একদিকে যেমন কাহিনীর যোগসূত্র রক্ষা করেছেন তেমনি আর একদিকে "অত্যন্ত সুচতুর কৌশলে মূল লক্ষ্যকে প্রচ্ছন্ন রেখে লেখক একটির পর একটি সংকট সময়ের বিবরণ টেনে এনে বিশ্বাসজীর অন্তর্মুখী জিজ্ঞাসাকে এসব সংকটের উপলক্ষ দিয়ে সুসম্পূর্ণ করে তুলেছেন।"[১২]

সতীনাথ ভাদুড়ীর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দিগ্‌ভ্রান্ত'ই একমাত্র উপন্যাস যেখানে আদ্যন্ত একটি পারিবারিক কাহিনী পাওয়া যায়। এই উপন্যাসের শিল্পরীতিতে তিনি প্রচলিত ধারা গ্রহণ করেছেন, তাঁর এই শ্রেণীর অন্য উপন্যাসে কোন ধারাবাহিক আখ্যান পাওয়া যায় না। কিন্তু 'দিগ্‌ভ্রান্তে'র কাহিনী বিবর্তনের পদ্ধতিতে স্বাভাবিক নিয়মেই চলেছে, চেতনা প্রবাহের রীতিতে স্মৃতির আবর্তানুযায়ী এগিয়ে পিছিয়ে চলেনি। 'দিগ্‌ভ্রান্তে'র আখ্যানবস্তু জটিল নয় এবং দীর্ঘ সময় সীমার মধ্যে বিধৃত। কাহিনী ডাঃ সুবোধ মুখার্জির ও অতসীবালার মধ্য যৌবন থেকে প্রায় বার্দ্ধক্যের প্রথম পর্যন্ত বিস্তৃত। তাদের পুত্র কন্যা সুশীল এবং মণিকে নিয়ে কাহিনীর সুরু। প্রথম কৈশোর অবস্থায় দেখা যায় এবং কাহিনীর শেষে তারা মধ্য যৌবনে উপনীত। এই উপন্যাস আপাতদৃষ্টিতে লেখকের কাহিনী পরিকল্পনার মধ্যে সুসংবদ্ধ

সংহতি খুঁজে পাওয়া যায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর সব উপন্যাসের মত 'দিগ্‌ভ্রান্তে'র কাহিনীর স্থল বিহারের একটি মফঃস্বল শহর। এই শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ডঃ সুবোধ মুখার্জি একজন প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক। স্ত্রী অতসীবালা পুত্র সুশীল এবং মণিকে নিয়ে তার পরিপূর্ণ জীবন। ডঃ সুবোধ মুখার্জির নিস্তরঙ্গ পারিবারিক জীবনে অকস্মাৎ অশান্তির ঝড় উঠলো, অতসীবালার গ্রামসম্পর্কের ভাই হরিদাসের আগমনে। হরিদাসের আচার আচরণ সন্ন্যাসীর মত, সে ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের সাধক সুবোধ মুখার্জির সঙ্গে সংঘাতের সূত্রপাত এখানেই। স্ত্রী অতসীবালা, এমনকি, পুত্র কন্যারা ও হরিদাসের প্রভাবে কবলিত হল। ডঃ সুবোধ মুখার্জি আস্তে আস্তে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। বাস্তববাদী এবং ভাববাদী দর্শনের সংঘাতে পরিবারটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লো। একটি পরিবারের ভিত্তিমূলে ধর্ম এসে আঘাত করে পরিবারের ভারসাম্য বিনষ্ট করে দিল।

এই উপন্যাসে একটি পরিচ্ছন্ন আখ্যানবস্তু থাকলেও মূলতঃ পরিবারভুক্ত মানুষগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লেখক উপন্যাসটির মাধ্যমে করেছেন। আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ, বিষাদ এবং নৈরাশ্য চেতনা ইত্যাদি লেখক কাহিনীর উপজীব্য করে তুলেছেন। 'অচিন রাগিণী', 'সংকট' এদুটি উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই প্রাধান্য লাভ করেছে, 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে একটি সুখপাঠ্য কাহিনী বস্তুও বর্তমান আছে।

'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' সতীনাথ ভাদুড়ীর এমন একটি রচনা যাকে পুরোপুরি কোন উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা চলে না, আবার নিতান্ত ভ্রমণ কাহিনীও বলা চলে না। সতীনাথ ভাদুড়ী ফরাসী সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন, সেই সুবাদে ফরাসী দেশ, তার সংস্কৃতি এবং মানুষজনদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের দুর্বার কৌতূহল তাঁর থাকাই স্বাভাবিক। কেননা ফরাসী দেশই শিল্পসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এ ধারণা তাঁর ছিল। দেশের জন আন্দোলনের প্রেক্ষাপট অতিক্রম করে ইউরোপের বৃহত্তর জনমানসের পরিচয় পাওয়ার ব্যাকুলতাই তাঁকে ইউরোপ যাওয়ার জন্য প্রেরণা যুগিয়ে ছিল। অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে সতীনাথ ভাদুড়ী পূর্ণিয়ার বাইরে খুব কমই গেছেন, ভারত ভ্রমণের কোন পরিকল্পনা তাঁর ছিল কিনা তার জীবনী পাঠে একথা জানা যায় না। তিনি বাংলাসাহিত্য সাধক হওয়া সত্ত্বেও

বাংলাসাহিত্যের পীঠস্থান এই কলকাতাতেও আসতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করতেন না। নিজ পাঠমন্দিরে আত্মমগ্ন জ্ঞানতাপস সতীনাথ জীবনের প্রায় সব অংশই পুর্ণিয়াতেই অতিবাহিত করেছেন। "পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে সে প্যারিস বাছ্‌ল কেন, তা একেবারে নিশ্চিত ভাবে বলা শক্ত। নানা কারণ অকারণ মিলিয়ে তার মনে ধারণা জন্মেছিল যে ইংরাজের মনটা বেনের, আর ফরাসী মনটা কবির।"[১৩]

এই কবিমনের পরিতৃপ্তির জন্য তিনি ফরাসী দেশে গিয়েছিলেন। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'কে আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে ভ্রমণ সাহিত্য বলে মনে হতে পারে ; কিন্তু যদি এর গভীরে প্রবেশ করা যায়, তাহলে এর মধ্যে লেখকেরই অন্তর্লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ অর্থে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলতে বোঝায় লেখকেরই জীবনের ধারাবাহিক কাহিনী ; কিন্তু 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'তে লেখকের সমস্ত জীবনের ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায় না। চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেরই দুটি পরিচয় পাওয়া যায়। একটি তার বাইরের পরিচয় অপরটি তার অন্তর্লোকের পরিচয়। এই অন্তর্লোক লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব। মনোজগতে চিন্তা এবং ভাবনার বুদ্‌বুদ্‌ উঠে লেখক তাই-ই প্রকাশ করেন। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'তে সতীনাথ ভাদুড়ী তার অন্তর্জগতের নিজস্ব সত্তাটিকেও আংশিকভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। 'জাগরী' উপন্যাসে লেখক বিক্ষিপ্ত ভাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কথা বলেছেন। এটি নিছক আখ্যান নয়, ভ্রমণ কথা আবার আত্মচিত্রও। "সম্ভবতঃ এই 'লেখক'কে সতীনাথ দেহমনে সচেতন ভাবে আত্মরূপ দান করে কিছুটা আপনাকেও দেখতে চেয়েছেন।"[১৪]

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসের শ্রেণী বিভাগ প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে, সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসগুলি স্থূলভাবে মোট তিনটে শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেলেও মূলতঃ তাঁর সকল উপন্যাসই মনন-প্রধান। উপন্যাস রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই রচিত হোক অথবা পারিবারিক প্রেক্ষাপটেই রচিত হোক লেখক সতীনাথ সর্বক্ষেত্রেই হৃদয় অপেক্ষা মস্তিষ্ককেই অধিক সঞ্চালন করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতের ফলে কেবল যে বাংলাদেশেরই লেখকদের মানসিকতার পালাবদল হয়েছিল তাই নয়, বাংলার বাইরের লেখকদের মধ্যে এই পালা বদলের ধর্মগুলিও লক্ষ্য করা যায়। সতীনাথ ভাদুড়ী বাঙ্গালী

লেখক হলেও তিনি বাংলাদেশের লেখক ছিলেন না। তিনি তাঁর সাহিত্যে এই পালা বদলকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অভিজাত সম্প্রদায় কেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর পরিবর্তে দেশের নীচুতলার মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করার মাত্রাতিরিক্ত প্রবণতা নবীন লেখকদের রচনার মধ্যে প্রতিভাত হয়। অপরিচিত জনজীবনের লোকায়ত জীবন যাত্রার বিস্তৃত দলিলই কেবল চিত্রিত হল না, সেই সঙ্গে তাদের জৈব কামনাবাসনার অতি বাস্তব ছবি তুলে ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল। শ্রমিক, কৃষক, ফুটপাতের ভিখারী এদের সকলকে নিয়ে নবীন লেখকেরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন।

সতীনাথ ভাদুড়ী প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের লেখক এই সময়ের মধ্যে এই ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা খুব দৃঢ়ভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে এই লেখকদের প্রধান পার্থক্য এই যে তিনি কেবল আধুনিকতা আনার জন্যই ঐতিহ্য বিরোধী চরিত্রের আগমন ঘটাননি অথবা নীচুতলার জীবন চিত্রনেই আধুনিক হওয়া যায় এ ধারণাও তাঁর ছিল না। জীবনের অভিজ্ঞতার সূত্রে তিনি যে সব শ্রমিক কৃষক এবং নীচুতলার মানুষের কাছে এসেছিলেন অতি স্বাভাবিক ভাবেই তিনি তাঁদের চিত্রিত করেছেন।

তাঁর ছোটগল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের বর্ণনায় এ কথাই প্রমাণ হয় যে, তিনি কেবল বিষয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই নীচুতলার মানুষকে সাহিত্যে স্থান দেন নি, প্রবাস জীবন এবং জনজীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক ভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে আমাদের এই ধারণা হয় যে, তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্য ধারা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। সতীনাথ ভাদুড়ীর আধুনিকতা সাহিত্যের অবয়বে নেই, এই আধুনিকতা তাঁর মননে ছিল। ত্রিশের দশকের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত লক্ষণগুলি আধুনিক বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে, সেই লক্ষণগুলির সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর একটু সাধারণ তুলনা করলে বোঝা যাবে যে তিনি আধুনিক ধারায় কোথায় স্বতন্ত্র ছিলেন।

প্রচলিত আদর্শের প্রতি অবিশ্বাস যুদ্ধোত্তর আধুনিক লেখকদের লেখায় পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এমনকি শরৎচন্দ্রের অন্তরে

যে শুদ্ধাচারিতার পরিচয় পাওয়া যায়, যুদ্ধোত্তর লেখকদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রচলিত আদর্শ এবং সনাতন বিশ্বাসের প্রতি অনেক আধুনিক লেখকরা বীতশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের এই বীতস্পৃহা ব্যঙ্গের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলেছেন—

"বিদ্রূপ পরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি।"...[১২]

বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্করের রচনায় এই বিদ্রূপ পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"কবি যশপ্রার্থী তরুণ তরুণী, মেদবহুল ধনী, স্থূল রুচি ব্যবসায়ী আত্মতৃপ্ত সরকারী কর্মচারী, কৃত্রিম আচারে অভ্যস্ত অভিজাত সমাজ সাধারণত এঁদের ব্যঙ্গের লক্ষ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী কিংবা শ্রেণী শুধু নয়, এদের আশ্রয় স্থল সমগ্র সমাজ ও পুরাতন আদর্শ আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে পড়ে।"[১৩]

সতীনাথ ভাদুড়ী ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শবাদী ছিলেন। আদর্শবাদের তাড়নায় তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর আদর্শবাদ বা বিশ্বাসকে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার করেন নি। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসও কোন চরিত্রের উপস্থাপনায় অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করতে বসেননি। কিন্তু অনেক আধুনিক লেখক প্রাচীন ধর্ম-প্রতিষ্ঠান সহ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকেও অবিশ্বাস এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী সোচ্চার ভাবে কোন ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত করেন নি। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে তাৎমাটুলি এবং জিরানিয়ার গ্রামে নিরক্ষর সরল প্রাণ গ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা গান্ধীজীকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলে মনে করতো, কিংবা 'জাগরী' উপন্যাসে নীলু বিলুর মা গান্ধীজীর উপর শ্রদ্ধা আর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসকে একই ভাবতেন সরল প্রাণ মানুষের বিশ্বাসকে সতীনাথ ভাদুড়ী যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছেন তেমনি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভগবান বিশ্বাস যে কতখানি কৃত্রিম তাই নিয়ে চরম বিদ্রূপ করেছেন 'মুনাফা ঠাকুরুণ' ছোট গল্পটিতে। সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবনে আদর্শবাদ কোন ধর্ম প্রেরণা থেকে আসেনি, তিনি সত্য এবং ন্যায়ের পথের পথিক ছিলেন, জীবনাচরণের এই বিশেষ গুণটিই তাঁকে আদর্শবাদী করে তুলেছে।

বাস্তবতাবোধ আধুনিক সাহিত্যের আরও একটি বিশেষত্ব।

রোমান্টিকতার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত বাস্তবতাবোধ অনাধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের সুস্পষ্ট ভাবে পার্থক্য করে। এই প্রেরণা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা পুষ্ট। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর উপন্যাসগুলির কাহিনীর বিষয়বস্তু তাঁর সমকাল থেকেই কেবল গ্রহণ করেননি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রথানুযায়ী তিনি বাস্তবানুগ থাকেন নি, তাঁর তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি গভীর মনোযোগ তাকে প্রথার বাস্তববাদী করে তুলেছে। বাইরের ঘটনা, পরিবেশ এবং সচেতনতা সত্ত্বেও মননধর্মিতার উপর তাঁর অধিক মনোযোগ ছিল, এই কারণে তাঁর বাস্তবতাবোধ সাধারণ স্তরের ছিল না। -পাশ্চাত্ত্যের যে প্রভাবটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে, তা হল বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং যুক্তিবাদের আধিক্য। শরৎচন্দ্র বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়াবেগের প্রাধান্য অধিক দিয়েছেন। বিজ্ঞানের প্রভাব সর্বস্তরের মানুষেরই উপরই ক্রিয়াশীল। কথাশিল্পীরাও বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব মুক্ত থাকতে পারেন নি। বিষয়বস্তুতে বিজ্ঞানের প্রভাব সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসে পাওয়া যায় না, যেমন বনফুলের উপন্যাসের মধ্যে আমরা পাই। কিন্তু যুক্তিবাদ এবং বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতা আধুনিক লেখকদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা এর যথার্থ দৃষ্টান্ত। সতীনাথ ভাদুড়ী বনফুল বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে সমগোত্রীয় লেখক নন। তাঁর রচনায় এজাতীয় প্রভাব খুব একটি ক্রিয়াশীল নয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে নতুন শাখাটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সেই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা মনোবিজ্ঞান এটি সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনায় পাওয়া যায়। তিনি মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক লেখকই ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানের যে ধারাটি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল, সতীনাথ ভাদুড়ী তা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। একদিকে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা অপরদিকে মার্কসীয় চিন্তাধারা এই দুটি নতুন দার্শনিক চিন্তা বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের দশকে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। লরেন্স,জয়েস প্রভৃতি বিদেশী লেখকরা বাংলার আধুনিক সাহিত্যিকদের যে কেবল প্রভাবিত করেছিলেন তা নয়, তাঁরা ফ্রয়েডের কাছেও যথেষ্ট ঋণী ছিলেন। নরনারীর জৈব সম্পর্কের অকপট আলোচনায় - আধুনিক সাহিত্যিকেরা কিছুটা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সতীনাথ

ভাদুড়ী এদিকে একেবারেই যাননি। তাঁর জীবন দর্শনঅনেক ব্যাপকতর ছিল। 'জাগরী', 'ঢোঁড়াই চরিতমানস', 'সংকট' 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'দিগ্‌ভ্রান্ত', প্রভৃতি উপন্যাসগুলির বিষয় বৈচিত্র্য একথাই প্রমাণ করে যে তিনি প্রচলিত সংজ্ঞায় জীবন রসিক উপন্যাসিক ছিলেন না। তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পের মধ্যে অসাধারণ সংযম লক্ষ্য করা যায়। মার্কসের সমাজবাদদর্শন গোপাল হালদার এর 'একদা' ও অন্যান্য উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ লাভ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় মার্কস-এর সমাজবাদের সার্থক পরিণতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'জাগরী' উপন্যাসের একদিকে মার্কস-বাদ এবং অপরদিকে গান্ধীবাদ এই দুটি আধুনিক চিন্তার অবতারণা করলেও আর কোন উপন্যাসে এই বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কেবল 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' তিনি ঢোঁড়াই এর মানসিক পরিবর্তনে গান্ধী বাদের প্রসঙ্গ এনেছেন। কিন্তু এই চিন্তার নিরবিচ্ছিন্ন স্রোতোধারা সতীনাথ ভাদুড়ীর একাধিক গ্রন্থে প্রবাহিত হয়নি, এই কারণে তাঁকে কোন একটি সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা যায় না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকরা সুস্পষ্ট ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পথে পদচারণ করে এক একটি নির্দিষ্ট ছাপ রেখে গেছেন, সতীনাথ ভাদুড়ী এমন ভাবে কোন সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান দেননি।

অভিজাত শ্রেণীর মানুষের জীবন-যাত্রায় অসঙ্গতি এক শ্রেণীর আধুনিক লেখককে ব্যাঙ্গাত্মক চিত্রাঙ্কনে প্রেরণা যুগিয়েছে, আবার কোন কোন লেখক ব্যঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ না করে অন্যভাবে এই শ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। এই সময়ে দুটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, একদিকে বোহে-মিয়ান জীবনের প্রতি অনুরাগ, অপরদিকে ভিখারী মজুর ও চাষীদের জীবন নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা। যাঁরা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দীর্ঘকাল অপাংক্তেয় ছিল তাদের মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতাও সাহিত্যে দেখা গেছে।

ভিখারী সমাজের দীনতা এবং তজ্জনিত নৈতিকবোধের মৃত্যু যুবানশ্বের 'পটল ভাঙ্গার পাচালি' গল্পে পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে চাষী ও কাহারের জীবন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাষী শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক সাহিত্য একদিকে যেমন সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল, অপরদিকে তেমনি বৈচিত্র্যময়ও হয়ে উঠেছিল। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীর

প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না। কিন্তু একথাও সত্য যে সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রধান পরিচয় বুদ্ধি প্রধান লেখক হলেও সমাজের নীচু তলার মানুষ তাঁর দৃষ্টি বহির্ভূত ছিল না। কেবল 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'ই নয়, তাঁর অসংখ্য ছোটগল্প একথাই সাক্ষ্য দেয় যে তিনি কত সংবেদনশীল লেখক ছিলেন। আধুনিক উপন্যাসের একটি বড় বিশেষত্ব হল বক্তব্যের প্রাধান্য। অবশ্য উপন্যাসে বক্তব্যের স্থান বরাবরই ছিল, কিন্তু উপন্যাসের অন্যান্য উপাদান সমপরিমাণে থাকার জন্য বক্তব্যই কেবল প্রাধান্য লাভ করতো না। প্রচারধর্মী উপন্যাসে লক্ষ্য করা গেছে লেখক তাঁর বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে উপন্যাসের শিল্পধর্ম ক্ষুণ্ণ করেছেন। আধুনিক উপন্যাসও অতিরিক্ত মাত্রায় বক্তব্য সচেতন হওয়ার জন্য উপন্যাসের অন্যান্য উপাদান নিজেদের স্থান করে নিতে পারছে না। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসে আধুনিক এই বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে, এবং কাহিনীতে বক্তব্যের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করার জন্য তাঁর উপন্যাসের কাহিনী, রস-আস্বাদনের সামান্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস এবং ছোটগল্পের উপর পাশ্চাত্ত্য যে প্রভাবটি সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী হয়েছিল, তা হল রূপ বৈচিত্র্য। প্রচলিত ধারায় তিনি কাহিনী অথবা চরিত্র বর্ণনা করেন নি। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনা বিন্যাসে কালানুক্রম মেনে চলেন নি। একই সঙ্গে একাধিক পাত্রপাত্রীর মনে চিন্তার আবর্ত, কাহিনীর সময় সীমা মাত্র একদিন যেমন 'জাগরী' বুদ্ধদেব বসুর 'পরিক্রমা' এবং গোপাল হালদারের 'একদা' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বর্ণনা এবং চরিত্র সৃষ্টিতে অন্তর্মুখিনতার ঝোঁক প্রভৃতি আধুনিক রীতিটি সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের বাইরের ধর্মে সমকালীন বা তাঁর সামান্য অগ্রবর্তী আধুনিক লেখকদের ধারার সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর কিছু সাদৃশ্য থাকলেও উপন্যাসের আন্তরধর্মে তাঁর উপন্যাসগুলির বিশিষ্টতার দাবী রাখে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক গোপাল হালদারের অভিমত "একই কালে, একই দেশে জন্মালে বিষয়ে, অভিজ্ঞতায় ও সাহিত্য চেতনায় এক আধটু সহধর্মিতা থাকবার কথা, কতকটা অনুসরণীয়। কিন্তু সমসাময়িক বাঙ্গালি সাহিত্যিকদের সঙ্গে সতীনাথের জীবন ভাবনায় বা শিল্পকর্মে কিছু যোগ ছিল কি না তা সন্দেহ।"[১৭]

সতীনাথ ভাদুড়ীর এই বৈশিষ্ট্য ধরার জন্য তাঁর উপন্যাসগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি।

পাদটীকা

১ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', পৃঃ ২৬
২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বাংলা গল্পবিচিত্রা', পৃঃ ৭৩
৩। গোপাল হালদার, সতীনাথ ভাদুড়ী, 'সাহিত্য ও সাধনা', পৃঃ ৪৫
৪। নারায়ণ চৌধুরী, 'উত্তর শরৎ বাংলা উপন্যাস', পৃঃ ৯
৫। গ্রন্থাবলী—২ পৃঃ ৪৯৪
৬। গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১
৭। অরুণ মুখোপাধ্যায়, 'কালের প্রতিমা', পৃঃ ১৫২
৮। গ্রন্থাবলী—৩. পৃঃ ১
৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১
১০। গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২-৮৩
১১। গ্রন্থাবলী—৩. পৃঃ ১৪৭
১২। গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭
১৩। গ্রন্থাবলী—৪. পৃঃ ২২৮
১৪। গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯
১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের স্বরূপ', পৃঃ ২৫
১৬। রণেন্দ্রনাথ দেব, 'বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়', পৃঃ ১২
১৭। গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২-৪৩

—— ——

তৃতীয় অধ্যায়

মনস্তত্ত্ব-মূলক

রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ (১৯০৩) উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বাংলা উপন্যাসের পথ পরিবর্তন ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাহ্য ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। পরিবেশ এবং পরিস্থিতি মানব জীবন গঠনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার সঠিক পরিচয় তাঁর রচিত সাহিত্যে আমরা পাই।

‘কপালকুণ্ডলা’য় বঙ্কিমচন্দ্র নারীচরিত্রের একটি রহস্যের সন্ধান করেছেন। আশৈশব সমাজ জীবনের বহির্ভাগে প্রকৃতি লালিতা নারীর মধ্যে তিনি নারী প্রকৃতির মূল উপাদানের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। জন্মান্ধ ‘রজনী’র মধ্যেও তিনি একান্ত অন্তরাশ্রয়ী জটিল প্রেমের রহস্য বিশ্লেষণ করেছেন। কোন কোন সমালোচক ‘রজনী’কে প্রথম মনস্তত্ত্ব মূলক উপন্যাস বলেছেন। কিন্তু বিধবা যুবতী বিনোদিনীর সুগভীর জীবন-সমস্যার কথা রবীন্দ্রনাথ যে সংযম এবং সহানুভূতির সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন, তা বাংলা উপন্যাসের এক নূতন দিকের সন্ধান দিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন বা উত্তরসূরী যারা ছিলেন তাঁরাও বঙ্কিম নির্দেশিত পথের পথিক ছিলেন। পরবর্তীকালে যদিও শরৎচন্দ্র পুরোপুরি বঙ্কিম নির্দেশিত পথানুসরণ করেননি তথাপি তিনিও বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের ভালোমন্দ মেশানো হৃদয়াবেগের ঝর্ণাধারায় অবগাহন করেছেন মাত্র। শরৎচন্দ্র তাঁর ‘শুভদা’ রচনা পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ‘শুভদার’ অতিরিক্ত রোমান্সপ্রিয়তাই তা প্রমাণ করে। “শুক্লা একাদশী রজনীর প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে”,– এইরূপ বাক্যপ্রয়োগরীতিও বঙ্কিম অনুগামী শরৎচন্দ্রের। গ্রামবাংলার অন্ধসংস্কার, সামাজিক নানা কুপ্রথা, পতিতা নারীর নারীত্ব উন্মোচন ইত্যাদি পরিচিত ছবির উর্ধ্বে তিনি অবলোকন করেন নি।

‘চোখের বালি’ উপন্যাসের প্রেরণায় তিনি ‘চরিত্রহীন’ (১৯১৭) ‘গৃহদাহ’ (১৯২০) ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেছেন, কিন্তু সেখানেও নারীপুরুষের সম্পর্কের বাস্তবানুগ জটিল সম্পর্কে না গিয়ে সনাতনী মানসিকতার পরিচয়

দিয়েছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'র প্রথম-পর্বের রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তর শেষ দৃশ্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথ ও লবঙ্গলতা পরস্পরের বিদায়কালীন বর্ণনা মানসিক দিক থেকে যে অনেকখানিই অন্তরঙ্গ এ বিষয় একটু অনুধাবনেই লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং 'বিদ্রোহী' বলে বহুল প্রচারিত হলেও শরৎচন্দ্র আমাদের সমাজজীবনের মর্মমূলে কোথাও কোন গভীর আঘাত হানেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক বিশ্বাসে কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যা করেছে, রোহিণী পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধে বিনোদিনীর সমস্যা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ নয়, তিনি তাকে বাঁচবার অধিকার দিয়েছেন। তবু তিনিও সংযমের শাসন এবং সমাজের নিয়মকে লঙ্ঘন করেন নি। বিনোদিনীর অন্তর্বেদনার প্রতি সর্বপ্রকার মহানুভূতি সত্ত্বেও তাকে তিনি কাশীতে সন্ন্যাসিনীরূপেও বসবাসের নির্দেশই দিয়েছেন।

'চরিত্রহীন' (১৯১৭) 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭-১৯৩৩) 'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্র সমাজবিরোধী কতকগুলি বিষয় নিয়ে দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেছেন মাত্র, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হননি।

'দত্তা' উপন্যাসের বিজয়াও রাসবিহারীর সঙ্গে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে শুধুমাত্র নরেনের প্রতি তার অনুরাগের শক্তিতে নয় এর জন্যে তার পিতার আগ্রহ, স্বীকৃতি ও সমর্থনের প্রয়োজনও হয়েছিল।

অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালে এবং তার পরবর্তীকালে এ সমস্ত উপন্যাস রচিত হয়েছে। ভারতবর্ষ তখন যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও স্বাধীনতা আন্দোলন দ্রুতপদে এগিয়ে যাচ্ছিল। বৈচিত্র্যহীন বাঙ্গালীর জীবনে ঘটনার বড় অভাব। বঙ্কিমচন্দ্র তাই ইতিহাসে, রোমান্সে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর সময় কিছু ধর্ম আন্দোলন ছাড়া সার্বিকভাবে দেশ আন্দোলিত হওয়ার মত কোন ঘটনা ঘটেনি। আমরা অবশ্য সিপাহী বিদ্রোহকে আলোচনার মধ্যে আনছি না। সিপাহীদের আন্দোলনে সাধারণ মানুষের কোন ভূমিকা ছিল না। ১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন থেকেই গৃহপ্রেমিক বাঙালীর শীতল গৃহকোনকে উষ্ণ করে তোলে। শরৎচন্দ্র নিজেও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি রাজনীতির আঁচ থেকে সযত্নে তাঁর রচিত সাহিত্যকে রক্ষা করেছেন। পথের দাবী (১৯২৪) কে যথার্থ রাজনৈতিক উপন্যাস বলা চলে না। রাজনৈতিক কারণে

গ্রন্থটি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হলেও 'পথের দাবী'র নায়ক সব্যসাচী সর্বশক্তি-মান অলৌকিক পুরুষ। সে কোনো রাজনৈতিক চরিত্র নয়, সে শিল্পীর তুলিকায় আঁকা সাহিত্যের আদর্শ চরিত্র। সর্বোপরি যে আন্দোলনের পটভূমিতে উপন্যাসটি বিধৃত তা-ও সর্বজনগ্রাহ্য নয়। দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছেই তা প্রীতির ব্যাপার ছিল না বরং ভীতিব ব্যাপার ছিল। আসলে শরৎচন্দ্র সচেতনভাবেই রাজনীতিকে এড়িয়ে গেছেন। তিনি হৃদয়প্রধান ঔপন্যাসিক আগামীকালকে তিনি উদ্ভাসিত করেন নি, সমকালের বাহ্য উত্তাপকেও পরিহার করে অপস্রিয়মান সমাজকে সমুজ্জ্বল করেছেন মাত্র।

কিন্তু শরৎচন্দ্র যে পরিবেশে সাহিত্য রচনা করেছিলেন তা ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল। তাঁর প্রদর্শিত সামাজিক সমস্যাও তীব্রতা হারিয়ে ফেলছিল, ফলে শরৎচন্দ্র তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রায় অনাধুনিক হয়ে পড়ে-ছিলেন। তথাপি তাঁর প্রভাব পরবর্তীকালেও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। আধুনিক কথাসাহিত্যের অনেক লেখকই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে শরৎচন্দ্রের নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়েই নব নব সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করেছেন, তার সু-পরিচিতির প্রসঙ্গ না আনলেও শরৎচন্দ্র অসামান্য জনপ্রিয় কথাশিল্পী ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ বিশ্লেষণ করা আমাদের বর্তমান আলোচনার মধ্যে আসেনা। তবে এ কথা বলা চলতে পারে শরৎচন্দ্রের পর বাংলা কথাসাহিত্যে এক আধুনিকতার সূচনা ঘটে, যার ভাবধারা সম্পূর্ণ-রূপে দেশীয় নয়।

'ভারতী' এবং 'নারায়ণ' পত্রিকায় আধুনিকতার যে ক্ষীণ আলোকরশ্মি পড়েছিল তাই দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠলো 'কল্লোল' পত্রিকায়। 'ভারতী' গোষ্ঠীর মণীন্দ্রলাল বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্র মোহন মুখো-পাধ্যায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকেরা কমবেশী রবীন্দ্রানুসারী। এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করলেও সমসাময়িক য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের দ্বারা আবিষ্ট ছিলেন। রচনার শক্তি, চিন্তার সজীবতা, মানবিকতার চেতনা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত হলেও এঁদের রচনায় শিল্পদৃষ্টির ব্যাপক প্রসার লক্ষ্য করা যায় না। নাগরিক পরিবেশে লালিত এই সকল লেখকের বাস্তবজ্ঞান সীমিত ছিল। পরিচিত পরিবেশকে কখনই অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এঁরা রোমান্টিক মানসিকতার শিকার হয়েছেন। 'কল্লোল'এর লেখকগোষ্ঠী পক্ষান্তরে আঙ্গিকে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে

অনেক বেশী আধুনিক ছিলেন। রবীন্দ্র প্রভাব এঁদের ক্ষেত্রে ততটা সক্রিয় ছিল না। তুলনায় এঁরা শরৎচন্দ্রের অনেক কাছাকাছি। অন্ত্যজ জীবনের প্রতি শরৎচন্দ্রের উষ্ণ মমত্ববোধ এঁদের অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছিল। 'কল্লোল' দীর্ঘায়ু না হলেও সাহিত্যক্ষেত্রে 'কল্লোল' পত্রিকার ভূমিকা নগন্য নয়, পরন্তু তার প্রভাব এতবেশী ছিল যে পরবর্তীকালে এই পত্রিকার লেখক-গোষ্ঠী সমগ্র বাংলা সাহিত্য জগতে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং জগদীশ গুপ্ত রবীন্দ্র-শরতোত্তর যুগের আধুনিকতার পথিকৃৎ। প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে একাগ্রচিত্ত না হতে পারলেও তিনি সে-যুগে বিতর্কিত লেখক ছিলেন। আজকের দিনে তিনি প্রায় বিস্মৃতনামা। জগদীশগুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) নরেশচন্দ্রের মত খ্যাতিলাভ করেননি। কিন্তু সাহিত্য প্রতিভার বিচারে নরেশচন্দ্র অপেক্ষা জগদীশগুপ্ত অগ্রগন্য ছিলেন। এ কথা অনস্বীকার্য নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বাংলা উপন্যাসে অকস্মাৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। তাঁর বাস্তবপ্রিয়তা নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের নির্মোক রূপায়ণ এবং অপরাধ জগতের পাত্র-পাত্রীর গমনাগমনই এই চাঞ্চল্যের কারণ। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের রচনাভঙ্গী ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তিনি ঘটনাবিন্যাসের সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্রের রচনার প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতা নরেশচন্দ্রের রচনায় অনুপস্থিত, কিন্তু রচনার প্রসাদগুণই জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ হতে পারে না। নরেশ-চন্দ্র যেকালে আধুনিকতা আনয়ন করে বিতর্কিত লেখক হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র তাঁর কালে সমাজ বিগর্হিত প্রণয়ের জয়গান করে রক্ষণশীল সমাজে অপযশ অর্জন করেছিলেন। বয়সের হিসেবে শরৎচন্দ্র (১৮৭৬) নরেশচন্দ্র (১৮৮২) মাত্র ছ বছরের বড় ছিলেন, কিন্তু আধুনিকতার বিচারে শরৎচন্দ্র এবং নরেশচন্দ্র সমগোত্রীয় বলা চলে না। চিন্তাজগতের পরিবর্তনই বাহ্য জগতকে পরিবর্তিত করে। সাহিত্যিক দার্শনিকের মনোজগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যে নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। শরৎচন্দ্র সমকালেরই অনেক দূরবর্তী হয়ে পড়ে-ছিলেন। নরেশচন্দ্র এবং জগদীশ গুপ্ত সেই বিচারে আসন্ন ঋতু পরি-বর্তনের প্রথম বার্তাবহ।

ইংরেজি সভ্যতার তড়িৎস্পর্শে উনিশ শতকে বাঙ্গালীর মানসলোক আন্দোলিত হয়। পুনরায় আন্দোলিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর। কিন্তু উনিশ শতকে পাশ্চাত্য ভাব-

ধারার সংস্পর্শে আসার পর বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী সনাতন ঐতিহ্য সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে দেশীয় পাত্রে ধারণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কিন্তু এর বিপরীত ঘটে। পাশ্চাত্য ভাবধারাকে সরাসরি গ্রহণ করে জাতীয় জীবনে আরোপ করার চেষ্টা হয়, ফলে বিদেশী বহু 'বাক্' (ইজম্) ভারতীয় ঐতিহ্যে বেমানান হয়ে পড়ে। শরৎচন্দ্র ছিলেন উনিশ শতকের ভাবধারা পুষ্ট শিল্পী।নিষিদ্ধ প্রণয় কাহিনীও শুক্তির মধ্যে আবদ্ধ ছিল কিন্তু নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ লেখকেরা পরবর্তী ভাবধারা পুষ্ট লেখক। তাঁদের নতুন চিন্তা চমক সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সমাজের মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেনি।

বাংলাদেশে ত্রিশের দশককে অস্থিরতার দশক বলে চিহ্নিত করা চলতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন তখন তীব্র রূপ লাভ করেছে। একদিকে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন অপরদিকে বিপ্লববাদীদের নির্ভীক জীবনোৎসর্গ এই দুইয়ের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় জনচিত্তও স্থিতাবস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। লেখকেরা স্বভাবতই এই সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় পটপ রিবর্তনের ঝঞ্ঝাত-বাতায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। দীর্ঘদিনের স্নেহলালিত মূল্যবোধগুলি অচিরেই মূল্যহীন হয়ে পড়ছিলো। রাজনৈতিক সমস্যার প্রবল আঘাতে বহু দিনের সংস্কার ও নীতিধর্মের ধারণা দ্রুত বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল।

এই পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী ছিল। ভিকটোরীয় যুগের নীতিপ্রধান আদর্শ-বাদিতা ব্যর্থ পরিহাসের মত শোনাতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইবসেন, ভিকটর হুগো, শেক্‌ভ প্রভৃতির নাটক-উপন্যাসে সমাজ বিপ্লবের সূচনা দেখা দিল।

বিশ্বযুদ্ধের সকল অবক্ষয়ের ক্ষত আমাদের সমাজের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হল। প্রাক্‌যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তরকালীন মানসিকতার মধ্যে পার্থক্য অনেক। দু-কালের সাহিত্য তার স্বাক্ষর বহন করে।

মনন প্রধান উপন্যাসের যাত্রা শুরু ত্রিশের দশক থেকে। আধুনিক জীবন যাত্রার জটিলতা,তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসহায়তা,মানুষের ক্রমবর্ধমান সার্বিক মুক্তিপ্রচেষ্টা উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়াই স্বাভাবিক।

আধুনিক ঔপন্যাসিক মানুষকে শুধু তার ব্যক্তিগত সীমানার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবেশীর এক একটি সক্রিয় শক্তির আধার-

রূপে চিহ্নিত করে থাকেন। পরিবেশের সঙ্গে আকর্ষণ ও সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিচরিত্রের মননশীল ও ক্রিয়াশীল সত্তার বিশ্লেষণই আধুনিক উপন্যাসের লক্ষ্য। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের গল্‌সওয়ার্দি, হাক্‌সলী, জেম্‌সজয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ প্রভৃতির উপন্যাসে এই জাতীয় বিচার বিশ্লেষণ দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতির উপন্যাসও এই শ্রেণীভুক্ত।

উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যভাবে সমাজবিদ্রোহের প্রচার আধুনিক ঔপন্যাসিকের অন্যতম কর্তব্য বলে শরৎচন্দ্র মনে করেছিলেন। 'শেষ প্রশ্নে' তিনি মনন প্রধান উপন্যাসের গতিনির্ধারণের চেষ্টা শুরু করেছিলেন। ১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ শ্রী দিলীপকুমার রায়কে তিনি একটি পত্রে লেখেন "শেষপ্রশ্নে অতি আধুনিক সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। খুব করবো, গর্জন করে নোংরা কথাই লিখবো' এই মনোভাবটিই অতি আধুনিক সাহিত্যের (Central point) নয় এরই একটু নমুনা দেওয়া"।[১]

বাংলা সাহিত্যে 'শেষপ্রশ্নে'র সময়ে ও পরবর্তীকালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র,শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরেশ বসুর উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের প্রদর্শিত' পথের অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে নীচু তলার মানুষদের সাহিত্যের আঙ্গিনায় নিয়ে এসে শরৎচন্দ্র যে বাস্তব-বোধের পরিচয় দিতে চেয়েছেন তা'কল্লোলে'র লেখকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। জগদীশগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, যুবনাশ্ব প্রমুখের রচনাবলীই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এঁদের সকলের প্রতিভা সমমানের এবং সমগোত্রীয় নয়। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এঁরা যে অনেকেই নূতন দিগন্তের স্পর্শ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এর মধ্যে শৈলজানন্দের রচনায় বাস্তবতার ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়ায় এর উষ্ণ আবেদন জনমনে সাড়া জাগিয়েছিল। জগদীশ গুপ্তের ছিল বাস্তবতার সঙ্গে যৌনচেতনা। এঁদের চিন্তার তারুণ্য অগ্রজ সাহিত্যিকদেরও আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'বেদে' প্রভৃতি বিষয় বাংলা সাহিত্যের চিরাচরিত নিস্তরঙ্গ পরিবেশে এক অচেনা রহস্যের জোয়ার নিয়ে এল। 'কল্লোলের' লেখকগোষ্ঠী যেমন অন্ত্যজ জীবনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে জীবনের পরিধিকে বিস্তৃত করেছিলেন, তেমনই আবার কখনও পাশ্চাত্ত্য

আদর্শে যৌনতাকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিয়ে বিষয়বস্তুর বাস্তবতাকে অকারণে আবিল করে তুলছিলেন। কল্লোলযুগের অন্যতম শরিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন—"বস্তুত কল্লোলযুগে এ দুটোই প্রধান সুর ছিল, এক প্রবল বিরুদ্ধবাদ, দুই বিহ্বল ভাববিলাস। একদিকে সংগ্রামের মহিমা অন্য-দিকে ব্যর্থতার মাধুরী, আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রণা।"[২]

বিরুদ্ধবাদ ও ভাববিহ্বলতা এই উভয়েরই বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ নিয়ে যিনি বাংলা সাহিত্যে এসেছিলেন তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। "সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন? সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন? মানুষ হয় ভাল নয় মন্দ হয়—ভাল মন্দ মেশানো হয় না কেন?"[৩] এই তাগিদেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব। তিনি অবশ্য কল্লোলের লেখক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আবার কল্লোলের নিয়মিত লেখক হয়েও নীচুতলার জীবন নিয়ে নিমগ্ন থাকেন নি এমন লেখকের মধ্যে আছেন বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ। বুদ্ধদেব বসু মধ্যবিত্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মুক্ত জীবনের আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি নবীন চিন্তায় এ সমাজের প্রাচীন ধ্যানধারণাকে ভেঙে ফেলতে চাইলেও সামগ্রিকভাবে কোনো সমাজবিপ্লব করতে চাননি। প্রবোধকুমার সান্যাল নিমগ্নদর্শক, যাযাবর জীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর রচনার সম্পদ।

উনিশ শতকে ইংরাজি সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত বাঙ্গালী সমাজ হৃদয়াবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নতুন সৃষ্ট শহরে মানুষের জীবনযাত্রা নিস্তরঙ্গ ছিল। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার প্রচেষ্টা এবং বিধবার পুনর্বিবাহ এ দুটিই ছিল উল্লেখযোগ্য সামাজিক আন্দোলন। এই আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে এর প্রসার সীমিত ছিল; কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত কেবল চিন্তাশীল মানুষকেই ভাবিয়ে তোলেনি, সমাজের সকলস্তরের মানুষকেই বিপর্যস্ত করে ছিল। বিধ্বস্ত অর্থনীতির সুযোগে একদিকে যেমন নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণীর আবির্ভাব হল, অপরদিকে তেমনি বহুলোক শোষণের শিকার হল। বিদেশী রাজশক্তিই মূলত এর জন্য দায়ী, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্বাধীনতার স্পৃহা তীব্রতর হল। গান্ধীজীর প্রভাব তখন সারা ভারতব্যাপী। সত্যাগ্রহ আন্দোলন

প্রত্যাহৃত হয় উনিশ শ ত্রিশ সালে। এরপর সাময়িক ভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং কর্মচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশুভ আভাস ভারতের আকাশেও দেখা যায়। স্বাধীনতা লাভের পূর্ণ সুযোগ সমাগত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ভারতের তরুণ সমাজ অস্থির হয়ে উঠে। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনও সহিংস হয়ে উঠে। '৪২' এর আগষ্ট আন্দোলনই তার প্রমাণ। আগষ্ট আন্দোলনের তীব্রতা বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাজ্য বিহারেও দেখা দেয়।

সতীনাথ ভাদুড়ী বিহার রাজ্যের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার অধিবাসী। অখ্যাত, আঞ্চলিক একজন রাজনৈতিক কর্মী। তিনি আগষ্ট আন্দোলনের দিনগুলিকে, তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী' (১৯৪৫)-তে তুলে ধরলেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি কোন ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর দেশভক্তি আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি সুচিন্তিত ভাবে কর্তব্য-বোধের তাড়নায় দেশভক্তির সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। অর্থনীতিতে এম.এ. এবং আইনের ডিগ্রি নিয়ে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই ছাত্রজীবন সমাপ্ত করেন। আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করাও তাঁর কাছে দুরূহ ছিল না ; কিন্তু তিনি তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি এবং দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মননশীল ছিলেন এবং মানুষের প্রতি তাঁর অসীম মমত্ববোধ ছিল। এই দুটি গুণই তাঁকে বাস্তবনিষ্ঠ করে তুলেছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার কোন অভিলাষ তাঁর ছিল না। সুগভীর জীবনবোধ এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসাই তাকে সাহিত্যিক হতে সাহায্য করেছিল।

সতীনাথ ভাদুড়ী একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন। আপোষহীনতা তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। যে কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি একদিন রাজনীতির বন্ধুর পথের অভিযাত্রী হয়েছিলেন সেই কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতেও দ্বিধান্বিত হননি। তাঁর জীবনাচরণ এবং সাহিত্যসাধনার মধ্যে অতীত ভারতের জ্ঞানতাপস ঋষির প্রতিবিম্ব দেখা যায়। তাঁর সঙ্গে সমকালের সাহিত্যের এবং সাহিত্যিকদের এখানেই পার্থক্য ছিল। ত্রিশের দশক থেকেই গতানুগতিক সাহিত্য রচনার ধারা স্তিমিত হয়ে আসে এবং তার পরিবর্তে নতুন কিছু সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়। এ বিষয়ে যে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরাই

পথিকৃৎ ছিলেন তা ঠিক নয়। এই গোষ্ঠীর বহির্ভূত অনেক লেখকের মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা যায়। প্রসঙ্গক্রমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে অতি আধুনিকতার সুর উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল। বলা যেতে পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কোচের বিহ্বলতাকে একেবারে কাটিয়ে উঠেছিলেন। মনন ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণ কাঠিন্যে তাঁর রচনাবলী হীরকখণ্ডের মত উজ্জ্বল ছিল। বাস্তবতার রূপায়ণে তীক্ষ্ণতায় ও গভীরতায় তিনি আজও প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় তথাকথিত আধুনিক চিন্তার ফলশ্রুতিস্বরূপ ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রচ্ছায়-ক্রমশঃ দূরে সরে গিয়ে তাঁর বক্তব্যকে ঋজু বলিষ্ঠ এবং পরিণত করে তুলেছিল। তাঁর রচনার দার্শনিকতা ও ভাবুকতা তাই কোন প্রক্ষিপ্ত বিষয় নয়। মননশীলতার এমন একটি পর্যায়ে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী পাওয়া যায় না।

বুদ্ধিপ্রধানজীবন-সমালোচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং প্রবোধকুমার সান্যালের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের রচনাতেও পালাবদলের পালা, তাঁদের মনন এবং মস্তিষ্ক কাব্যের সরস বেষ্টনীতে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু কল্পনাবিলাস বা কাব্যচর্চার রামধনু সৃষ্টি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রকৃতি বিরোধী ছিল। উল্লিখিত সাহিত্যিকদের রচনা বিশ্লেষণ করা আমাদের বর্তমানের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। কেবল এ সত্যই আবিষ্কার করা যে নতুন কিছু সৃষ্টির উন্মাদনায় যখন তরুণ আধুনিক লেখকেরা সমাজরূপায়ণের পথে না গিয়ে সমাজের রূপকার হতে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা পুষ্ট নগর জীবনের অন্ধ গলির চোরা পথে নিষিদ্ধ জীবনলীলা, ইউরোপীয় রীতিতে বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছিলেন তখন সতীনাথ ভাদুড়ী কলকাতার বহুদূরে পূর্ণিয়ায় বসে আগামী ভারতের মানস পটপরিবর্তনের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। শহুরে মধ্যবিত্ত নরনারীর পারস্পরিক সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ফ্রয়েডীয় সূত্রের তীক্ষ্ণ ফলাকা দিয়ে ফাটল ধরাতেই অধিকাংশ অত্যাধুনিক লেখক মেতে উঠেছিলেন। বাস্তবতার নামে পঙ্কিলতা এনে আখের স্বাদকে নোন্‌তা করে তুলেছিলেন, ব্যতিক্রম অনেকেই ছিলেন; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতকীর্তি লেখকেরা নগর-জীবন রূপায়ণ অপেক্ষা গ্রাম বাংলার রূপ রূপায়ণেই অধিকতর

স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। কিন্তু তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণের রচনায় রোমান্সের সুবাস সর্বত্র না হলেও অল্প বিস্তর পাওয়া যায়।

তারাশঙ্কর জমিদারীর অতীত গৌরবের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেননি। জীবন সম্পর্কে বহুমুখী আগ্রহবিশিষ্ট শক্তিমান ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা প্রায় ক্ষেত্রেই অন্তর্দ্বন্দ্বহীন, ফলতঃ সরলীকৃত, পরবর্তীকালে 'সপ্তপদী'র মত যন্ত্রণা জটিল উপন্যাস লিখলেও তারা কেউই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবিত্ত নায়কের মত যথার্থ কালোচিত অন্তর্দ্বন্দ্বের ভারে পীড়িত নায়ক-নায়িকা নয়। ক্ষীয়মাণ সামন্ত স্বর্ণের অস্তরাগের আভায় তাঁর রচনা প্রদীপ্ত ছিল। নগর জীবনের সত্যিকারের গভীরে তিনি কখনও যাননি। তিনি প্রাচীন ভারতীয় বিশ্বাসের অচঞ্চল শান্ত মহিমাকেই এ কালের পটে নবমূল্য প্রদানে ব্যস্ত থেকেছেন। মানুষের প্রতি গভীর প্রত্যয়ে জীবনে সুস্থতার সন্ধান করেছেন। মহৎ শিল্পের উপাদান হিসাবে জীবনকে তিনি যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তারা-শঙ্কর অবশ্যই ভাবীকালের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

বাংলা উপন্যাসের অন্যতম বরণীয় লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির মায়ার নাগপাশে আবদ্ধ ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ এক ভিন্ন আস্বাদ এনেছিলেন, যার প্রয়োজন তখন একান্তভাবে ছিল। এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

"বাংলা সাহিত্যের ধারা এক জায়গায় এসে থেমে যাবার মত হয়েছে। রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের পর যে কি হবে, তা কেউ যেন ভেবে পাচ্ছে না, নূতনত্ব চাই, কিন্তু সে নূতনত্বের অর্থ দাঁড়িয়েছে পাঁক গুলে স্রোত ময়লা করা। বাঙ্গালীর দম আটকে যাচ্ছে, ঠিক এই সময়ে প্রায় অপরিচয়ের প্রদোষ থেকে বিভূতিবাবু 'পথের পাঁচালী' নিয়ে আলোয় এসে দাঁড়ালেন।"[৪]

তিনি এসেই "আমরা দীর্ঘ দীর্ঘ বিরোধ ও কঠিন প্রতিবাদের দ্বারা যে সহজ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই, বিভূতিভূষণ অবলীলাক্রমে শুধু দৃষ্টান্তের দ্বারা সাহিত্যের সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।"[৫]

বুদ্ধি অপেক্ষা আবেগ, মনন অপেক্ষা জীবনরস এঁদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

পক্ষান্তরে হৃদয় অপেক্ষা মনন, আবেগ অপেক্ষা বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে 'সবুজপত্র' পত্রিকাকে ঘিরে একটি সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। ইংরেজী,

ফরাসী ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী তাঁদের অগ্রগণ্য ছিলেন। 'সবুজপত্রে'র মধ্য দিয়ে চিন্তা, সমালোচনা ও সাহিত্য আন্দোলনের যে ধারার সূচনা হয়েছিল তা মূলতঃ এত বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ছিল যে, যে সকল বুদ্ধিবাদী মননশীল লেখকেরা এই পরিমণ্ডলে সাহিত্যচর্চা করেছেন তাদের বৈদগ্ধ্যের সংস্কার অনেকক্ষেত্রেই সৃষ্টিধর্মিতার অন্তরায় স্বরূপ হয়ে এই সকল রচনাকে রসোত্তীর্ণ হতে দেয়নি। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান ঔপন্যাসিক অন্নদাশঙ্কর রায়। কিন্তু তাঁর পাঠকসমাজ মূলতঃ নাগরিক শিক্ষিত সমাজ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মূলতঃ হাস্যরসিক লেখক হিসেবে সুপরিচিত হলেও মনস্তত্ত্বপ্রধান রচনাতেও যে সার্থকতা অর্জন করেছিলেন তাঁর 'নীলাঙ্গু-রীয়' নামক উপন্যাস সে কথার সাক্ষ্য দেয়।

মননপ্রধান এই সমস্ত লেখকের রচনা তারাশঙ্কর কিংবা বিভূতিভূষণের মত জনসমাদর লাভ করতে পারেনি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা সতীনাথ ভাদুড়ীর অগ্রজ ছিলেন। এঁরা সকলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন এবং এঁদের মানস গঠন তার অনেক আগেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে ত্রিশের যুগের মননপ্রধান লেখকদের এখানেই পার্থক্য ছিল।

সতীনাথ ভাদুড়ী উত্তরাধিকার সূত্রে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের পেয়ে-ছিলেন, কিন্তু তাঁদের মননশীলতার সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন-ভাবনার কোন যোগ ছিল না। সাহিত্য ও উপন্যাসের পটভূমি রচনার ক্ষেত্রে সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অপর কোন সাহিত্যিকের সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য তিনি বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন না। বিহারের বিশেষ অঞ্চল এবং অধিবাসীরাই তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী ছাড়া আরও অনেক প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করে গেছেন। বনফুলের (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর রচিত সাহিত্যকে কোন বিশেষ অঞ্চলের বলে চিহ্নিত করা চলে না। বনফুলের রচনায় এক ধরণের নৈরাশ্য-চেতনা আছে যা তাঁর মানবতাবোধকে অনেকসময় আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে অঞ্চল বিশেষের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর বিখ্যাত রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত "হাটে বাজারে' উপন্যাসে একজন দরদী চিকিৎসককে কেন্দ্র করে কিছু স্থানীয়

চরিত্র এসেছে, কিন্তু তাদের অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য তত প্রকট নয়। নিপীড়িত মানবাত্মা সর্বত্রই এইভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকে। সুতরাং বনফুলের সাহিত্য শাশ্বত নরনারীর চিরন্তন পরিচয়ই বহন করে চলেছে।

শিল্পরীতি গ্রহণে সতীনাথ ভাদুড়ী দেশী শিল্পরীতিকে নিজের অন্তরের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি স্বক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ। বাংলা ঔপন্যাসিকদের ঐতিহ্য তাঁর প্রতিভার উপর ছায়াপাত করেনি।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য জীবনের শেষ পর্বের তিনটি উপন্যাস 'অচিন রাগিণী', 'সংকট' এবং 'দিগ্‌ভ্রান্ত' যথার্থ আধুনিক উপন্যাস। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৬ সাল, এই দীর্ঘ বারো বছরে তিনি মাত্র তিনটি উপন্যাস রচনা করেন, তাঁর আধুনিক জীবন-ভাবনা এই উপন্যাসগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৩৬০ সালের ২ মাঘ থেকে ১৩৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত মোট আঠারোটি সংখ্যায়'অচিন রাগিণী'দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মনস্তত্ত্ব-মূলক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'অচিন রাগিণী' একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রায় সকল উপন্যাসের মত 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসেও প্রচলিত নায়ক-নায়িকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসের আরম্ভটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, লেখক, পাঠকের অভ্যস্ত রুচিকে প্রথমেই ভেঙ্গে দিতে চান,কেন না তিনি যে জগতেরকথা বলতেচান সেখানে অভ্যস্ত রুচি নিয়ে যাওয়া যায় না, অন্য-মনস্ক এবং কাহিনী-প্রিয় পাঠককে প্রতিমুহূর্তেই হোঁচট খেতে হয়, এইজন্য তিনি শুরুতেই পাঠকের অভ্যস্ত রুচিকে চমকে দেন।

"পিলে, নতুন দিদিমা আর তুলসী, তিনজনকে নিয়ে এই টান ভালো-বাসার গল্প। সোনা পিলের মুখে।"[৬] 'টান ভালোবাসার' কথাটি নতুন দিদিমার সৃষ্টি। সাধারণ ভালোবাসার গল্পের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু 'টান ভালোবাসা' এটি সম্পূর্ণ নতুন কথা, পাঠকের জ্ঞাত শব্দের মধ্যে পড়ে না।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সবকটি উপন্যাসই বিহারের মফঃস্বল শহরের পটভূমিতে বিবৃত। 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসটিও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রবাসী বাঙ্গালী এবং বিহার প্রদেশের অধিবাসী এই দুই শ্রেণীর চরিত্রই উপন্যাসটির মধ্যে পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য উপন্যাসগুলির সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসটির

প্রধান পার্থক্য এই যে,নতুন দিদিমা বাংলাদেশের মেয়ে,বিবাহ সূত্রে বিহার-বাসিনী হন। এই জন্য নতুন দিদিমার সংলাপে এবং আচার-আচরণে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। সতীনাথ ভাদুড়ী অতি-সচেতন লেখক ছিলেন, তিনি নতুন দিদিমার চরিত্র পরিকল্পনার সময়ে এই বিষয়টির উপর যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছিলেন। এই কারণে উপন্যাসের অন্যান্য বাঙ্গালী চরিত্রগুলোর সঙ্গে নতুন দিদিমার চরিত্রটির পার্থক্য খুব সন্তর্পণে রক্ষা করে গেছেন। পিলে এবং তুলসীর বাংলাদেশের বাইরে জন্ম হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রতি তাদের দুর্বার আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণ কেবল তুলসী এবং পিলের নয়। মানুষেরই এই একটি স্বাভাবিক ধর্ম। আজীবন প্রবাস বাসী হলেও পূর্বপুরুষের দেশ এবং ভাষার প্রতি রোমান্টিক কল্পনা বিলাস মানুষ মাত্রেই কিছু না কিছু থাকে। পিলে এবং তুলসীর এই সুপ্ত কল্পনাকে নতুন দিদিমা জাগিয়ে তুলেছিল। নতুন দিদিমার প্রতি তাদের গভীর ভাবে আকৃষ্ট হবার এটা একটা অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাদের যে অপার কৌতূহল নতুন দিদিমার সংস্পর্শে এসে সেই কৌতূহল আংশিক নিবৃত্ত হল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীও আজীবন প্রবাসী ছিলেন, তাই তিনি অতি সহজেই এবং আন্তরিকভাবেই পিলে এবং তুলসীর এই মানসিকতা উপলব্ধি করেছিলেন। নতুন দিদিমাকে পিলে, তুলসী নতুন করে আবিষ্কার করে। "নতুন দিদিমার কথা কি মিষ্টি। শুধু মিষ্টি নয়, নতুন ধরণের। বাংলাদেশের লোকে হয়তো এর মাধুর্য ধরতে পারবে না। কিন্তু পিলেদের জন্ম বাংলার বাইরে। তারা অন্য রকম বাংলা কথায় অভ্যস্ত। সে ভাষা হয়তো বইয়ের সঙ্গে বেশী মেলে, কিন্তু তার সুর 'হিন্দির',ভঙ্গি আড়ষ্ট। তাই নতুন দিদিমার কথার সুরে তাদের চমক লাগে। কখনও বাংলাদেশ দেখেনি বলে তারা লজ্জিত। বাধ্য না হলে এ কথা তারা কারও কাছে স্বীকার করতে চায় না।"[৭]

সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনার একটি প্রধান বিশেষত্ব তিনি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর একটি পূর্ণাঙ্গরূপদান করেন। তিনি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যে শিল্পরীতিটি গ্রহণ করেছিলেন তাতে, কাহিনীর গতি ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা, চিন্তার সূক্ষ্মজালে বোনা রচনায় কাহিনী অপেক্ষা চরিত্রগুলিই অধিক প্রাধান্য লাভ করে। সতীনাথ

ভাদুড়ী কাহিনীর চরিত্রগুলির আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং সহজ কাব্যিক বর্ণনায় রচনার মধ্যে একটি ভিন্ন স্বাদ আনতে সক্ষম হয়েছেন। প্রবাসে দ্বিতীয়পক্ষের স্বামীর ঘর করতে গিয়ে নতুন দিদিমা যে দাম্পত্যজীবনে সুখী হতে পারে না; সপত্নীর ছেলে মেয়েকে স্নেহ, ভালোবাসা দিলেও সংসার অপবাদ খণ্ডন করা সম্ভব নয়, নতুন দিদিমার জীবনের এই বেদনাকে লেখক অত্যন্ত সুকৌশলে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রবাস জীবনে এসে বঙ্গভূমির জন্য নতুন দিদিমার মমতা, তাঁর ব্যর্থজীবনের বেদনারই বহিঃপ্রকাশ। আপাত চঞ্চল এবং রঙ্গপ্রিয় নতুন দিদিমার চরিত্র পরিকল্পনায় বারে বারে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ আনার মধ্যে নতুন দিদিমার জীবনের নিঃসঙ্গতার কথাই আমাদের মনে পড়ে। পিলে এবং তুলসী তাই নতুন দিদিমার নিঃসঙ্গ জীবনের অনেকটা অংশই অধিকার করে নেয়। নতুন দিদিমার সঙ্গে তাদের এক অভিনব সম্পর্ক গড়ে উঠে। নতুন দিদিমার ভালোলাগা মন্দ লাগার সঙ্গে নিজেদের জীবনকেও জড়িয়ে নেয়। নতুন দিদিমা বাংলা-দেশের মেয়ে, পিলে, তুলসী কোনদিন বাংলাদেশ দেখেনি, কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি তাদের আকর্ষণ তীব্রতর হয় নতুন দিদিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর। নতুন দিদিমা পিলে এবং তুলসীর কাছে তাঁর বাল্যের স্মৃতি রোমন্থন করেন দেশের গল্প করতে করতে বিভোর হয়ে যান :

"সেখানকার ইষ্টিশনে গরুর গাড়িতে চড়বা মাত্র, দেশের গন্ধে গন্ধে আমি আবার ছোট বেলার আমি হয়ে যাই। আমার মতো বয়েস হোক, তোরাও বুঝবি। দেশের রাস্তার গন্ধই আলাদা। আসশেওড়ার জঙ্গল দুধারে। এদেশে তো আস্‌শেওড়ার গাছ নেই। কত আস্‌শেওড়ার ফল খেয়েছি ছোট বেলায়। বেতের ফল, ডোঙ্গুর, গাব এসব তো তোরা চোখে দেখিসইনি।"[৮]

সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর জীবনের শেষপর্বের এই তিনটি (অচিন রাগিণী, সংকট, দিগ্‌ভ্রান্ত) উপন্যাসে, এমন এক শিল্প কৌশল গ্রহণ করেছেন যার সাহায্যে অনায়াস ভঙ্গিতে পাঠককে তাদের অজান্তে এক জটিল মনোজগতে নিয়ে যান, পাঠক যখন সম্বিৎ ফিরে পান তখন পাঠক সেই জগতের অংশীদার হয়ে পড়েন। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিটি সতীনাথের একেবারেই নিজস্ব সৃষ্টি।

সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রায় সবকটি উপন্যাসের মত 'অচিন রাগিণী' উপ-ন্যাসেও কোন সুনির্দিষ্ট প্লট নেই। চেতনা প্রবাহের রীতিতে কাহিনীটি বিধৃত

হওয়ার জন্য ঘটনার পারম্পর্য অনুযায়ী চরিত্রগুলি বিকাশ লাভ করে নি, আগে পরে সময়ের কোন শৃঙ্খলা না রেখে সতীনাথ কাহিনীটিকে বর্ণনা করেছেন, এই কারণে বহু ঘটনার স্মৃতি এবং চিন্তার সূত্র থেকে কাহিনীবস্তু বার করা বা তার রসাস্বাদন করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছুটা ক্লান্তিকর। 'অচিন রাগিনী' কাহিনী নির্ভর কিংবা চরিত্র নির্ভর উপন্যাস নয়। মূলতঃ উপন্যাসটি মনস্তত্ত্ব নির্ভর, কিন্তু মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে লেখক একটি জীবনভিত্তিক কাহিনী বয়ন করে গেছেন, যা মনোযোগী পাঠকের কাছে সহজেই ধরা পড়ে।

বাংলাদেশের মেয়ে নতুন দিদিমা এক বিহার প্রবাসী ঠিকাদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়ে তুলসী এবং পিলেদের পাড়ায় আসেন, কাহিনীর মধ্যে নতুন দিদিমার কোন নাম পাওয়া যায় না, যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে জানতে পারা যায়, ঠিকাদারবাবুর সঙ্গে নতুন দিদিমার বয়েসের অনেক পার্থক্য ছিল। অল্প বয়সের বাংলাদেশের বধূটির দিদিমা নামে পরিচিতি লাভেরও একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। ঠিকাদারবাবু যে অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন সে অঞ্চলে হরগোপাল উকিলের খুব নাম ডাক ছিল। তাঁর বাড়ীর ফটকে ইংরাজিতে 'রায় বাহাদুর কাটেজ' লেখা ছিল। একটা নামের মিলের সূত্রে হরগোপাল উকিল ঠিকাদারবাবুকে শ্বশুর বলে ডাকতেন। ঠিকাদারবাবু তাঁকে 'জামাই' বলে ডাকতেন। এই জন্য ঠিকাদার বাবুর স্ত্রীকে রায় বাহাদুরের ছেলেমেয়েরা দিদিমা বলে ডেকে এসেছে। এর থেকেই ঠিকাদার বাবুর স্ত্রী স্থানীয় সব ছেলেমেয়েদের কাছে দিদিমা বলেই পরিচিত হন। ঠিকাদার বাবুর পত্নী বিয়োগ হলে, তিনি পুনরায় বিবাহ করে যে নতুন বৌকে ঘরে আনলেন তিনিও উত্তরাধিকার সূত্রে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের কাছে নতুন দিদিমা বলেই পরিচিত হলেন। ঘটনাটি সামান্য হলেও এর তাৎপর্যটি অত্যন্ত গভীর। দিদিমা হওয়ার সঙ্গে একটা বয়েসের সম্পর্ক জড়িত, নতুন দিদিমা বয়েসে প্রবীণা না হলেও তিনি যে সম্মানে প্রবীণা এ ধারণা তাঁর ছিল এবং লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে নতুন দিদিমার এই মানসিক দ্বন্দ্বটি ফুটিয়ে তুলেছেন। নতুন দিদিমা স্থানীয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক্কা দোক্কা খেলতেন, আবার স্বামীর বয়েসের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে নিজের চুল পাকিয়ে দেবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন।

"রায় বাহাদুরের গিন্নীর বয়স দেখবে পঁয়তাল্লিশে আটকে গিয়েছে; আর

বাড়ে না, অথচ তাঁর ছেলের বয়স পঁয়তাল্লিশ হয়ে গিয়েছে, ওঁর, ছেলের বউকেই দেখনা সাত ছেলের মা, তবু রঙিন কাপড় পরবে। আমার কিন্তু ঠিক এর উল্‌টো। নিজেকে বয়সের চেয়ে বড দেখানোর চেষ্টা করতে করতেই জীবন গেল। কেউ জিজ্ঞাসা করলে সব সময় বয়স বাড়িয়ে বলি। ঠাকুরের কাছে চিরকাল বলে এসেছি, হে ঠাকুর আমার মাথায় চুল পাকিয়ে দাও তাড়াতাড়ি।"[৯] নতুন দিদিমার মনের এই আক্ষেপটুকু চরিত্রটিকে বাস্তব এবং জীবন্ত করে তুলেছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর কৃতিত্ব এইখানেই, তিনি জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য উপন্যাস রচনার যে রীতিটি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে চরিত্রগুলির রক্তমাংসের না হয়ে লেখকের উচ্চতর কোন ভাবের বাহন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল এবং সে ক্ষেত্রে উপন্যাসের শিল্প-গুণের হানি হত ; কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী 'অচিন রাগিণী', 'সংকট' কিংবা 'দি্‌গভ্রান্তের' মত জটিল মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের মধ্যেও একটি সুমধুর পারিবারিক কাহিনী রচনা করেছেন। প্রথাপ্রকরণের দিক থেকে 'অচিন রাগিণী' 'সংকট' এবং 'দিগ্‌ভ্রান্ত' সমগোত্রীয় রচনা হলেও ভাবনার দিক থেকে 'অচিন রাগিণী' 'সংকট' কিংবা 'দিগ্‌ভ্রান্তের' মত ততটা আধুনিক নয়। বস্তুতঃপক্ষে 'অচিন রাগিণী' যাদের নিয়ে রচিত তাদের মধ্যে পিলেকে বাদ দিলে কাহিনীর আর কেউ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। পিলে পরবর্তীকালে ডাক্তারী পাশ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশের গ্রাম্য মেয়ে নতুন দিদিমার সংসার জীবনের দ্বন্দ্বের সঙ্গে 'দিগ্‌ভ্রান্ত'উপন্যাসের অতসীবালার জীবনের 'সংকট' সমগোত্রীয় নয়। সতীনাথ ভাদুড়ী অত্যন্ত সচেতন শিল্পী ছিলেন। তিনি পাত্র-পাত্রীর শিক্ষা এবং মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই তাদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। এই কারণেই চরিত্রগুলি কোথাও বাস্তব-বিমুখ হয়ে পড়েনি।

একথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে 'অচিন রাগিণী' মূলতঃ মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস এবং লেখক প্রধানতঃ কাহিনীর প্রধান তিনজন পাত্র-পাত্রী অর্থাৎ, নতুন দিদিমা, পিলে এবং তুলসীর মানসরাজ্যের আলোড়ন বহু বিচিত্র রঙে চিত্রিত করেছেন, কিন্তু এর জন্য কাহিনীর অপ্রধান চরিত্রগুলি লেখকের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পথের বাইরে থাকেনি। কাহিনীতে নতুন দিদিমার স্বামী ঠিকাদার-বাবুর পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া না গেলেও চরিত্রটি অসম্পূর্ণ থাকেনি।

নতুন দিদিমার সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবনের মধ্যবর্তী দূরত্বটুকু লেখক

অতি বাস্তবতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যবর্তী এই দূরত্বটুকু না থাকলে নতুন দিদিমার সঙ্গে পিলে এবং তুলসীর 'টান ভালোবাসার' সম্পর্কটি গড়ে উঠতো না। ঠিকাদারবাবুর সঙ্গে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বয়েসের ব্যবধান ছিল তেত্রিশ বছরের। নতুন দিদিমা সতের বছর সংসার করার পর তাঁর স্বামী ঠিকাদারবাবু মারা যান। এই পক্ষে ঠিকাদারবাবুর একটি সন্তান হয়, কেষ্ট। এই সুদীর্ঘ সংসার জীবনে নতুন দিদিমার ঠিকাদার-বাবুর সঙ্গে কোন বোঝাপড়া হয়ে ওঠেনি। বয়েসের ব্যবধান এবং পূর্বপত্নীর সন্তানের মুখ চেয়ে ঠিকাদারবাবুও কোনদিন স্ত্রীর কাছে সহজ হতে পারেন নি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহজ এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথে অন্তরায় থাকলেও, নতুন দিদিমা সংসারের সব কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। বয়স্ক স্বামীকে কোনদিন অভক্তি বা অনাদর করেন নি। সতীনের ছেলেমেয়েকেও নিজের সন্তানের মতই আদর করতেন। শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় অধিকাংশ নারী চরিত্র রূপায়ণে নারীর কল্যাণী রূপটি যেমন পরিস্ফুট করেছেন তেমন ভাবেই সতীনাথ ভাদুড়ী 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসে নতুন দিদিমার কল্যাণী রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। সেবা নিষ্ঠা এবং স্বার্থত্যাগের মহিমায় নতুন দিদিমা আদর্শ মহিলা; কিন্তু এখানেই নতুন দিদিমার চরিত্রটি সম্পূর্ণ নয়। সংসারে অনেক কাজের মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করেন, ব্যক্তি জীবনের শূন্য স্থানটিকে নানা ভাবে পূরণ করতে চেষ্টা করেন। তিনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির নারী, যিনি পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক্কা দোক্কা খেলতেন, আবার স্বামীর বয়েসের সঙ্গে সমতা আনতে ভগবানের কাছে তাঁর চুল পাকিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করতেন। বিয়ের পর নতুন দিদিমা যখন ঠিকাদারবাবুর সঙ্গে সংসার করতে আসেন তখন সতীনের বড় ছেলে তারার বয়েস বছর দশেক, আর তারার বোন গুলটি তখন খুবই ছোট। নতুন দিদিমা সতীনের ছেলেমেয়ে দুটিকে নিজের আপন সন্তানের মতই স্নেহ করলেও বিনিময়ে আঘাত ছাড়া আর কিছুই পান নি। বাইরের সংঘাত তাঁর অন্তরকে সব সময়ই দোলায়িত রেখেছে, কখনও স্থির হতে দেয়নি। সতীনাথ ভাদুড়ী নতুন দিদিমার অন্তরের এই অস্থিরতার দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের মধ্যেই কাহিনীবৃত্ত রচনা করেছেন, তাঁর জীবনের শেষ পরিণতির কোন সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত দেন নি, তাই মনে হয় কাহিনীটি যেন হঠাৎই শেষ হয়ে গেছে।

আসলে সতীনাথ ভাদুড়ী পূর্ব প্রথানুযায়ী কাহিনী অন্তে কোন সুখকর বা করুণ পরিণতি দেখাতে চাননি। নতুন দিদিমা তাঁর জীবনের চরমতম আঘাতটি তাঁরই সবথেকে প্রিয় পাত্র তুলসীর কাছ থেকেই পাবেন, কিন্তু এই নির্মম আঘাতটুকু পাবার আগেই কাহিনী শেষ হয়ে গেছে। যে নিদারুণ আঘাত নতুন দিদিমার জীবনে আসতে চলেছে পিলেই প্রথমে তা জানতে পেরে তাঁর অতি আপনজন নতুন দিদিমার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে ব্যথিত হয়েছে। মনস্তত্ত্বের এমনতর বিশ্লেষণ বাংলা উপন্যাসে বড় একটা চোখে পড়ে না। পিলে নতুন দিদিমা এবং তুলসী এই তিনজনকে নিয়ে লেখক যে 'টান ভালোবাসা'র গল্প বলতে চেয়েছিলেন, তা এই তিনজনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে।

'অচিন রাগিণী'র কাহিনীর প্রধান চরিত্র তুলসী, তুলসীর কৈশোর থেকে যৌবন কাল পর্যন্ত কাহিনী বিস্তৃত। তুলসীর পিতা গাঙ্গুলী মশাই পি. ডবলিউ. ডি.-তে কাজ করতেন। তুলসী খুব অল্প বয়সেই মাকে হারায়। এরপর তুলসীর পিতা গাঙ্গুলি মশাই আর বিয়ে করেন নি। তিনি বরাবরই আত্মভোলা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মাতৃহীন তুলসীর প্রতি তিনি কোনোদিনই যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন নি। বাল্যাবস্থায় মাতৃহীন হওয়ার জন্য তুলসী গৃহের প্রতি টান কোনদিনই অনুভব করেনি। ইস্কুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক দীর্ঘ কালের ছিল না। তুলসীর পিতা গাঙ্গুলী মশাই কোনদিনই কঠিন শাসনে ছেলেকে রাখতে পারেন নি। আপিশের কাজ এবং সন্ধ্যের পর নেশা করা ছাড়া তাঁর জীবনের আর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। লেখকও এর থেকে বেশী তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেন নি। গাঙ্গুলি মশাই-এর চরিত্রের একটি কোমল দিকও ছিল ; তিনি সুগায়ক এবং সঙ্গীত বোদ্ধা ছিলেন। তুলসী উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার এই সদ্গুণগুলির অধিকারী হয়েছিল।

'অচিন রাগিণী' উপন্যাসে নতুন দিদিমার পর তুলসীর চরিত্রটির উপর লেখক অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

পিলে নামটি তুলসীর নিজেরই দেওয়া। ছোটবেলায় পেটের রোগে ভুগতো বলে তুলসী তার 'পিলে' নাম দিয়েছিল। পিলে এবং তুলসীর বাল্যকাল থেকেই বন্ধুত্ব। কিশোরদের মধ্যে নেতা হওয়ার সব গুণগুলি থাকার জন্য তুলসীই দলের পাণ্ডা ছিল। তারই নেতৃত্বে ছেলের

দল ঠিকাদারবাবুর বাগানের কলা চুরি করে যাবার সময় বমাল ধরা পড়ে এবং এই সূত্রেই ঠিকাদারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তুলসীর এবং পিলের পরিচয়। পিলে অবশ্য তার আগে ছোট বেলায় তার দিদির সঙ্গে নতুন দিদিমার বাড়ীতে আসতো। আর দশজনের থেকে পিলে অন্য প্রকৃতির ছিল। পিলে আর তুলসী এক বয়সী হলেও তুলসী ডানপিটে ছিল, তার মুখে কথা আসতো অনায়াসে, যে কোন পরিস্থিতিতে তুলসী নির্ভীক ভাবে এগিয়ে যেতে পারতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'অচিন রাগিণী' ঘটনা-প্রধান উপন্যাস নয়, মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস। সতীনাথ ভাদুড়ী পিলে, তুলসী এবং নতুন দিদিমাকে নিয়ে যে 'টান ভালোবাসা'র গল্প লিখেছেন, তাতে তুলসীকে বোহেমিয়ান রূপে পাই। কিন্তু লেখক তুলসীর এই প্রকৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার জন্য বহির্ঘটনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি, অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম ভাবনায় তুলসীর চরিত্রটি পরিস্ফুট করেছেন। তুলসীর সঙ্গে পিলে কোন প্রতিযোগিতাতেই এঁটে উঠতে পারে না। পিলের শরীর স্বাস্থ্য তুলসীর মত অটুট নয়। অনেক দিক থেকে দুর্বল, কথায় সঙ্কুচিত ভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না। তুলসী নির্ভীক বেপরোয়া। স্পর্ধাভরে কথা বলতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না, তুলসী কাউকে না জানিয়েই বাড়ী থেকে নেপালে পালিয়ে যেতে পারে। এসবের কোন ক্ষমতাই পিলের ছিল না। কেবল লেখাপড়ায় পিলে সবাইকে ছাড়িয়ে যায়; কিন্তু তুলসীর মত বেপরোয়া স্পষ্টবক্তা ছেলেও নতুন দিদিমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে পিলের সঙ্গে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে। নতুন দিদিমার স্নেহ ভালোবাসায় তুলসী পিলেকেও সমান অংশ দিতে চায় না। লেখক অতি নিপুণ ভাবে তুলসীর মানসিকতা বিশ্লেষণ করেছেন। পিলে পরবর্তীকালে ডাক্তার হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে; কিন্তু তুলসীর অস্থির এবং অনিশ্চিত জীবনের সান্ত্বনা একমাত্র নতুন দিদিমার কাছেই।

পিলের ধারণা ছিল নতুন দিদিমার ভালোবাসার কাছে সেই ফার্স্ট, তুলসী সেকেণ্ড, ছেলেমেয়েরা তারপর ক্রমান্বয়ে থার্ড, ফোর্থ ইত্যাদি। পিলে ইস্কুল পাশ করার পর ডিব্রুগড়ে তার দিদি-জামাইবাবুর বাড়ীতে থেকে ডাক্তারী পড়তে যায়। পিলে ডিব্রুগড় থেকে দু-বছর পর বাড়ী ফিরে এসে অনেক কিছুই পালটে যেতে দেখলো। তুলসী ঠিকাদারী ব্যবসা আরম্ভ করেছে। মদ খাওয়া ধরেছে। এ কথা পিলে সেকরার ছেলেদের কাছ থেকে

শুনেছে। এ খবরে পিলে যতটা না অবাক হয়েছে, তার থেকে বেশী দুঃখিত হয়েছে। "ঠিকাদারির কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে তুলসীর পক্ষে মদ খাওয়াটা খুব আশ্চর্য নয়। নেশা ভাঙের ঝোঁক তার চিরকালের। কিন্তু সেতো আগে কোনো কথা লুকোত না পিলের কাছে। পিলেকে আর সে আগেকার অন্তরঙ্গের মর্যাদা দেয় না দেখা যাচ্ছে। তার আর তুলসীর মধ্যে একটি মিহি পর্দার ব্যবধানে গড়ে উঠেছে গত দুই বছরে।"[১০] এই ব্যবধানের কারণ কি পিলে বুঝে উঠতে পারে না। তার অবর্তমানে তুলসী নতুন দিদিমার উপর দখলটা আরও পাকা করে ফেলে। নতুন দিদিমার জন্য পিলেকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে এ ধারণা পিলে করতে পারেনি ; একদিন খবর না দিয়ে হঠাৎ করে নতুন দিদিমার ঘরে গিয়ে পিলে দেখে :

"নতুন দিদিমা পা ছড়িয়ে বসে; আর তুলসী তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। পিলের মনে হল সে, যেতেই তাঁরা শক্ত আড়ষ্ট মতো হয়ে গেলেন। অবশ্য এটা পিলের ধারণা মাত্র। তুলসী টান টান করে পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে ঠিক একখানা কাঠের তক্তার মতো। গুল্‌টিদি একটুও অবাক না হওয়ায় পিলে বোঝে যে, তুলসীর নতুন দিদিমার কোলে মাথা রেখে শোয়া নতুন জিনিস নয়।"[১১]

নতুন দিদিমার কাছের আশ্রয়টুকুই তুলসীর জীবনের একমাত্র সম্পদ। এরই জন্য তুলসী পিলের সঙ্গে ছলনার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। লেখক তুলসীর চরিত্রটি অত্যন্ত জটিল করে অঙ্কন করেছেন। একদিকে নতুন দিদিমার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, অপর দিকে বহির্জগতের প্রতি স্বাভাবিক টান এই দু-এর দ্বন্দ্বে তুলসী চরিত্রটি ক্ষত-বিক্ষত। এই কারণে তুলসীর অনেক আচরণেরই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তুলসী চরিত্রটির সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কিশোর ইন্দ্রনাথের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গৃহের প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষা বাইরের জগতের রোমাঞ্চ ইন্দ্রনাথকে বরাবর হাতছানি দিত। তুলসীও কোনদিন গৃহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেনি। কৈশোরের চঞ্চলতা নির্ভীক এবং বেপরোয়া ভাব ইন্দ্রনাথের মত তুলসীর চরিত্রেরও একটা প্রধান বিশেষত্ব ছিল। ইন্দ্রনাথের মতো তুলসীরও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিকে অস্বীকার করে কৈশোরেই নানা নেশা করার প্রবণতা উভয়ের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু ইন্দ্রনাথের চরিত্রের মধ্যে কোন জটিলতা ছিল না, পক্ষান্তরে তুলসীর

চরিত্রটি খুবই জটিল। অন্নদাদিদির সঙ্গে ইন্দ্রনাথের সম্পর্কের একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল এবং তা হল শাহজীর কাছ থেকে সাপের মন্ত্র শেখা। অন্নদাদিদিও ইন্দ্রনাথকে নতুন দিদিমার মত স্নেহ ভালোবাসার বেড়াজালে আবদ্ধ করেননি। তুলসী নতুন দিদিমার কাছ থেকে একক ভাবে ভালোবাসা-টুকু পাওয়ার জন্য তার বাল্যবন্ধু পিলের সঙ্গে ছলনা করেছে। এই তুলসীই আবার নতুন দিদিমার উপর অভিমান করে নতুন দিদিমার স্নেহভালোবাসাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে। পাতরঙ্গী নামক এক নিম্নজাতির নর্তকীর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়েছিল। তুলসীর এই পরিণতিটি কতদূর সঙ্গত হয়েছে তা একটু আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। নতুন দিদিমার জীবনের শূন্যতা এবং ট্রাজিক পরিণতি দেখানোর জন্য তুলসীর এহেন পরিণতি —মনে হলেও কাহিনীটিতে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি একথা বলা চলে না। অধঃপতনের বীজ তুলসীর চরিত্রে পূর্বাহ্নেই উপ্ত ছিল। নতুন দিদিমার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত এই পথে নিয়ে যাওয়ার কাজটি ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। নতুন দিদিমার প্রতি তার অবিচল বিশ্বাস ছিল, তার এই বিশ্বাস যখন আর থাকলো না তখন মনে হয় তুলসী এক ধরণের আত্মহননের পথই বেছে নিয়েছিল।

নতুন দিদিমার সতীনের ছেলে তারা। সে কোনদিন তুলসীকে সহ্য করতে পারতো না, সৎমার প্রতি অকারণ বিতৃষ্ণা তারার অন্তরে বরাবরই বর্তমান। মাতৃস্নেহ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়ে থাকার জন্য অন্য কেউ সেই ভালবাসাটুকু উপভোগ করুক এটা সে স্বাভাবিক কারণেই সহ্য করতে পারতো না। সতীনাথ ভাদুড়ী অপ্রধান চরিত্রগুলিরও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সজাগ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন; বিশেষ করে নতুন দিদিমার সতীনের ছেলে তারার চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত করে পরিস্ফুট করেছেন। কার্যত তারাই এই কাহিনীর খল চরিত্র। তার খলতার নেপথ্যে একটি বিশেষ মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল। তা হল তুলসীর প্রতি ঈর্ষা। তুলসীর প্রতি নতুন দিদিমার পক্ষপাতিত্বও তার ঈর্ষার অনলে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। পিলে এবং তুলসী উভয়েই নতুন দিদিমার কাছে আসলেও তারা পিলের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল না। পিলে ডাক্তার হয়ে যখন প্রাকৃটিস করতে বসে, তখন তারাই পিলেকে টাকা ধার দিয়েছিল। এই সংবাদ শুনে নতুন দিদিমা মন্তব্য করেছিলেন: "তুই পড়েছিস তারার শুক্লপক্ষে, সেটা পড়েছিল ওর কেষ্ট পক্ষে।"[১২]

তুলসীর বাবা গাঙ্গুলী মশাই পি.ডবলিউ. ডি.-তে কাজ করতেন। তিনি তারার বড়বাবু ছিলেন। এইজন্য গাঙ্গুলী মশাই যতদিন ছিলেন, ততদিন তারা তুলসী সম্পর্কে নীরব থেকেছিল, কিন্তু তুলসীর পিতার অবসর গ্রহণের পর তারা তুলসীকে বিতাড়নের পরিকল্পনা করে। তারা তুলসীর সম্পর্কে নানা কুৎসা রটনা করে। কুৎসার সবটুকু কল্পিত ছিল না, ঠিকাদারী কাজ করার সময় থেকে তুলসী মদ খাওয়া আরম্ভ করেছিল। তুলসী নেশা করার সংবাদে পিলে ব্যথিত হয়েছিল। তুলসী যেন তাদের বাড়ীতে কোনদিন না আসে একথা তারা তার সৎমা নতুন দিদিমাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল। অভিমানের বশবর্তী হয়ে নতুন দিদিমাও তুলসীকে তাদের বাড়ীতে আসতে নিষেধ করে দিলেন। এর পরের কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। তুলসী একবস্ত্রে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। ঘর সংসারের প্রতি কোনদিনই তুলসীর খুব একটা আকর্ষণ ছিল না। নতুন দিদিমার আকর্ষণে এতদিন সে ছিল। সেই নতুন দিদিমার কাছ থেকে এই আঘাত তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো এবং সে দেশত্যাগী হল।

পূর্বেই তুলসীর পিতা গাঙ্গুলী মশাই পরলোকগমন করেছিলেন। তুলসীর মা-বাবা সংসারের আর পাঁচজন কেউই ছিল না। চিরকালের ঘর পালানো ছেলে তুলসীর জীবনে একমাত্র আশ্রয়ই নতুন দিদিমার স্নেহছায়া, এই আশ্রয়-টুকুও হারিয়ে যাওয়ায় সে নাটিনদের দলে যোগ দিল। পাতরঙ্গী নামে নিম্নশ্রেণীর এক নাটিনের সঙ্গে থাকে, তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। এই পাতরঙ্গীই একদিন পিলের কাছে নিরুদ্দিষ্ট বন্ধু মৃত্যুশয্যায় এই সংবাদ নিয়ে এল। দীর্ঘকাল পিলে বন্ধুর কোন সংবাদ পায়নি, শেষ পর্যন্ত যে সংবাদ পেল তা খুব সুখকর নয়। 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসে লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে নতুন দিদিমাকে কেন্দ্র করে এক সংঘাতপূর্ণ কাহিনীর অবতারণা করেছেন, কিন্তু সংঘাত বাইরের জগতে নয় অন্তর জগতের। নতুন দিদিমাও এই সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়লেন, মাতৃহীন তুলসীকে তিনি অন্তর থেকে ভালোবাসতেন, কিন্তু তা কোনদিন প্রকাশ করতে চাইতেন না। কৈশোরে নতুন দিদিমার ভালোবাসা পাওয়ার ক্রমানুসারে পিলে ফার্স্ট, তুলসী সেকেণ্ড এবং নতুন দিদিমার আপন ছেলে কেষ্ট থার্ড একথাই ভেবে এসেছে, কখনও কখনও সে সেকেণ্ড, তুলসী ফার্স্ট একথাও ভেবেছে কিন্তু তার এই বিশ্বাসেও একদিন আঘাত এল। নতুন

দিদিমার নিজের সংসার বলতে স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলে তারার সংসার। নতুন দিদিমার নিজের ছেলে কেষ্ট চাকুরী সূত্রে অন্যত্র থাকে। নতুন দিদিমার সঙ্গে তার সতীনের ছেলে তারার চিরকালই মনোমালিন্য ছিল। তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হত। একথা পিলের অজানা ছিল না। পিলের কাছে নিরুদ্দিষ্ট মৃত্যুপথযাত্রী তুলসীর খবর পেয়ে নতুন দিদিমা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন। নতুন দিদিমা তাঁর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তারা বা পিলে কারো কাছেই প্রকাশ করতে চান না, তিনি পিলের সঙ্গে গাড়ীতে কমলপুরে তাঁর নিজের ছেলে কেষ্টর কাছে যেতে চাইলেন। পিলে সরসৌনি গ্রামে তুলসীকে দেখতে যাচ্ছিল, সেখানেই তুলসী পাতরজীর সঙ্গে থাকে। নতুন দিদিমা কেষ্টর কাছে যেতে চাইছেন, একথায় পিলের কেষ্টর উপর হিংসা হয়। নতুন দিদিমার সঙ্গে ভালোবাসার দৌড়ে কেষ্টকে কোনদিন তো তারা ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। "আজ হঠাৎ কেষ্ট কী করে ফার্স্ট হয়ে যাচ্ছে? অন্যায় কথা না? বিনা নোটিশে তুলসী পিলেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এ নিচে নামায় মান অপমানের প্রশ্ন নেই, কিন্তু ব্যথা আছে; অভিমানের বেদনা আছে; স্মৃতি রোমন্থন করে পক্ষপাতহীন বিচারের প্রয়াস আছে। চিরকাল 'সেকেন' এখন বোধহয় কেষ্ট ফার্স্ট, পিলে 'সেকেন'। তুলসীর অসুখের কথা পিলের কাছে গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুহূর্তের মধ্যে।"[১৩]

কাহিনীর গতিকে হঠাৎ থামিয়ে, পিলের এই সময়কার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্যে সতীনাথ পিলের জীবনের আসন্ন প্রায় ট্রাজিডির পূর্বাভাষ দিয়েছেন। কাহিনীতে শিল্পসৃষ্টির সযত্ন প্রয়াস সতীনাথের প্রায় সব কটি উপন্যাসের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

কমলপুরে ছেলের কাছে যাওয়ার কথা বলা, নতুন দিদিমার আরও একটি ছলনা একথা পিলে কিছু পরেই অনুভব করেছে। আসলে নতুন দিদিমা কমলপুরে যেতে চান না, কমলপুরের পথেই সরসৌনি গ্রাম সেখান থেকে তিনি তুলসীকে কমলপুরে সঙ্গে করে নিয়ে তার ছেলের বাড়ীতে চলে যেতে চাইছেন। নতুন দিদিমা পিলের সঙ্গে ছলনা করেছেন। পিলে হতাশ হয়ে পড়ে।

মুহূর্তের মধ্যে চিরকেলে 'সেকেন' পিলে, 'সেকেন' থেকে 'থার্ড' এ নেমে গেল। তুলসী ফাষ্ট, কেষ্ট সেকেন, পিলে থার্ড।

এখানেই পিলের জীবনের ট্রাজিডি। কাহিনী কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সতীনাথ ভাদুড়ী কাহিনীর করুণ রসটি আরও তীব্রতর করে তুলেছেন। নতুন দিদিমার কথানুযায়ী পিলে তুলসীকে পাতরজীর কাছ থেকে নিয়ে আসতে চায়। নিমজ্জিত তুলসীকে নতুন দিদিমা আবার স্নেহ ভালোবাসা সেবাযত্ন দিয়ে পুনর্জীবন দেবেন; কিন্তু তুলসী নতুন দিদিমার এ আশা পূর্ণ করতে দেয় না, সে নতুন করে বাঁচতে চায় না। জীবনের যে প্রান্তে এসে সে উপস্থিত হয়েছে সেখান থেকে নতুন দিদিমার কাছে আর ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। নতুন দিদিমার প্রতি তার ভালোবাসার শ্রদ্ধাটুকুকে সে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারে না। নতুন দিদিমা কিন্তু মটকার থান পরে অনেকদিন পর ফিরে পাওয়া তুলসীকে কোলে তুলে নেওয়ার জন্য গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। নতুন দিদিমার কথা তুলসী অবহেলা করেছে, এই সংবাদ পিলে কি ভাবে নতুন দিদিমার কাছে রাখবে? এই প্রশ্নের সঙ্গেই কাহিনী শেষ হয়ে যায়।

পাতরজী এবং তুলসীর উপকাহিনীটিও শেষ পর্যন্ত 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসের মূল করুণ সুরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে 'অচিন রাগিণী' উপন্যাস ঘটনা প্রধান নয়, মনের চেনা-অচেনালোকের রহস্যকে লেখক চেতনা প্রবাহের রীতিতে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছেন। শিল্পী-রীতি যে কাহিনীর সঙ্গে কি ভাবে একাত্ম হয়ে যেতে পারে 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসে তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখক হাস্যরসের মোড়কে অন্তর্লীন বেদনার করুণ ধারাটি অতি সুনিপুণ ভাবে প্রবহমান রেখেছেন।

'সংকট' উপন্যাসটি সতীনাথ ভাদুড়ীর মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসগুলির মধ্যে জটিলতম রচনা। ১৩৬৪ সালের আষাঢ় মাসে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসটির মধ্যে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, কাহিনী অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করলেও সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ পারিবারিক জীবন-কাহিনী পাওয়া যায়। 'সংকট' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ নিজে কাহিনীতে কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নি। তিনি তাঁর দেখা মানুষের জীবনের কোন বিশেষ

ঘটনার মুহূর্তকে আশ্রয় করে তাদের অন্তর জগতের তাৎক্ষণিক আন্দোলনকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও জানতে চেয়েছেন। এই আত্মানুসন্ধানই 'সংকট' উপন্যাসের মূল কথা। বর্তমান পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে, নায়কের যেমন আত্মানুসন্ধান দেখতে পাওয়া যায়, কাহিনীর সামান্য কোন সূত্র অবলম্বন করে নায়কের গভীর অন্বেষণ লেখকের স্বলব্ধ দার্শনিক মনোজগতে আলোক নিক্ষেপ করে, তেমনি 'সংকট' উপন্যাসে লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী কাহিনী বর্ণিত বিশ্বাসজীর মধ্য দিয়ে নিজেই আত্মানুসন্ধান করেছেন। এক অর্থে 'সংকট' সতীনাথ ভাদুড়ীর সর্বাঙ্গীন আধুনিক উপন্যাস। গ্রন্থটি সম্বন্ধে পাঠক মহলে সামান্য বিভ্রান্তি আছে। উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হবার পূর্বেই এই কাহিনীর কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন পত্রিকায় স্বাধীন রচনা রূপে পাওয়া যায়। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে সতীনাথ ভাদুড়ী লিখেছেন :

"পুস্তকে উল্লিখিত মুহূর্তগুলির মধ্যে কয়েকটির বিবরণ পূর্বে মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে।"[১৪]

একথা মনে হতে পারে যে, 'সংকট'কে উপন্যাসাকারে রচনা করার পরিকল্পনা পূর্বে লেখকের ছিল না, পরবর্তী কালে কোন একটি সাধারণ যোগ-সূত্র দিয়ে বিচ্ছিন্ন অধ্যায়গুলোকে অখণ্ডরূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে 'সংকট' রচনাটিকে উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করে আলোচনা করা সঙ্গত নয়। উপন্যাস রচনায় যতই নব নব প্রয়োগরীতি আবিষ্কৃত বা গৃহীত হোক না কেন উপন্যাস মূলতঃ মানুষের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার বাঙ্ময় রূপ। সমাজ, পরিবেশ, যুগচেতনা এমন কি পরিবারস্থ মানুষজনকে অস্বীকার করে যথার্থ উপন্যাস রচিত হতে পারে না, লেখকের উপলব্ধি যাই হোক না কেন, তার ভিত্তিপ্রস্তর বাস্তবের জমিতেই অথবা জীবনের ভূমিতেই প্রোথিত থাকে, এবং অখণ্ড কাহিনীসূত্রের মাধ্যমেই উপন্যাসে লেখকের দার্শনিক অনুভূতি প্রকাশ লাভ করে থাকে।

"সংকটের সব লেখাই ছোটগল্পের আকারে বেরিয়েছিল—বই বেরুবার সময় সেগুলোকে জুড়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা আছে। প্রথমে এই ব্যাপারটা দেখে একটু দুঃখিত হয়েছিলাম। এতে যেন ছোটগল্পের কিঞ্চিৎ সম্মান হানি করা হয়েছে।"[১৫]

একই ভাবনা পুষ্ট কিছু ছোটগল্পকে একত্রে জুড়ে দিলে তাতে কেবল ছোট-গল্পেরই সম্মান হানি হয় না, তাকে উপন্যাসেরও মর্যাদা দেওয়া যায় না।

মনে হয় 'সংকট' উপন্যাস রচনায় লেখকের পরিকল্পনাই কিছুটা ভিন্নতর ছিল। লেখক বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি মুহূর্তকে কাহিনী রূপ দিয়ে ভিন্ন গল্প রচনা করলেও আসলে তিনি মানুষের জীবনের সংকটময় মুহূর্তগুলোকে একজনের দৃষ্টি দিয়েই বিচার করেছেন। সেই প্রধানব্যক্তি কাহিনীতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে কাহিনীর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত না করলেও, কাহিনী বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের বাহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর মনস্তত্ত্বের জটিল দরজা কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরাই উদ্‌ঘাটন করেছে—এই কারণে 'সংকট' উপন্যাসে একটা অখণ্ড চিন্তাস্রোত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান থেকেছে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে 'সংকট'কে যদি উপন্যাস-ই বলি, তবে এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ নতুন-রীতিতে বিধৃত হয়েছে। 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসের সঙ্গে 'সংকট' উপন্যাসের পার্থক্য অনেক। যদিও সতীনাথ ভাদুড়ী উভয় উপন্যাসেই মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দিকেই অধিক মনোযোগ দিয়েছেন,তবুও 'অচিন রাগিণী'তে একটি পরিপূর্ণ পারিবারিক কাহিনী আছে, যে কাহিনীবস্তু পারম্পর্যহীন চিন্তা-সূত্র থেকে সহজেই বার করে নেওয়া যেতে পারে। অপরপক্ষে 'সংকট' উপন্যাসে লেখক একটু জটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই কারণে 'সংকট' উপন্যাসে তাত্ত্বিক আলোচনা জীবনরস নিঃসরণে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করছে। 'অচিন রাগিণী'উপন্যাসে চরিত্রগুলো যেমন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, 'সংকট' উপন্যাসে তেমনটি পাওয়া যায় না। শিল্পরীতির সাদৃশ্য থাকলেও অন্যান্য বিষয়ে উভয় উপন্যাসের মধ্যে মিল অপেক্ষা অমিল-ই বেশী। সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষত্বই এখানে; তিনি প্রতিটি রচনাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তুলতে পেরেছেন। একটি গ্রন্থ অপর একটি গ্রন্থের পরিপূরক-রূপে কাজ করেনি। সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রত্যেকটি গ্রন্থের বিষয় ভাবনার মধ্যে এতটা পার্থক্য যে তা অন্য লেখকের মধ্যে সহজলভ্য নয়। তিনি একটি উপন্যাসের খুঁটিনাটি বিষয়ে এতটা ভাবিত থাকতেন যে উপন্যাসের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কখনই ব্যস্ত হতেন না। অথচ তাঁর রচনার মধ্যে সাবলীলতা এবং চরিত্রচিত্রণের অনায়াস ভঙ্গী দেখে মনে হতে পারে যে তিনি সহজেই তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করতে পারতেন। জটিল মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে একটি পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকে জীবন্ত করে

অঙ্কন করার ক্ষমতা সতীনাথ ভাতুড়ীর উপন্যাস রচনার প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। 'সংকট' উপন্যাসে যদিও লেখক জনৈক রাজনীতিবিদের দার্শনিক জীবনানুভূতির পরিচয় দিতে চেয়েছেন; কিন্তু রাজনীতিবিদ্ এবং দার্শনিক বিশ্বাসজীর রাজনীতির কর্মময় জগৎ থেকে হঠাৎ অবসর নেওয়ার পর জীবনের সত্যানুসন্ধান করতে গিয়ে যে জীবন সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করলেন তা যে কোন বাস্তববাদী জীবনমুখী লেখকেরও কাহিনীর বিষয়বস্তু হতে পারতো। আসলে 'সংকট' উপন্যাসে বাইরের খোলসটা যত কঠিনই থাকুক না কেন, এর ভিতরে কয়েকটি মানুষের জীবনের একটি করুণ ধারা প্রবহমান থেকেছে। পারিবারিক জীবনের নিখুঁত ছবি এবং সেই সঙ্গে পরিবারস্থ সকল মানুষের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব লেখক অতি অনায়াস ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন সন্তান, মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য মানুষের কাছে কতটা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে তারই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ সতীনাথ ভাতুড়ী 'সংকট' উপন্যাসের একটি অধ্যায়ে করেছেন। বিশ্বাসজী, মণি পটলা এবং হাবুদের সংসারের কেউ নন। মণির মার মৃত্যুকালে তিনি মণির স্ত্রী রেণুকে শ্বশুর বাড়ীতে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরই অনুভূতির মাধ্যমে লেখক একটি পরিবারের মানুষজনদের অন্তরলোকের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ, দুঃখ, মান-অভিমানের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। মণিরা তিন ভাই, এর মধ্যে তাদের দাদা হাবু জন্মাবধি জড়বুদ্ধি সম্পন্ন। মণির বাবা তাঁর প্রথম সন্তানের অতি শান্ত প্রকৃতি লক্ষ্য করে শিশুকালে হাবা গোবা বলে আদর করতেন, তখনও তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে তাদের সন্তান সত্য সত্যই হাবাগোবা হতে চলেছে। হাবুর থেকে চার বছরের ছোট মণি যেদিন কথা বলতে আরম্ভ করলো সেদিন তাঁরা বুঝতে পারলেন আদর করে হাবা গোবা ডাকটি নির্মম সত্য হয়ে তাঁদের জীবনে ফিরে এসেছে, এরপরও মণির আরও একটি ভাই হয়েছে। তবু পাড়া প্রতিবেশীর কাছে মণির মার পরিচয়, মণি বা পটলার মা হয়নি কেবল হাবুর মা বলেই হয়েছে। হাবু হওয়ার পর থেকে তিনি কেবল নামটির সঙ্গেই বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন তাই নয়, সংসারের সঙ্গেও আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছিলেন, অসহায় সন্তানের সর্বক্ষণের দায়িত্ব তাকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল। যতদিন তাঁর স্বামী বেঁচেছিলেন তিনিও কখনও শহর ছেড়ে বাইরে যাননি স্ত্রীর কর্তব্যের কথা মনে করেই। "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ নিয়ে একটাও কথা হয়নি কোনদিন। হাবুকে ঘিরে একটা অব্যক্ত সহানুভূতি গড়ে উঠেছিল উভয়ের প্রতি

উভয়ের। একটু যেন দোষী দোষী ভাব দুজনেরই কারও দোষ নাই, তবুও।”১৩ ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিবিড়তর হয়েছে। অসহায় দম্পতির মনস্তত্ত্ব লেখক মাত্র কয়েকটি কথায় বিশ্লেষণ করেছেন। হাবুর বাবা দীর্ঘজীবী হননি, শিশু সন্তানদের মানুষ করার সকল দায়িত্ব স্ত্রীর কাঁধে দিয়ে তিনি পরলোকগমন করেন। এরপর চরম দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে হাবুর মা তাদের বড় করে তুলেছেন। প্রতিবেশীরা নানা ভাবে তাঁকে সাহায্য করেছে। “সকলেই তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। পাড়ায় যার বাড়ীতে যখন দরকার পড়েছে হাবুর মা গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সেখানে না ডাকতেই। পূজা পার্বণে, আঁতুড়ে, ভোজের কাজে হাবুর মাকে না হলে চলত না। কাজে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। নিখুঁত ভাবে কাজ করতেন তিনি, নীরবে—ঠিক যেখানে যেটি যেমন হলে ভাল হয় তেমনি করে অথচ এর মধ্যেও সব সময় নিজেকে একটু আড়ালে রেখে রেখে।” হাবুর জন্য তাঁর এই আড়ালটুকুর প্রয়োজন ছিল, কেননা হাবু আর দশজনের মত নয়। হাবুর জন্য উৎকণ্ঠা তাঁকে সব সময় ত্রস্ত রাখতো।

তাঁর মেজ ছেলে মণি বড় হয়ে আদালতের চাকরি পেয়েছে আর ছোট পটলাও মিউনিসিপ্যালিটি অপিসে কাজ করছে। সংসারে অর্থ কষ্ট লাঘব হলেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি কেবল হাবুর কথা চিন্তা করে। তাঁর অবর্তমানে হাবুকে দেখাশোনা করবে কে? সে যে দু-বছরের শিশুর মত অসহায়। তার সব কাজই অপরকে করিয়ে দিতে হয়। হাবুর শারীরিক বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি অপরিণত, সে গায়ে কাপড়ও রাখতে চায় না। দাদার জন্য মণি এবং পটলাও সব সময় সসঙ্কোচে থাকে।

হাবুকে কেন্দ্র করেই তাদের পরিবারের বন্ধনটি দৃঢ়তর হয়, মাকে ঘিরেই মণি এবং পটলার জীবন। তাদের দাদার অস্বাভাবিক প্রকৃতির জন্য যার কষ্ট তারা অনুভব করে এবং এই কারণেই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড়তর হয়। তবু তাদের মাকে তারা নিশ্চিন্ত করতে পারে না। এই সংসারে রেণু মণির স্ত্রী হয়ে আসে। বিশ্বাসজীর সঙ্গে এই পরিবারের পরিচয় বলতে রেণুর সূত্রে। তিনি রেণুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। মণির বৌ রেণু তার ভাসুর হাবা 'হাবুকে' সহ্য করতে পারেনি। মণি তার স্ত্রীর চোখে মুখে ভয়ের ছাপ লক্ষ্য করেছে। যদিও রেণু এই ব্যাপারে কিছু বলেনি তবু মণি যখন সদর থেকে মহকুমায় বদলি হয়ে যাওয়ার নির্দেশ পেল তখন, কোন আপত্তি করেনি,

সামান্য চেষ্টা করলে হয়তো বদ্‌লির আদেশটা রদ করা যেত, কিন্তু স্ত্রীর কথা চিন্তা করেই সে চেষ্টা করেনি। এই অপরাধবোধে মণি পীড়িত। মা, ভাই এবং অসহায় দাদাকে ছেড়ে সে অন্য জায়গায় সংসার পেতেছে, তাদের নিশ্চিদ্র পারিবারিক জীবনে সেই প্রথম আঘাত হেনেছে। এই কারণে সে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত।

"একজন বদ্‌লি হয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। কত তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু মন যে বিশাল জগৎ। সেখানকার ফাটলগুলো যে বাইরের জগতের ফাটলগুলোর চেয়ে আরও কাছের জিনিস।"[১৭]

ঘটনাটি যত তুচ্ছই হোক না কেন, মণির পরিবারের পক্ষে তুচ্ছ নয়। কেননা তাদের পরিবারে হাবুর স্থান সবার উপরে। তাদের মার কাছে হাবুর পরিচয় 'সেটা'। "সেট'র স্থানই এ পরিবারে সবচেয়ে উঁচুতে; এক মুহূর্তের জন্য 'সেটার'কথা ভুললে চলে না। ছেলেরা জানে মায়ের টান দাদারই উপর সবচেয়ে বেশী। এইটাকেই তারা স্বাভাবিক বলে জেনেছে এ যে হতে বাধ্য। এরজন্য কোনদিন হিংসা করেনি দাদাকে ওকে হিংসা করা যায়? তারা জানে যে পাড়ার লোকে যত ভাল ব্যবহারই করুক তবু পর একদিকে, আপন অন্যদিকে; দয়ামায়াহীন বাইরের লোকেরা একদিকে আর দাদাকে কেন্দ্র করে তারা তিনজন অন্যদিকে।"[১৮] এই তিনজন থেকে মণি নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিল। কিন্তু এর জন্য হাবুর মা রেণুকে দোষারোপ করেননি। আর দশজন শাশুড়ীর মত বলেন নি, "পরের বাড়ীর মেয়ে এসে ছেলেকে পর করে নিল।"[১৯]

মণি তার মার দুঃসহ অভিমানের কথা অনুভব করেছিল। শিশুকালেই তার পিতার মৃত্যুর জন্য সে একমাত্র মাকেই কাছে পেয়েছে। মাকে ফেলে রেখে অন্যত্র একলা সংসার করার মধ্যে যে নিজের ইচ্ছাও কিছুটা সুপ্ত আকারে ছিল, এই অপরাধবোধ তাকে সব সময়ই কাঁটার মত খোঁচা দিয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ী মণির এই অন্তর্দ্বন্দ্বটি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। মণির স্ত্রী রেণু ভাসুরের অস্বাভাবিক প্রকৃতি দেখে ভয় পায়। মণি তার স্ত্রীর ভয় বিহ্বল চাউনি লক্ষ্য করেছে। এই কারণে মধুগঞ্জে বদলি হওয়ার সময় নিজে কোন আপত্তি করেনি। একদিকে পরিবারের স্বার্থ অপরদিকে স্ত্রীর শান্তি—এর মধ্যে কোনটা কাম্য—নিজে নিশ্চিত হতে পারেনি। আর নিভৃত মনের একান্তে কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছা ছিল কিনা এ প্রশ্নও তার মনে এসেছে। বৈচিত্র্যহীন

সাধারণ বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যেও যে তীব্র নাটকীয় উপাদান সংগ্রহ করা যায় তার প্রমাণ 'সংকট' উপন্যাসটির মধ্যে পাওয়া যায়। সতীনাথ ভাদুড়ী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে জীবনের উপরের স্তরে বিচরণ করেননি, একেবারে মর্মমূলে প্রবেশ করেছিলেন। মণির মার মৃত্যুকালীন একটি মুহূর্তকে কেন্দ্র করে তিনি একটি পরিবারের মানুষদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিপূর্ণরূপে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন।

মণির মার মৃত্যুর সময় উপস্থিত, কিন্তু তিনি তাঁর অসহায় সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নতুন করে বাঁচতে চান। এই সময়কার মানসিক অবস্থার ছবিটি লেখক অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন "ডাক্তারবাবু কেন আর ইনজেকসন দিতে আসছেন না, সে কথা আমি বুঝছি না ভাবছিস? কবিরাজমশাই নাড়ি দেখে যা বলে গেলেন তা তোরা আমার কাছে লুকোলি, সে কথা কি আর আমি বুঝিনি? কিন্তু আমার যে মরলে চলবে না। কতটুকু কী পেয়েছি জীবনে তবু যে আমাকে বাঁচতেই হবে।"[২০]

মণি-পটলা জানে তাদের মার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র কেন? তাদের মার মৃত্যুর পর তাদের দাদার দেখাশোনার ভার কে নেবে, এই চিন্তাই তাদের মাকে অস্থির করে তুলেছে। একমাত্র মণির স্ত্রী রেণুই পারে তাদের হতভাগ্য দাদার মায়ের স্থানটি নিতে। কিন্তু মার মৃত্যুকালে মণির স্ত্রী কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে? হাবুকে দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠবে নাতো, এই চরম সংকট মুহূর্তে রেণুর ভূমিকা কি হবে তারই জন্য দুই ভাই-ই উদ্বিগ্ন। তাদের মা নিশ্চিন্ত হয়ে যাক এটাই তাদের কাম্য। সতীনাথ ভাদুড়ী একটি তীব্র নাটকীয় মুহূর্ত তৈরী করেছেন। মণির মার মৃত্যু সময় যখন তার স্ত্রী রেণু শাশুড়ীর শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট এমন সময় হাবুর আবির্ভাব, কিন্তু এবারে রেণু পূর্বের মত আর ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠে না, চোখে মুখে আতঙ্ক আর ঘৃণার ছাপও ফুটে উঠে না—পরিবর্তে সেখানে শান্ত দ্যুতি আর উদার ক্ষমাশীলতায় রেণুর মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠে। লেখক এইটিকেই একটি সংকট-মুহূর্ত বলতে চেয়েছেন, যা মানুষের জীবনে চক্রবৎ আসা যাওয়া করে। রেণু সেই সংকট-মুহূর্ত উত্তীর্ণ হতে পারলেও অন্য আর একটি সংকট কাটিয়ে উঠতে পারলো না, শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তার মনে আবার পূর্বের ভয় ফিরে এসেছিল, সেই আতঙ্ক থেকেই তার গর্ভস্থ সন্তানটি মারা যায়। তার স্বামীর সঙ্গেও সম্পর্কের কিছুটা ফাটল ধরে।

পূর্বেই আলোচনা করে আমরা দেখেছি যে 'সংকট' উপন্যাসটি প্রচলিত কাহিনী নির্ভর রচনা নয়। লেখক মানুষের সমগ্র জীবনকালের কয়েকটি সংকটময় নির্বাচিত অংশের ব্যাখ্যার সাহায্যে মানুষের তাৎক্ষণিক মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ জীবনসত্যসন্ধানী বিশ্বাসজীর মাধ্যমে করতে চেয়েছেন এবং সেসব ক্ষেত্রে তিনি সার্থক হয়েছেন। বিশ্বাসজী তাঁর জেলজীবনের বন্ধু বিশ্বনাথ ত্রিবেদীর ঠিকানায় কাশীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশ্বনাথ ত্রিবেদীরই তিনি মন্ত্রশিষ্য। তাঁরই কাছে পাঠ নিয়ে তিনি বস্তুবাদী দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছেন। প্রতিটি বিষয়কে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে কিছু গ্রহণ করার শিক্ষা তিনি তাঁর কাছেই পেয়েছিলেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিত কোন বিশেষ মুহূর্তে মানুষ যে কখন তার যুক্তিনিষ্ঠ মন থেকে সরে আসে এ অভিজ্ঞতা বিশ্বাসজী কাশীতে বিশ্বনাথ ত্রিবেদীর কাছেই প্রত্যক্ষ করলেন। ট্যাক্সিচালক সমিতির সভাপতি বিশ্বনাথ ত্রিবেদী ট্যাক্সিচালক ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় ভাষণ দিয়ে ফেরবার পথে সেই রকম একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যেখানে তিনি তার যুক্তিবাদী মননকে মুহূর্তের জন্য নির্বাসিত করতে দ্বিধান্বিত হননি। কাশীর সর্বজন শ্রদ্ধেয়, পণ্ডিত হরিহর শাস্ত্রী মহাশয়কে জনৈক ট্যাক্সিচালক চাপা দিলে বিশ্বনাথ ত্রিবেদী উত্তেজিত জনতার হাত থেকে ট্যাক্সিচালককে উদ্ধার করতে যান ; কেন না, এক্ষেত্রে ট্যাক্সিচালকের কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে ট্যাক্সিচালককেই কটু কথা বলতে আরম্ভ করেন ; বিশ্বাসজী এর কোন সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পান না, মানুষের চরিত্রের খুঁটিনাটি বৈপরীত্যগুলো ব্যাখ্যার সন্ধানে তিনি বারে বারেই সংসারাঙ্গণে ফিরে আসেন।

বিহারের লৌকিক-জীবন, ভদ্রেতর শ্রেণীর লোকায়ত সংস্কার এবং তাদের আচার-আচরণ সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসের মধ্যে বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের নিপুণ ভাষা তাঁর উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব। 'সংকট' উপন্যাসে কেবল কাহিনীর অবয়বের মধ্যেই যে জটিলতা আছে তাই নয় লেখকের জীবনোপলব্ধির মধ্যেও নানা তত্ত্ব আভাসিত হয়েছে। কিন্তু লেখক তাঁর বিমূর্ত ভাব প্রকাশের মাধ্যম-স্বরূপ যে চরিত্রদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তারা স্থানীয় সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠছে, লেখকের চিন্তা বা ভাবনার ভারবাহী যন্ত্রে পরিণত হয়নি। সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা এই যে তিনি

লেখকদের লেখক ছিলেন অর্থাৎ তাঁর মনন এবং সূক্ষ্ম চিন্তার প্রাবল্য সাধারণ পাঠকের মধ্যে দুর্বোধ্যতার প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। উপন্যাস রচনার প্রয়োগ কৌশলের অভিনবত্বের জন্য তাঁর উপন্যাসে স্বাভাবিক ভাবে কাহিনীরস জমে উঠেনা একথা সত্য হলেও, উল্লিখিত চরিত্র এবং ঘটনাগুলোকে এতটা বাস্তবতার সঙ্গে প্রকাশ করেন যে তা চলচ্চিত্রের মত আমাদের কাছে সচল হয়ে উঠে। 'সংকট' উপন্যাসের একটি উপাখ্যানে বিহারের নিম্ন সমাজের সন্ন্যাসীদের এবং সেই শ্রেণীর লৌকিক বিশ্বাস এবং সংস্কারের ছবি পাই। মুনিয়ার মা রেণুদের বাড়ীর ঠিক দাই না হলেও দাই এর মত। এই সূত্রে মুনিয়া, অঘোরীবাবা এবং রঘুয়ার কাহিনী। মুনিয়ার মা রেণুদের বাড়ীতে থাকে না; তার নিজের বাড়ী আছে। নানা সন্দেহজনক লোকের আনা-গোনা তার বাড়ীতে হয়। এদের মধ্যে সতীথানের অঘোরীবাবা। নামে সন্ন্যাসী, আসলে ভণ্ড দুশ্চরিত্র লোক। এদের সঙ্গে মুনিয়ার মার মেলামেশা।

"প্রতি শনিবারের রাত্রিতে অঘোরীবাবা আসে। মদ খায় গাঁজা টানে; পূজো করে, মন্ত্র পড়ে বিড় বিড় করে। নতুন মালসায় মন্ত্রপূত চাল, কলা সিঁদুর, আরও কী কী যেন সাজিয়ে দেয়। মুনিয়ার মা নিশুতি রাতে সেই মালসাটা চৌমাথার মোড়ে রেখে দিয়ে আসে নিজের রোগ যাতে অসতর্ক পথচারীর উপর চলে যায়, সেই উদ্দেশ্যে।"[২১] মুনিয়ার এসব ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে তার মার উপর বিরক্ত হয়ে উঠে। মা মেয়েতে এই নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হয়। মুনিয়ার মা মুনিয়াকে আঁটকুড়ী বলে গাল দেয়, স্বামীর ঘরে মেয়ের মনটেঁকে না বলে নানা কটূক্তি করে।

মা এবং মেয়ের বাক্‌যুদ্ধ বেশীদূর এগোয় না—এমন সময় বাড়ীতে ডাক-পিয়নের আবির্ভাব ঘটে। এ পাড়ায় ডাক পিয়ন আসে কালেভদ্রে। তাদের চিঠি দেওয়ার মত লোক কোথায়? তাই মা মেয়ে দুজনেই একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সতীনাথ ভাদুড়ী বিহারের গ্রাম্য জীবনধারা খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন; সামান্য ডাকপিয়নের আচরণটিও তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টিপথের বাইরে থাকে নি।

মুনিয়া এবং মুনিয়ার মা দুজনেই অক্ষর-জ্ঞান-শূন্যা, তাই বাড়ীর উঠোনের কলন্ত লাউ মাচা থেকে একটা লাউ-এর বিনিময়ে ডাকপিয়নকে দিয়েই চিঠিটা পড়িয়ে নেয়। অযোধ্যা থেকে মুনিয়ার স্বামী জানাচ্ছে মাস তিনেক আগে

সে আবার বিয়ে করেছে। সেমাপুরের সন্ত মিহিদাস সন্তানার্থে আবার বিয়ে করতে বলেন, তবে মুনিয়াকে গ্রহণ করতে তার কোন আপত্তি নেই।

জামাই আবার বিয়ে করতে পারে, এ ধারণা মুনিয়ার মার ছিল, এখবরটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়; কিন্তু মুনিয়ার মনে অন্য চিন্তা। সে বিয়ের পর সন্তানার্থে তার স্বামীকে নিয়ে এ অঞ্চলের সব থেকে জাগ্রত, নদীর ধারের সতীথানের বটগাছে ইট বেঁধে এসেছে। সতীথানে ইট বেঁধে ফল কি হল? এখানকার বিশ্বাস অনুযায়ী বন্ধ্যানারীরা সন্তান কামনা করে ইট বাঁধলে তাদের বন্ধ্যাত্ব মোচন হবে।

স্বামীর চিঠিখানাই তাকে সতীথানের ইট বাঁধার কথা মনে করিয়ে দিল, নইলে প্রাথমিক ভয়ভক্তির পর সতীথানের ইট বাঁধার কথা মুনিয়া ভুলেই গিয়েছিল। শ্বশুর বাড়ী থেকে পালিয়ে আসা তার উচিৎ কাজ হয় নি, এখন এজন্য তার অনুশোচনা হচ্ছে। সতীথানের বটগাছ থেকে ইটটা তাকে খুলে ফেলতেই হবে। এই সতীথানেই অঘোরীবাবা ঘর তৈরী করে থাকে। সতী মায়ের আশীর্বাদনিষিক্ত ইটগুলি দিয়ে ঘরটা তৈরী। সন্তান লাভের পর বাঁধা ইটগুলো তাদের খুলে ফেলতে হয়, এটাই রীতি। সতীথানের মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য অঘোরীবাবাই মাঝে মাঝে এই কাজটি করে থাকেন, নতুবা বাঁধা ইটে গাছটা ভরে উঠবে। মুনিয়া দেখে তার ইটটাও অঘোরী-বাবা খুলে ফেলেছেন। সমস্ত ভণ্ডামিটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ধর্ম-প্রাণ, অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিম্নসমাজের লৌকিক আচার-আচারণ-গুলি সতীনাথ ভাদুড়ী গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সরল প্রাণ মানুষের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর লোক ভণ্ড সাধু সেজে সমাজের ক্ষতি সাধন করে আসছে, অঘোরীবাবা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অঘোরী-বাবাকে দেখলে মুনিয়া ভয় করতো, আবার অঘোরীবাবার আকর্ষণও অস্বীকার করতে পারত না। মুনিয়ার অবৈধ প্রণয়ের সন্তান রঘুয়া, রঘুয়ার পিতৃ পরিচয় না থাকলেও মুনিয়ার মার বাড়ীতে যারা আসা যাওয়া করতো তাদের মধ্যে একজন দ্বারভাঙ্গা জিলার রামধনিয়া রঘুয়াকে পালিত পুত্র করে নেয়। রঘুয়াকে রেণু এবং রেণুর মা খুব স্নেহ করতেন, রঘুয়া রেণুকে মা বলে সম্বোধন করতো। ওভারসীয়ার বিশ্বাসজীর এটা সেটা কাজ করে দেবার সূত্রে বিশ্বাসজীও রঘুয়াকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। মুনিয়া স্বামীর কাছে ঘর করতে চলে গেলে মুনিয়ার মা ঘরবাড়ী বাগান রামধনিয়াকে

দিয়ে দিয়েছিল, মুনিয়া এখন স্বামীর ঘরে সতীনসহ সংসারের সচ্ছলকর্ত্রী।

'সংকট' উপন্যাসের কাহিনী মূলতঃ বিশ্বাসজীর মনে ভেসে উঠা বিচ্ছিন্ন স্মৃতি এবং মানুষের জীবনের বিশেষ কোন সংকট মুহূর্তের নানা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে রচিত। তার ফলে, সর্বত্র কাহিনীর পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি, এবং মনে হতে পারে যে উপন্যাসটি কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং পরস্পর সম্পর্ক-রহিত মানুষের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে—কোন যোগসূত্র নেই। এই কারণে লেখক কাহিনীর ঐক্য রক্ষার জন্য একটি প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সেটি একটি ধুনুচি। এই ধুনিচি বিভিন্ন সূত্রে যখন বিভিন্ন মানুষের কাছে গেছে তখনই তাদের জীবনে চরম সংকট-মুহূর্তটি উপস্থিত হয়েছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত রীতিতে কাহিনীটি রচিত হওয়ার জন্য সাধারণ পাঠকের কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য মনে হলেও, দুর্বোধ্যতার অন্তরালে একটি কঠিন জীবন-সংগ্রামের ছবিই চিত্রিত হয়েছে। শিল্পী হিসাবে সতীনাথ ভাদুড়ী কেবল বাস্তবমুখীই ছিলেন না, তিনি একজন সচেতন মনস্তত্ত্ববিদ্‌ও ছিলেন। মানব মনের অপার দুর্জ্ঞেয়তার এমন নিপুণ উন্মোচন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। রঘুয়ার সঙ্গে তার মার কোন সম্পর্ক ছিল না। অভিভাবকহীন হওয়ার জন্য সে অল্প বয়সেই নানা রকমের নেশা করতে শিখেছে। রামধনিয়ার ভালো না লাগলেও রঘুয়া অল্পবয়স থেকেই সন্ন্যাসীদের অনুকরণ করতো, সে পল্টন বাবাজীর অনুরাগী চেলাদের মত তিলক কাটতে আর চুল রাখতে শুরু করেছিল। রঘুয়ার বাল্যকাল থেকেই সন্ন্যাসীদের অনুকরণ করাতে রামধনীর অঘোরী-বাবার কথা মনে পড়ে যেত, হাজার হলেও রঘুয়া তার পালিত পুত্র। পর কি কখনও আপন হয়, তবু রামধনিয়ার ইচ্ছে ছিল রঘুয়ার বিয়ে দিয়ে তাকে ঘরে আটকে রাখবে কিন্তু এই ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই রামধনী মারা গেল। শিশু-কালেই রঘুয়াকে রামধনিয়ার কাছে রেখে মুনিয়া স্বামীর ঘর করতে চলে যায়। বড় হয়ে রঘুয়া সবই জানতে পারে। মার সঙ্গে তার কোন পরিচয় হয় না। রামধনিয়া মারা যেতে, রামধনিয়ার আত্মীয়েরা রঘুয়াকে সম্পত্তির অধিকার দিতে চায় না, কেন না রঘুয়া যে রামধনিয়ার পালিত পুত্র এর কোন প্রমাণ নেই। বিশ্বাসজী এই অঞ্চলের একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। রঘু রেণুর মার চিঠি নিয়ে বিশ্বাসজীর কাছে আসে এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার জন্য। বিশ্বাসজী রঘুয়ার কাছ থেকেই তার সন্ন্যাস-জীবনের কথা জানতে পারেন। রঘু তার মা মুনিয়াকে ভয় দেখিয়ে কিছু টাকা পয়সা আদায় করার জন্য

তাদের বাড়ী সন্ন্যাসী সেজে যায়। শিশুকাল থেকে মাকে না দেখার জন্য রঘুয়া তার মা এবং তার মার সতীনকে পৃথক করতে পারে না। শিশুকাল থেকেই ভণ্ডসাধুদের সঙ্গে থাকার জন্য অল্প বয়সেই রঘুয়া সন্ন্যাসীদের আদব কায়দা সহজেই আয়ত্ত করে নেয়। অল্প বয়সী সন্ন্যাসী দেখে অনেকেই আকৃষ্ট হয়। রঘুর মা মুনিয়াও তার আত্মজকে চিনতে পারে না। আর দশজনের মত সেও রঘুর কাছে আসে। তার অভীষ্ট লাভের আশায়, নিভৃতে সন্ন্যাসীরূপী সন্তানের কাছে দেখা করে, কথার মারপ্যাচে রঘুয়া তার মাকে চিনতে পারে। রঘুয়া যখন তার মার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটন করার ভয় দেখিয়ে কিছু টাকা পয়সার হাতাবার মতলব করে, সে সময় তার মা মুনিয়াই তার অবৈধ সন্তান রঘুয়ার মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা জানায় এবং তার জন্য সে অনেক কিছু ত্যাগ করতেও প্রস্তুত একথাও জানায়। এরপর আর রঘুয়া সে স্থানে এক দণ্ডও থাকে না, সেই রাত্রেই পালিয়ে স্বগ্রামে ফিরে আসে। মা এবং পুত্রের মিলনের এক সংকটময় মুহূর্তটি বিশ্বাসজীর মনকেও আন্দোলিত করে। রেণুর শাশুড়ীর মৃত্যুকালে পুত্রবধূ এবং শাশুড়ীর মিলন মুহূর্ত যেমন একটি পরিবারে বিশ্বাসের সূচনা করেছিল, মুনিয়া এবং রঘুয়ার মিলন মুহূর্ত তেমনি সন্তানের মার প্রতি আজীবন লালিত বিতৃষ্ণাকে এক নতুন বিশ্বাসের জগতে নিয়ে গিয়েছিল।

আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশ মনে হলেও 'সংকট' উপন্যাসে বিশ্বাসজীর উপস্থিতি প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া লেখক কাহিনীর যোগসূত্ররূপে একটি ধুনুচির উল্লেখ করেছেন। অঘোরীবাবা মুনিয়াকে মন্ত্রপূত ধুনুচিটা দিয়েছিল, এর ফলে মুনিয়া ইচ্ছা মত শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে আসতে পারবে, রেণুর বিয়ের সময় মুনিয়া একই উদ্দেশ্যে ধুনুচিটা রেণুকে দিয়েছিল। সমগ্র উপন্যাসটিতে রেণু এবং মুনিয়ার চরিত্র দুটি স্বাভাবিকতা রক্ষা করে পরিণতির দিকে এগিয়েছে। রেণু বাঙ্গালী ভদ্র ঘরের সন্তান, সেখানকার রীতিনীতি অনুযায়ী মুনিয়াদের সম্প্রদায়ের মত সতীথানেও যেতে পারে না, কিন্তু স্বামীর কল্যাণের জন্য সবরকমের সংস্কারই বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মতই মান অভিমান এবং সংস্কার নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে চায়। স্বামীর কল্যাণার্থে এক সন্ন্যাসীর পরামর্শে সে তার সমস্ত গহনা সন্ন্যাসীকে দিয়ে দেয়। রেণুর স্বামী মণির মনে ধীরে ধীরে গহনা চুরির ব্যাপারে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ জন্ম নেয়, রেণুও সন্ন্যাসীর পরামর্শ

অনুযায়ী কাউকেই কোন কথা বলে না, পরিণাম স্বরূপ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ হয়ে যায়। রেণু স্বামীর সংসার ছেড়ে বাবা মার কাছে চলে আসে। এর মধ্যে রেণুর বাবা মারা যান।

'সংকট' উপন্যাসে রেণু এবং মণি পর্বটি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ উপন্যাস হতে পারতো। কিন্তু 'সংকট' সাধারণ কাহিনী নির্ভর উপন্যাস নয়। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর রচিত সবকটি উপন্যাসের মধ্যেই মানুষের মনের অতলান্ত গহ্বরে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'সংকট' উপন্যাসে বিশ্বাসজীর মাধ্যমে তিনি এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। বিশ্বাসজীর চরিত্রে লেখকেরই মানসিক প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করা যায়। রঘুয়া রেণুদের বাড়ী থেকেই ধুনুচিটা সংগ্রহ করে এবং সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করার সময় সেটি তার নিজের সঙ্গে রাখে; কিন্তু তার মাকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই যখন ঠকে ফিরে আসে তখন ধুনুচিটা মুনিয়াদের বাড়ীতে ফেলে আসে, জনসেবক বিশ্বাসজী রঘুয়ার সম্পত্তি উদ্ধার কাজে এলে তাকে মুনিয়াদের বাড়ীতে যেতে হয়, মুনিয়াই বিশ্বাসজীকে রঘুয়ার ফেলে যাওয়া ধুনুচিটা ফিরিয়ে দেয়। মুনিয়ার কাছ থেকে মুনিয়ার মার সংবাদ সংগ্রহ করে তার কাছে গেলে আর একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়। মুনিয়ার মা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে দেশ ছেড়ে নতুন জায়গা লবটুলিয়ায় বাসা করেছে, সেখানে মঘাইয়া ডোমদের সরকারের পক্ষ থেকে নতুন করে বাসস্থান করে দেওয়া হচ্ছে। মঘাইয়া ডোমরা প্রকৃতিতে যাযাবর শ্রেণীর। একস্থানে বাসা বেঁধে থাকে না। লোকের বাড়ীতে রাত্রে সিঁদকাটাই তাদের পেশা। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের দুটি পর্বে বিহারের অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছিলেন। আঞ্চলিকতা তাঁর রচনার একটি প্রধান বিশেষত্ব, 'সংকট' উপন্যাসেও মঘাইয়া ডোমদের সকল বৈশিষ্ট্যগুলি নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এর ফলে কাহিনীর গতি কিছুটা ব্যাহত হলেও প্রায় অপরিচিত একটি সম্প্রদায়ের লৌকিক আচার ব্যবহার প্রভৃতি এমন নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন যার মধ্যে একদিকে যেমন তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়; অপরদিকে তেমনি নীচু তলার মানুষের প্রতি তাঁর সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মঘাইয়া ডোমদের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক লিখেছেন।

"বাঁধা ঘরে থাকা, জমিতে লাঙল দেওয়া সব যে তাদের বারণ। বাপ-

ঠাকুরদার মুখে শুনে এসেচে যে তারা আগে ছিল রাজা। একদিন রাজ্যপাটে লাথি মেরে, তাদের পূর্ব পুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্র বেছে নিয়েছিলেন পথ চলার জীবন।"[২২]

এদেরই একজন গুজরাতীর মা। গুজরাতীর মা এবং অঘোরীবাবাকে নিয়ে নতুন আর একটি উপাখ্যান। বেদে জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ী বসবাস করা গুজরাতীর মার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই সে অঘোরীর সঙ্গে চলে যেতে চেয়েছিল। মঘাইয়া ডোমদের হিংস্র প্রকৃতির কথা অঘোরী-বাবার অজানা নয়। কোন ভাবেই সে গুজরাতীর মাকে নিয়ে যেতে পারে না। গুজরাতীর মা তার বহুকাল আগের খুলে ফেলা বেদেনীর পোষাক ঘাঘরাটি পরে এসেছে।

গুজরাতীর মা সকাতরে অঘোরীবাবার কাছে তার দুঃখের কথা জানায়: "এক ইঁদারার জল আমি আর রোজ রোজ খেতে পারছি না। একই অশথ গাছের উপর দিয়ে রোজ সূর্য উঠতে আর আমি দেখতে পারি না। নতুন জায়গায় প্রত্যহ শোবার আগে অবাক হতে চাই, প্রত্যহ ঘুম ভেঙ্গে অবাক হতে চাই। মাটির হাড়ি দেখলে আমার গায়ে জলুনি ধরে। এক এক উনুন রোজ ধরাতে আমার কান্না পায়।"[২৩] স্বামী সন্তানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েও অঘোরীবাবা গুজরাতীর মাকে ঘরে পাঠাতে পারে না। শেষে অঘোরী একরকম পালিয়ে যায়। যাবার আগে গুজরাতীর মা ধুনুচিটা অঘোরীকে দিয়ে দেয়। "আর এক সাধু বাবার দেওয়া। ওটা কাছে থাকলে পথ চলার সময় মঙ্গল হয়, বাঁধা ঘরে মন টেঁকে না।"

'সংকট' উপন্যাসে কাহিনীর যোগসূত্র হিসাবে বার বার ধুনুচির কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, এক সংকট মুহূর্ত থেকে আর এক সংকট মুহূর্তে পিতলের ধুনুচিটা প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথা প্রকরণের অভিনবত্ব আনার জন্য কেবল লেখক এটি ব্যবহার করেননি, কাহিনীর মধ্যে এমন ভাবে গেঁথে দিয়েছেন যাতে করে এই ধুনুচিটির ভূমিকাটি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

'সংকট' উপন্যাসে কোন নিরবচ্ছিন্ন কাহিনী নেই, একথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ী বিশ্বাসজীর চরিত্রটির মনে ভেসে উঠা তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ের কয়েকটি মুহূর্তকে একত্রিত করে একটি সামগ্রিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রচলিত উপন্যাসের মত একাভিমুখী

কাহিনী না থাকলেও জীবনের বাস্তব রূপায়ণে এবং মানব মনের দুর্জ্ঞেয়তার সহজ প্রকাশে তিনি সার্থক হয়েছেন। চরিত্রগুলির বাইরের পরিচয় অপেক্ষা ভিতরের স্বরূপটিই উদ্ঘাটন করেছেন। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে প্রতিটি চরিত্র পাঠকের কাছে অভিনব মনে হয়েছে।

'সংকট' উপন্যাসের শেষ মুহূর্তটি পরিকল্পনার মধ্যে তিনি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। একটি অতি সাধারণ ঠাট্টা কোন কোন মানুষের জীবনকে কি ভাবে বিড়ম্বিত করে তুলতে পারে দাড়িওলা মহাত্মার এবং নিরাপদবাবু চরিত্র দুটির মধ্যে প্রকাশ করেছেন। দাড়িওলা মহাত্মার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, রেণুর বিবাহের সময়। কোন কণ্ট্রাক-টারের অধীনে কর্মসূত্রে তিনি রেণুদের প্রতিবেশী হন। পশুপক্ষীর প্রতি অতিরিক্ত প্রীতি তাঁকে স্থানীয় অঞ্চলে দাড়িওলা মহাত্মা নামে পরিচিত করে তোলে, কিন্তু দাড়িওলা মহাত্মা যে কণ্ট্রাকটারের অধীনে কাজ করতেন তাদের নির্মিত বাড়ীটা অচিরেই ভেঙ্গে যাওয়াতে দাড়িওলা সে চাকরী হারালেন এরপর তিনি অনেকের অধীনে কাজ করেছেন কিন্তু সব ব্যবসাই কোন না কোন কারণে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, সবই লোকসানের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে, এই থেকে দাড়িওলা 'অপয়া' বলে স্থানীয় মহলে পরিচিত হতে লাগলেন, যদিও তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সততা সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। এই ছিল দাড়িওলা মহাত্মার পরিচয়, যিনি প্রতিবেশী মহলে জনপ্রিয় থাকলেও 'অপয়া' অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি পাননি।

এই দাড়িওলা মহাত্মার সঙ্গে শোনপুরের মেলায় বিশ্বাসজীর দেখা। বিশ্বাসজী তখন দেশ দেখার নেশায় নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দাড়িওলা মহাত্মাও দেশ ছেড়ে পথে পথে ঘুরছেন। তাঁর কাছ থেকেই বিশ্বাসজী তাঁর জীবনের চরম সংকট মুহূর্তটি জানতে পারলেন। দাড়িওলা মহাত্মার মত সেই অঞ্চলের পরোপকারী বৃদ্ধ নিরাপদবাবুও আর এক ধরণের অপবাদ কুড়িয়েছেন, তিনি যে বাড়ীতেই যান সে বাড়ীর রোগীই মারা যান। স্থানীয় মহলের ধারণা নিরাপদ বাবু নিশ্চয়ই তার পুত্রের অসুখের সময় তার ঘরে প্রবেশ করবেন না। নিজের সম্পর্কে প্রচলিত এই অপবাদ তিনি মেনে নিতে পারেন না, তাই প্রতিবেশীর অসুখের সময় তাদের বাড়ীতে যেতেন, কারো মৃত্যু ঘটলে শেষকৃত্যের সময় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব দিক দেখাশোনা করতেন। তাঁর মানসিক বল অসীম। লোকের দেওয়া মিথ্যা অপবাদকে কিছুতেই মেনে

নিতে পারতেন না। নিরাপদবাবু এবং দাড়িওলা মহাত্মার নামে 'অপয়া' দুর্নামটা উল্কির দাগের মত আঁকা হয়ে থাকে, কিছুতেই সে দাগ উঠে না। দাড়িওলা শেষ পর্যন্ত একটি মুদিখানার দোকানে কাজ নেয়। দোকানের মালিক পেনসন নেবার পর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-এর টাকায় দোকানটি খুলেছেন। দাড়িওলার সব সময় ভয় এই দোকানটি যেন অন্যান্য ব্যবসাগুলির মত উঠে না যায়। এই দোকানের মালিক হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাকে দেখতে যথারীতি নিরাপদবাবু আসেন, নিরাপদবাবুর গায়ে পড়ে সামাজিকতা কেউই পছন্দ করে না, তবু তিনি সামাজিক কর্তব্য পালন করবেনই। নিরাপদবাবুকে দেখে দাড়িওলা মহাত্মাও ভয় পায়, যদি কিছু অঘটন ঘটে তাহলে তার ব্যবসাটি উঠে যাবে, সেই সঙ্গে তাঁর নামে প্রচলিত অখ্যাতিটি আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হবে। নিরাপদবাবু এবং মহাত্মা দুজনে মুখোমুখি হন। নিরাপদবাবুই দাড়িওলা মহাত্মার মানসিক অবস্থাটা অনুধাবন করতে পারেন। 'অপয়া' দুর্নাম একবার কারো নামে প্রচারিত হলে তার মনের যে কি যন্ত্রণা তা নিরাপদবাবু ভালো করেই বুঝতে পারেন। তিনি দাড়িওলা মহাত্মাকে সান্ত্বনা দিতে চান। মালিকের মৃত্যু হলে নিজের ব্যবসা খুলতে পরামর্শ দেন, এজন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের সাহায্য করতেও তিনি প্রস্তুত, কিন্তু নিজের ছেলের ব্যবসাতে তাকে নিতে চান না। এ কথা নিরাপদবাবুর মুখ থেকে শোনার পর তার আর বেঁচে থাকতে কোন ইচ্ছা হয় না। এরপর আত্মহত্যা ছাড়া আর কি পথ থাকতে পারে? কিন্তু চরম মুহূর্তে তার নিরাপদবাবুর কথা মনে পড়ে, তিনিও তার মনিবকে এবং তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে এসেছিলেন, তিনি আত্মহত্যা করলে নিরাপদবাবুর অখ্যাতিটা আরও সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা পাবে। এরপর দাড়িওলা মহাত্মার আর আত্মহত্যা করা চলে না, তিনি জীবনের বাইশ বছর যে শহরে কাটিয়ে ছিলেন, সেই শহর ছেড়ে চলে যান।

উপন্যাসের সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করে উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্রগুলোর পূর্ণতর বিকাশের উপর। সেই দিক থেকে বিচার করলে 'সংকট' একটি সার্থক এবং রসোত্তীর্ণ উপন্যাস হয়েছে। আধুনিক উপন্যাসে বাহ্য ঘটনা অপেক্ষা পাত্র-পাত্রীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকেই লেখক অধিকতর মনোযোগ দেন। 'সংকট' উপন্যাসেও লেখক আধুনিক এই রীতিটি গ্রহণ করেছেন। যদিও 'সংকট' উপন্যাসের কাহিনী বিবর্তনধর্মী নয়, পারম্পর্যহীন বিচ্ছিন্ন স্মৃতি

একজন মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তবুও লেখক বিভিন্ন অংশে যে সব আখ্যানবস্তু, নির্মাণ করেছেন সেগুলির বাস্তবানুগ এবং স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছে, কোন চরিত্রের উপরই লেখক কোন তত্ত্ব অথবা নিজস্ব কোন ভাবনা আরোপিত করেন নি।

কাহিনীতে প্রচলিত নায়ক-নায়িকা না থাকলেও রেণু 'সংকট' উপন্যাসে একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। রেণুর জীবনের সংকট মুহূর্ত দিয়েই কাহিনীর সূত্রপাত এবং রেণুর জীবনের পরিণতিতেই কাহিনীর সমাপ্তি। রেণুর বিবাহ, বিবাহোত্তর জীবনে সাময়িক অশান্তি, স্বামীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি এবং পরিশেষে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মধ্যে রেণুর উপাখ্যানটি শেষ হয়েছে। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ভাসুরকে স্বাভাবিক ভাবে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়, রেণুও শেষ পর্যন্ত তার ভাসুরকে স্বীকার করে নিতে পারে নি, এই কারণেই শাশুড়ীর সংসার থেকে আলাদা হওয়া, রেণুর স্বামী মণির এই কারণে বিবেকের দংশন—সমস্ত বিষয়গুলি লেখক অতি সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করেছেন।

মুনিয়া, অঘোরীবাবা এবং মুনিয়ার মার উপাখ্যানে মুনিয়ার চরিত্রটি রেণুর মত সমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মুনিয়া রেণুর সমবয়সী এবং বিবাহিতা। স্বামীর সঙ্গে তারও সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটেছিল। উভয়ের সমস্যা এক নয়। এক হওয়া সম্ভবও নয়। সে তার স্বামীর পান্‌সে চেহারাটি বরদাস্ত করতে পারে না। অবৈধ সন্তানের জননী হয়েও পরবর্তী কালে সে স্বামীর সঙ্গে সতীনের সংসারে সুখেই দিন কাটিয়েছে। এইজন্য তার মনে বিশেষ কোন অপরাধবোধও ছিল না ; বরং এই সত্যটি যাতে করে প্রকাশ না পায়, তার জন্য গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেছে। প্রথম সন্তানকে ত্যাগ করেও সন্ন্যাসীর কাছে সন্তানের কল্যাণের জন্য পূজো দিতে এসেছে। মুনিয়ার মানসিক গঠন এবং রেণুর মানসিক গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুনিয়ার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ লেখক তার শিক্ষা এবং পরিবেশ অনুযায়ীই করেছেন, কোথাও স্বাভাবিকতার নীতিটি লঙ্ঘন করেননি। রেণুও স্বামীর কাছে একটি সত্য গোপন রাখতে চেয়েছিল এবং তার থেকেই স্বামীর-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। মণি এবং রেণুর বিচ্ছেদের এই অংশেও লেখক তাদের মনস্তত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রত্যাশা এবং প্রত্যাখ্যান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করে। রেণুর মত মধ্যবিত্ত সংস্কার মুনিয়ার মধ্যে

ছিল না; সেটা থাকাও স্বাভাবিক নয়। সতীনাথ ভাদুড়ী এই সব সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকতেন।

অঘোরীবাবা এবং গুজরাতীর মা উপাখ্যানে সতীনাথ ভাদুড়ী যাযাবর নারীর স্থায়ী ঘর বাঁধার মধ্যে যে একটি বেদনাবোধ থাকে তারই করুণ চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। বেদে-বেদেনীদের পথ চলাতেই আনন্দ। এই পথ চলা বন্ধ হলে তাদের জীবনেও ছন্দ পতন ঘটে। গুজরাতীর মার অন্তরের এই বেদনাটাই লেখক সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অংশটি কেবল সার্থকই হয়নি কবিত্বময়ও হয়ে উঠেছে।

'সংকট' উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ী কাহিনীর প্রারম্ভে মুখবন্ধ স্বরূপ 'সেক্রেটারীর কথা' নামে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। বিশ্বাসজীর সেক্রেটারীই কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন এবং কাহিনীর সমাপ্তি এই সেক্রে-টারির কথাতেই হয়েছে। বিশ্বাসজী যখন দীর্ঘকালের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যান, তখন তার ভগ্নপ্রায় বাড়ীটি রেণুরাই কিনে নেয় এবং সেক্রেটারির মতানুসারেই বাড়ীতে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বাসজীর স্বভাবের বিভিন্ন দিক উদ্‌ঘাটনের জন্য তাঁর সেক্রেটারীর কথার প্রয়োজন ছিল, যদিও উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের বিবর্তনের জন্য এই অংশটির কোন ভূমিকা নেই। চরিত্রগুলোর বিকাশে লেখক সর্বত্রই নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, কোথাও চরিত্রগুলো লেখকের ভাবনার বাহন হয়ে পড়েনি। 'সংকট' উপন্যাসে প্রধানতঃ নারী চরিত্রগুলো প্রাধান্যলাভ করলেও দাড়িওলা মহাত্মা চরিত্রটির পরিকল্পনায় লেখক অসাধারণ মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলি তাদের জীবনের অস্থিরতা কাটিয়ে স্থৈর্য ফিরে পেয়েছিল। বিশ্বাসজী জীবনের সত্য সন্ধানে, অভ্যস্ত জীবন ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন, দাড়িওলা মহাত্মাও নিজের নামে প্রচলিত 'অপয়া' অপবাদটি শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল। তার মত অল্প শিক্ষিত মানুষের এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত মানসিক বল ছিল না। তার চরিত্রটি একটি সার্থক ট্রাজিক চরিত্র হয়েছে, আর সকলে যেখানে সংকট কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল কেবল সেই তার জীবনের অস্বাভাবিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সতীনাথ ভাদুড়ী প্রত্যেকটি উপাখ্যানে নতুন কিছুর পরীক্ষা করে গেছেন—কেবল প্রয়োগ রীতিতেই আধুনিক পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন নি, চরিত্রগুলোর মানসিক বিশ্লেষণে

মননশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। লৌকিক উপাদান সংগ্রহ করে, মনো-বিজ্ঞানীর মত বিশ্লেষণ করে নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য তাঁকে পাশ্চাত্যের বস্তু-সম্ভারের দ্বারে উপস্থিত হতে হয়নি।

'দিগ্‌ভ্রান্ত' সতীনাথ ভাদুড়ীর সর্বশেষ উপন্যাস। গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৩৭৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হবার পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় এটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সতীনাথ ভাদুড়ীর মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'দিগভ্রান্ত' ভিন্ন প্রকৃতির।

'অচিন রাগিণী' এবং 'সংকট' এই দুটি উপন্যাসে লেখক কাহিনী বর্ণনায় পারম্পর্যহীন চিন্তা এবং স্মৃতির বঙ্কিম পথটি অনুসরণ করেছিলেন, আধুনিক চেতনা প্রবাহের রীতি ও মুক্তানুষঙ্গের [free association] পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য উপন্যাসের আখ্যান বিবর্তনের ধারানুযায়ী এগিয়ে যায়নি। স্মৃতির আবর্তন অনুযায়ী কখনও এগিয়ে,কখনও পিছিয়ে চলেছে। সেই তুলনায় 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাস রচনায় তিনি প্রচলিত পথ গ্রহণ করেছেন; অর্থাৎ কাহিনী এখানে বিবর্তনের ধারানুযায়ী এগিয়ে গিয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসের মধ্যে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' [দুই খণ্ড] এবং 'দিগ্‌ভ্রান্ত' এই দুই উপন্যাসই প্রচলিত এবং জনপ্রিয় রীতি অনুযায়ী রচিত হয়েছে। এই দুটি উপন্যাসেরই কাহিনী দীর্ঘ কালব্যাপী বিস্তৃত। 'ঢোঁড়াই'এর মত'দিগ্‌ভ্রান্তে'র কাহিনীও প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বছর ব্যাপ্ত। 'দিগ্‌ভ্রান্তের' আখ্যানভাগও জটিল নয়, একটি সুখী পরিবারের বিপর্যয় এবং পুনর্মিলনের কাহিনী।

'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে সাহিত্যিক সতীনাথের দিক্‌ পরিবর্তন ঘটেছিল,সেটা লক্ষ্য করার মত। 'জাগরী'র থেকে যে সাহিত্যপথ শুরু হয়েছিল 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে তার পরিসমাপ্তি। তাঁর নাতি-দীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে সতীনাথ ভাদুড়ী মানব মনের বহু জটিল কক্ষের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটন করলেও সর্বত্রই তাঁকে অস্থির মনে হয়েছে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়ার প্রবণতা, তাঁকে সুস্থির হতে দেয়নি, কিন্তু 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে তিনি স্থিতধী হয়ে আধুনিক শিক্ষিত একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। আপাত সরল কাহিনীতে এক সুখী দম্পতি পরস্পরের কাছ থেকে কি ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো, এই বিচ্ছিন্নধর্মিতাকে কেন্দ্র করেই লেখক উপন্যাসটি গড়ে তুলেছেন। যদিও একটি পরিবার এই কাহিনীর উপজীব্য, তবু লেখক একা

পরিবারের মধ্য দিয়েই আধুনিক জীবনের মানসিকতাটি তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের আধুনিক যুগযন্ত্রণার এমন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বাংলা সাহিত্যে সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সব উপন্যাসের মত 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসটিও বিহারের কোন মফঃস্বল শহরের এক বাঙ্গালী পরিবারকে নিয়ে রচিত হলেও এটি তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মত আঞ্চলিকতার বিশেষত্ব চিহ্নিত নয়। কাহিনীর স্থল যেখানেই হোক না কেন, পাত্রপাত্রীদের এই মানসিকতা যে কোন শহুরে জীবনেই বর্তমান। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসের সম্ভারে 'দিগ্‌ভ্রান্তে'র ভিন্নতা তাই সহজেই চোখে পড়ে।

'অচিন রাগিণী' এবং 'সংকট' উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে জটিলতা থাকলেও পাত্র পাত্রীদের মনস্তত্ত্ব ততটা জটিল ছিল না। বিশেষ করে 'সংকট' উপন্যাসে বহু কাহিনী এবং বহু চরিত্রের সমাগম ঘটেছে এবং কাহিনীর গতিও একাভিমুখী নয়, কিন্তু 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে যেমন বহু চরিত্রের ভীড় নেই, তেমনি কাহিনীর গতিও বহুগামী নয়।

'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে ডাক্তার সুবোধ মুখার্জির বা তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মনের ফাটলগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সৃষ্টি হয়েছে। ডাক্তার সুবোধ মুখার্জির স্ত্রী অতসীবালা কিংবা তাঁর গ্রাম সম্পর্কের ভাই হরিদাসের মাত্রাতিরিক্ত ভক্তিমার্গতা পরিবারটিকে বাইরে থেকে আন্দোলিত করেনি, সুবোধ মুখার্জী বা অতসীবালা আপন আপন জীবন-বৃত্তের মধ্যে এতটা আটকা পড়েছিলেন যে তার মধ্য থেকে পরস্পরের সম্পর্ক এমনই দূরে সরে যাচ্ছিল। এমন কি অতসীবালার পুত্র সুশীলও এক অজ্ঞাত কারণে পিতার স্নেহ সম্পর্ক থেকে আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল ; সম্ভবতঃ সুবোধবাবু আভিজাত্য এবং আত্মগরিমার যে খোলসটি নিজের মনের চারপাশে তৈরী করেছিলেন তা এতটাই কঠিন ছিল যে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব হোতো না। এইজন্য হরিদাস যখন তাদের পরিবারে আশ্রয় নিল তখন হরিদাসকে কেন্দ্র করে সুবোধবাবুর স্ত্রী অতসীবালা এবং তার পুত্র-কন্যারা পিতার বিরুদ্ধে শিবির তৈরী করলেন, কিন্তু এ সমস্ত এত সূক্ষ্মভাবে রচিত হয়েছে যে, অতসীবালা বুঝতেও পারেননি তিনি আস্তে আস্তে স্বামীর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছেন। হরিদাস তাঁর বাপের বাড়ীর লোক এই কথাটিই অতসীবালার মনে বেশী করে দেখা দিয়েছিল।

হরিদাস সম্পর্কে তাঁর স্বামীর সকল উক্তিই খোঁচা দেওয়া বলে মনে হতো এবং সুবোধবাবুও স্পষ্ট করে এ ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীকে কিছু জানাতে পারেননি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এই আলগা দিকটিকে অতি সহজে ভেঙ্গে দিয়ে সেই স্থানে ধর্ম প্রবেশ করলো এবং মুখার্জী পরিবারের ভিত্তিমূল শিথিল করে দিল। এই কাজটি অতসীবালার গ্রাম সম্পর্কের ভাই হরিদাস ত্বরান্বিত করেছিল।

একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পনায় লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী কোন জটিলতা সৃষ্টি করেন নি। লেখকের অন্যান্য উপন্যাসের মত এই উপন্যাসেরও কাহিনী-স্থল বিহারের কোন মফঃস্বল শহর, তবে কাহিনী একস্থানে সীমায়িত থাকেনি, দেওঘর বৃন্দাবন এমনকি কলকাতাতেও কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর যাতায়াত ঘটেছে। কাহিনীর সূচনা এবং সমাপ্তি একই স্থানে হয়েছে অর্থাৎ সুবোধবাবুর গৃহে, মাঝে সুবোধবাবুর পরিবারের লোকদের দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমা ঘটেছে। কাহিনীর মধ্যে কোন জটিলতা না থাকলেও'দিগ্‌ভ্রান্ত'একটি গভীর মনস্তত্ত্বমূলক এবং আধুনিক জীবন ভাবনার উপন্যাস।

ডাক্তার সুবোধ মুখার্জি সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। কেবল রোগীর চিকিৎসা করাই তাঁর একমাত্র কাজ নয়, সেই সঙ্গে অন্য কাজেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ আছে। তিনি এই অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটির একজন জনপ্রিয় চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি তাঁর জনপ্রিয়তা এবং পরিবারের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য সর্বদা সচেতন থাকতেন। তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত ডিসপেনসারীতে চিকিৎসক রূপে তাঁর একমাত্র ছেলে সুশীলকে অধিষ্ঠিত করে যাবেন, এই স্বপ্ন তিনি দীর্ঘকাল ধরে লালিত করে এসেছেন। সুবোধবাবুর স্ত্রী অতসীবালা, ভট্টাচার্য পরিবারের মেয়ে হবার জন্য ধর্ম এবং আচারনিষ্ঠ সংস্কারের প্রতি ঝোঁক ছেলেবেলা থেকেই গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সুবোধবাবু প্রখর ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁর মনের বাসনা অবদমিত থেকে গিয়েছিল। সুবোধবাবু তাঁর একমাত্র মেয়ে মণিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মণিও তার বাবাকে খুব ভালোবাসতো; কিন্তু সুশীলের মার প্রতিই আকর্ষণ বেশী ছিল। সুবোধবাবু রাশভারি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, পুত্রের ভালোমন্দ সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও সুশীল তার পিতার সঙ্গে কোনদিন সহজ হয়ে মিশতে পারেনি। সুবোধবাবুর সংসারের মানুষদের প্রকৃতি যেমনই হোক তাঁর সংসারে সুখ-শান্তি এবং সচ্ছলতা ছিল। সুবোধবাবুর

সংসারের এই স্বাভাবিক ধারাটি অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়, অতসীবালার গ্রাম সম্পর্কের ভাই হরিদাসের আগমনের পর থেকে, এখান থেকে কাহিনীর আর একটি নতুন পর্বের সূচনা।

অতসীবালা তাঁর গ্রাম সম্পর্কের সন্ন্যাসী প্রকৃতির ভাইকে তাঁদের গৃহে আশ্রয় দেন, কিন্তু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সুবোধবাবু মুখে বিশেষ কিছু না বললেও অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেন না। বিশেষ করে, হরিদাসের সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাবটা তাঁর সহ্য হয় না। কিন্তু প্রতিবেশীর চোখে হেয় হবার ভয়ে তিনি বাইরে কিছু প্রকাশ করেন না। হরিদাস অল্পদিনের মধ্যেই স্থানীয় মহলে একজন শুদ্ধাচারী ভক্ত বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। হরিদাস সুকণ্ঠের অধিকারী; ভাগবত,পাঠ এবং ধর্ম আলোচনার মাধ্যমে ছোট্ট মফঃস্বল শহরে অল্পদিনের মধ্যেই একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে পড়েন। সুবোধবাবু এই অবাঞ্ছিত আগন্তুককে সহজভাবে মেনে নিতে পারেন না, তাঁর সামাজিক খ্যাতি নষ্ট হতে পারে, এই ভয় তাঁর মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে চেপে বসে। এখানে থেকে কাহিনীর আবার একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

হাওয়া বদলের জন্য সুশীলের পিসিমারা দেওঘর গেলেন। অতসীবালা মণি সুশীল এবং হরিদাসও গেলেন। সুবোধবাবু কাজের মানুষ, তাঁর পক্ষে দীর্ঘকাল শহরে অনুপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। দেওঘরে আসার পর অতসীবালা ধর্মাচরণের স্বাধীনতাটুকু পেলেন। স্বামী ধর্ম সম্বন্ধে চিরকালই নিস্পৃহ ছিলেন। শ্বশুর বাড়ীতে ধর্মচর্চা করলেও অতসীবালা সর্বদাই কুণ্ঠিত থাকতেন, স্বামীর চোখে কোন কিছু বাড়াবাড়ি না মনে হয়, এই আশঙ্কায় প্রাণ খুলে তিনি ধর্মচর্চা করতে পারতেন না। বৃন্দাবনধামের কৃষ্ণদাস বাবাজীর অস্থায়ী আশ্রম 'রেখাকুঞ্জে' তিনি জীবনের নতুন আস্বাদ পেলেন। প্রকৃত ভক্ত মানুষদের সাহচর্যে আসার পর তাঁর মনের অবদমিত ইচ্ছা নতুন করে জেগে উঠলো। আশ্রমের পরিচালিকা ব্রজমার মধুর সাহচর্য, অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যাদের অনাড়ম্বর সহজ জীবন, চিত্রাসখীর নানাভাবে কৃষ্ণভজনা, প্রভৃতি বিষয় তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করলো,তিনিও নিজেকে আশ্রমবাসীর একজন মনে করতে আরম্ভ করলেন। হরিদাসও অনুকূল পরিবেশে ভাগবৎ পাঠ আর পালাকীর্তন করে সকলের মন জয় করে নিলেন। ব্রজমার অনুরোধে রেখাকুঞ্জের রাস উৎসব উপলক্ষ্যে সপরিবারে অতসীবালা তিন দিন সেখানে থেকে গেলেন। সেখানে চিত্রাসখীর ভাবোন্মাদ, শ্রীকৃষ্ণের ছবি থেকে হাতে

বাঁশি, চূড়ায় ময়ূরের পাখা লাগানো একটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসতে দেখা এবং আবার ছবির মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখে তারা সকলেই স্বর্গীয় আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

সতীনাথ ভাদুড়ী বৈষ্ণব ধর্ম এবং বৈষ্ণবদের আশ্রম জীবনের একটি বাস্তবানুগ চিত্র অঙ্কন করার জন্য এ বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। ভারতীয়দের জীবনে ধর্মাচরণের ভূমিকাটিকে তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে অবলোকন করেছেন। কিন্তু আশ্রমিক জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তাঁর দৃষ্টি পথের বাইরে থাকেনি।

'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসটি মূলতঃ ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সংঘর্ষের উপর রচিত। সুবোধবাবুর বৈজ্ঞানিক মন কোনদিন ভাববাদী দর্শনের মধ্যে জীবনের সত্য খুঁজে পেতো না। তাই তাঁর ছেলে সুশীল যখন কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে আই. এ. পড়বার জন্য কলেজে ভর্তি হন, তখন তিনি মনে মনে অত্যন্ত আঘাত পেলেন। সুশীল বাল্যকাল থেকেই শুনে এসেছে যে তাকেও তার বাবার মত ডাক্তার হতে হবে, কিন্তু বৃন্দাবনে আশ্রমে থাকার সময় থেকেই তার মনের পরিবর্তন আসে। কৃষ্ণদাস বাবাজী এবং চিত্রাসখী বৈষ্ণব ধর্ম এবং তত্ত্বকথা এমনভাবে তাকে বিশ্লেষণ করে শোনাতেন যার থেকে তার মনে ধর্মের প্রভাব কৈশোর থেকেই প্রবল হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি তার মা পাকাপাকি ভাবে আশ্রমবাসিনী-হওয়ার জন্য আশ্রমের জীবনের প্রতি তার আকর্ষণ তীব্রতর হয়। সুবোধবাবু তাঁর স্ত্রী অতসীবালা কিংবা ছেলে সুশীলের আশ্রমবাসকে অন্তরে গ্রহণ করতে না পারলেও তিনি নিয়মিত আশ্রমে টাকা পাঠিয়ে দিতেন,—যাতে তাঁর পরিবারের সেখানে কোন অমর্যাদা না হয়। তাঁর স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য যে হরিদাসই দায়ী একথা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। মণি এবং অতসীবালা যখন দেওঘর থেকে প্রথমবার প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তখনই তাঁরা গলায় কণ্ঠী ধারণ করেছিলেন। বাড়ীতে তারা নিরামিষ খেতে শুরু করলেন এবং কৃষ্ণদাস বাবাজী এবং রাধাকৃষ্ণের ছবি পূজা আরম্ভ করেছিলেন। সুবোধবাবু স্ত্রীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন না—তাই স্ত্রীর আচরণকেও জোর করে বাধা দিতে তাঁর রুচি এবং শিক্ষায় আটকে ছিল। এই থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমবর্ধমান হতে থাকে। সুবোধবাবু মেয়ের বিবাহের জন্য চিন্তিত হলেন। মেয়ে যদি মায়ের অনুগামিনী হয়

তাহলে তাকে বিবাহ দেওয়া শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে না। মণি বাবার নিঃসঙ্গতা অনুধাবন করতে পেরে শেষ পর্যন্ত তার মায়ের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু সুশীল প্রতি মুহূর্তেই তার বাবার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। সুবোধ ডাক্তারের ধারণায় যার মাথায় একবার ভজ গৌরাঙ্গের পোকা ঢোকে তার বিদ্যাবুদ্ধি ভবিষ্যতে কোন কাজেই লাগে না, ছেলের মতিগতি দেখে তিনি হতাশ হয়ে যান।

সুবোধবাবু সামাজিক প্রতিষ্ঠা চান, অতসীবালা ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে আত্মোন্নতি চান। সুবোধবাবুর সংসারে এক অদৃশ্য প্রাচীর উঠে যায়, যার একদিকে অতসীবালা এবং সুশীল, অপর দিকে সুবোধ ডাক্তার এবং মণি। কলেজের ছুটি হলেই সুশীল আশ্রমে চলে যায়, সুবোধবাবু স্ত্রীকেই মনে মনে দায়ী করেন তাঁর কাছ থেকে সুশীলকে আলাদা করে নেবার জন্য।

বৃন্দাবনের আশ্রমিক জীবন, গ্রন্থে একটি বড় অংশ জুড়ে আছে। সতীনাথ ভাদুড়ী সকল বিষয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে উৎসাহী ছিলেন। এই কারণে অনেক সময়েই কাহিনীর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে; কিন্তু কাহিনীর গতি রক্ষার জন্য তুচ্ছ ব্যাপারকেও তিনি এড়িয়ে যেতে চাননি। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবদের আশ্রমজীবন বর্ণনায় একদিকে যেমন সাধন পদ্ধতির খুঁটিনাটি বিষয়ের ছবি অঙ্কন করেছেন, অপরদিকে তেমনি আশ্রমিকের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার পরিচয় দিতেও ভোলেন নি। অতসীবালা বৃন্দাবনের আশ্রমে এসে লক্ষ্য করলেন যে এখানকার মানুষজন রাধাকৃষ্ণ সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সেই তুলনায় তাঁর সংসারের পরিপার্শ্বিক মানুষজন কত সাধারণ স্তরের ছিল। অপরের অন্দর মহলের সর্বশেষ খবরটি সংগ্রহ করার ব্যাপারেই তাঁদের উৎসাহ বেশী। আশ্রমের মানুষদের সাহচর্য লাভ করে অতসীবালা পরম তৃপ্ত হলেন। আশ্রম অধ্যক্ষ কৃষ্ণদাসবাবাজী পরম পণ্ডিত, চিত্রাসখী রাধারাণীর আরাধনায় সকলকে ভাবের রাজ্যে নিয়ে যান, আশ্রমকর্ত্রী ব্রজমার আন্তরিক ব্যবহারও তাঁকে মুগ্ধ করে। এই মানুষদের জীবনাচরণের নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য ভক্তিরসে ডুবে থাকা এ সবই অতসীবালাকে খুব আকৃষ্ট করে। তাঁর ছেলে সুশীলের ধর্মের প্রতি আকর্ষণ এবং শুদ্ধ জীবনাচরণের প্রতি আগ্রহ তাঁকে আশ্রমজীবনের প্রতি আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলে।

লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী সুবোধবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের জন্য

বাহ্যিক কোন ঘটনার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। স্বামী-স্ত্রী কিংবা ছেলে-মেয়েরা নিজের মনের মধ্যেই এক বিভেদের প্রাচীর তৈরী করে নিয়েছিল। সুশীলের তার মার পক্ষ নেওয়া, কিংবা মণির তার বাবার পক্ষ নেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট কারণ ছিল এবং লেখক সেই কারণগুলিকে বাইরের কোন ঘটনা দিয়ে ব্যাখ্যা না করে মনস্তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বাবার নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য মণি যেমন ভাবিত ছিল, তেমনি অতসীবালার নিঃসঙ্গ আশ্রম জীবনের জন্য সুশীলও ভাবিত থাকতো। অতসীবালার গ্রাম সম্পর্কের ভাই হরিদাস অতসীবালার আশ্রম জীবনের সঙ্গী থাকলেও সুশীল কোনদিনই তার মামাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারতো না; হরিদাস ভণ্ড এবং তাদের পরিবারের পক্ষে দুষ্টগ্রহ এ ধারণা সুশীলের বরাবর ছিল। মার দুঃখই সুশীলকে বেশী করে আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। আশ্রম অধ্যক্ষ কৃষ্ণদাস বাবাজী এবং ব্রজমা সুশীলকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, সুশীল প্রথমে এই স্নেহের আধিক্যের কারণ অনুধাবন করতে পারেনি।

বাল্যকাল থেকে বিজ্ঞান পড়তে হবে জেনে আসা সত্ত্বেও আশ্রমের প্রভাবেই সে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে বি· এ. পড়ে। আশ্রমের সঙ্গে সুশীলের প্রথম সংঘাত বাঁধলো যখন কৃষ্ণদাস বাবাজী তাঁর মনের গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, সুশীলকে তিনি পরবর্তীকালে আশ্রমের অধ্যক্ষ করবেন। সুশীল আশ্রমিক জীবন ভালোবাসতো, কিন্তু আজীবন মোহান্তগিরি করার কোন ইচ্ছা তার ছিল না। গুরুদেবের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ হওয়াতে সুশীলের চোখে অনেক কিছু ফাঁকিই ধরা পড়লো। সুশীল গুরুদেবের অভিলাষ কেবল পূর্ণ করতেই অসম্মত হল তাই নয়, সে এর নীরব প্রতিবাদ জানাবার জন্য ডাক্তারী পড়ার জন্য মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হল। আশ্রমিক জীবনের বাইরেও যে ধর্মাচারণ করা যায় এ সত্য সুশীল উপলব্ধি করলো। সুশীলের মনের এই দ্বন্দ্বটি লেখক স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন।

সুশীলের এই পরিবর্তনে সুবোধবাবু স্বাভাবিক কারণেই খুশী হলেন, তিনি পূর্বের ব্যবধান ভুলে ছেলের কাছে আসতে চাইলেন, সুশীলের এই মানসিক পরিবর্তন তাঁকে বিজয়ীর সম্মান এনে দিল। সুশীলের এই মত পরিবর্তনে অতসীবালা কিন্তু খুশী হলেন না। গুরুদেবের অনুরোধ সুশীল উপেক্ষা করতে পারে অতসীবালা আশা করেন নি। তিনি তার বহু পূর্বেই সাংসারিক জীবন থেকে সরে এসেছেন, এমন কি আশ্রমবাস কালে শুনে এসেছেন যে সাংসারিক

মানুষের সঙ্গে বেশী সম্পর্ক রাখলে ঈশ্বর আরাধনায় বিঘ্ন ঘটে। এইজন্য তাঁর একমাত্র মেয়ে মণির বিয়ের সময় তিনি উপস্থিত থাকলেন না, সুশীলও তার দিদির বিয়ের সময় বৃন্দাবনের আশ্রমে থেকে গিয়েছিল। এ সমস্ত ঘটনা সুশীলের ডাক্তারী পড়বার আগেই ঘটেছে।

অতসীবালার মনেও আশ্রমজীবন সম্পর্কে সংশয় দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতা নীচতার উর্ধ্বে থেকে এক মনে ঈশ্বরের আরাধনা করতে গিয়ে অতসীবালা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলেন তা তার কল্পিত জীবনের অনুকূল নয়। আশ্রমও আর এক সংসার, এখানেও নিত্যদিন একই কাজ—তাঁর মনে প্রশ্ন জাগাতে শুরু করলো : "যার জন্য আশ্রমে আসা সে জিনিস তিনি পাবেন তো ? যেসব কথা ভুলতে চান ঠিক সেইগুলো ফাঁক পেলে মন জুড়ে বসে কেন ? প্রকৃত ভজনের অধিকারের যোগ্যতাই তাঁর এখনও হল না; চেষ্টা সত্ত্বেও আশানুরূপ এগোতে পারছেন কই ? গুরুদেবের কথায় মনে বল পাচ্ছেন কই।"

'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী অতসীবালার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন, ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে মানুষ যে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের আশা করে, তার যথার্থ প্রকৃতি কি ? সেই সম্পর্কে কারো কোনো স্পষ্ট ধারণা থাকে না। অতসীবালা কি পেতে চাইছেন, তা পার্থিব জীবনে পাওয়া সম্ভব কি না, এ ধারণা তাঁর ছিল না। এই না পাওয়ার ব্যর্থতা তাঁকে স্বামীর কাছে ছোট করে দেবে, এই ভয় তাঁকে আরও অস্থির করে তুলেছে এবং অন্যান্য আশ্রমবাসীর মত নিশ্চিন্ত এবং সুখী হতে দেয়নি। যে স্বপ্ন নিয়ে অতসীবালা স্বামী-সংসার পরিত্যাগ করে আশ্রমের জীবনে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর আস্তে আস্তে মোহ ভঙ্গ হতে আরম্ভ করে। সতীনাথ ভাদুড়ীর কৃতিত্ব এইখানেই যে, তিনি বস্তুবাদ দর্শনের বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য ভাববাদী দর্শনকে অকারণ আক্রমণ করেননি, তিনি কোন মত প্রতিষ্ঠা বা প্রচার করতে চাননি, চরিত্রগুলোর স্বাভাবিক বিকাশের মধ্য দিয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই কারণে 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসের শিল্পমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি, অথচ এমন একটি বিতর্কিত বিষয়ে শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করা সত্যিই কঠিন। সতীনাথ ভাদুড়ী এই কঠিন দায়িত্বটি আন্তরিকতার সঙ্গেই পালন করেছেন।

ডাক্তার সুবোধ মুখার্জির চরিত্র পরিকল্পনায় লেখকের বাস্তবজ্ঞানের

যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুবোধ মুখার্জির গ্রাম সম্পর্কের শ্যালক হরিদাসের এবং তাঁর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিপরীতধর্মী চরিত্র দুটি স্ব স্ব ক্ষেত্রে জীবন্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুবোধবাবু সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা চান, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কোন অন্যায়ের বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি, তাঁকে পুরোমাত্রায় আদর্শবাদীও বলা যায় না, সামাজিক খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই তিনি তাঁর স্ত্রীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। টাকার অভাবে তাঁর স্ত্রীর অমর্যাদা হোক এটা তিনি নিজের সম্মানের জন্যই চাইতেন না।

অপর পক্ষে হরিদাসও হরিভক্ত সমাজে প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন, কিন্তু এর জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ এবং কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন তা করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। হরিদাসের এই পরনির্ভরশীলতা এবং কর্মবিমুখিতা কোনদিনই সুবোধবাবু অন্তর থেকে মেনে নিতে পারতেন না। হরিদাস এটা ভালো করেই বুঝতে পারতেন, তাই তিনি বরাবর অতসীবালাকে খুশী করে চলবার চেষ্টা করতেন। হরিদাস ভক্ত সন্ন্যাসী, স্ত্রী-পুত্রকন্যা পরিত্যাগ করে মিথ্যার আশ্রয়ে সুবোধবাবুর সংসারে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু হরিদাস অনেকগুলি গুণের অধিকারী ছিলেন, যে কারণে তিনি অচিরেই ভক্ত-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। সুবোধবাবু জীবনে আরও একটি আঘাত পেলেন যখন মণি বিধবা হয়ে তাঁর সংসারে ফিরে এল। কিন্তু মণি সুবোধবাবুর সংসারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করাতে এবং নাতি পল্টুর সান্নিধ্য লাভ করে তিনি কিছুটা শান্তি পেলেন। সুশীলও ডাক্তার হয়ে তাঁর ডিসপেন্সারিতে বসাতে তাঁর বহুদিনের লালিত ইচ্ছা আংশিক পূর্ণতা লাভ করলো। এই সমস্ত ঘটনাগুলি এত স্বাভাবিক ভাবে ঘটে গেছে যে কোথাও অতিরঞ্জিত অথবা অতি নাটকীয় মনে হয়নি।

'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাস মূলতঃ সুবোধবাবু এবং তাঁর পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও সুশীলকেই এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র বলা যেতে পারে। এই কাহিনীতে সুশীলের যতটা মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে সুবোধবাবুর ততটা হয়নি। সুশীলের বাল্যকাল থেকে মধ্য যৌবন পর্যন্ত কাহিনীর বিস্তৃত। অপরিণত বয়সে মায়ের প্রভাবে সে আশ্রমের জীবনে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি এবং শক্তি পরিপক্ক হয়, আবেগের পরিবর্তে যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা বাড়ে। চিত্রাসখীর ভাবোন্মাদনাকে সে

ডাক্তারী বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এর পেছনে 'ফাইলেরিয়া' রোগের কারণ খুঁজে পায়, কিন্তু চিত্রাসখীর এই ভাবোন্মাদকে উপলক্ষ্য করে আশ্রমে খুব ঘটা করে কম্প উৎসব উৎযাপন শুরু হয়েছিল। সুশীলের কথায় চিত্রাসখী এলোপ্যাথী চিকিৎসায় রাজী হন—এ সমস্ত ঘটনা ভক্তজনের মনে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত চিত্রাসখী আশ্রমত্যাগ করে চলে যান। সুশীল বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করতে আরম্ভ করলেও কৈশোরের আশ্রমের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

দৈনন্দিন জীবনে সে শুদ্ধ আশ্রমিক রীতিনীতিই মেনে চলতো এবং বিবাহ করে সাধারণ জীবন যাপনে কোনদিন উৎসাহবোধ করেনি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে সুশীলের মা-বাবার ব্যর্থ দাম্পত্যজীবন তাকে বিবাহ করতে নিরুৎসাহ করে থাকবে, কিন্তু সুশীলের মানসিক গঠন এমন ভাবে তৈরী হয়ে গিয়েছিল যে আশ্রমের ঈশ্বরোপাসনার মধ্যে নানা রকম ফাঁকি তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও কখনও বিদ্রোহী হয় উঠতে পারেনি। প্রাত্যহিক জীবনে শুদ্ধাচারী থেকে গেছে।

হরিদাসের ভূমিকাটি এই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তার সুবোধবাবুর পরিবারে আগমনের পর থেকেই একটি পরিবার পরস্পর থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে, দীর্ঘকাল পরে তারই আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে দিগ্‌ভ্রান্ত পরিবারের মানুষগুলো আবার সঠিক পথের নির্দেশ পায়। সাধারণ দৃষ্টিতে হরিদাসকে এই কাহিনীর খল চরিত্র বলে মনে হতে পারে। কোন অসতর্ক লেখকের রচনায়, হরিদাস পুরোপুরি 'খল' চরিত্র হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী অত্যন্ত সতর্ক শিল্পী ছিলেন। তিনি কাহিনীকে চমকপ্রদ করে তোলার পরিবর্তে কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলেন, এই কারণেই তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা এতটা জীবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। তাই হরিদাস খল চরিত্র হওয়ার পরিবর্তে তার পরিণতিটি ট্রাজিক হয়ে উঠেছে। হরিদাস কর্মবিমুখ এবং পর নির্ভর হলেও শাস্ত্র-জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি কোন ফাঁকি দেন নি। বৃন্দাবনের আশ্রমে উচ্চপদলাভ করার জন্য ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করলেও অতসীবালার ধর্মচর্চার পথে কোন বিঘ্ন ঘটাননি; বরং আচারনিষ্ঠা সম্বন্ধে সব সময় তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

সুশীল আশ্রমের টাকা কমিয়ে দেওয়ার জন্য হরিদাসকে বাধ্য হয়েই

আশ্রম থেকে চলে এসে সুবোধবাবুর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল ; কিন্তু এবারে হরিদাস আর সুবোধবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় পান না। সুবোধবাবুর সাহায্যে স্থানীয় হরিসভায় আশ্রয় লাভ করে। এদিকে অতসীবালা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়াতে আশ্রম কর্তৃপক্ষ তাঁকে আশ্রমে রাখা সমীচীন মনে না করে তাঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। বিচ্ছিন্ন পরিবারের মানুষগুলো এক সংকট মুহূর্তে আবার পুনর্মিলিত হয়। অতসীবালা বহুদিন থেকেই আর জপতপে শান্তি পাচ্ছিলেন না। মণির বিধবা হওয়া কিংবা সুশীলের সংসার জীবনের প্রতি ঔদাসীন্যের জন্য নিজেকেই দোষী বলে মনে করেন। তবু শেষ পর্যন্ত নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে পরিবারের মানুষ জন একত্রিত হয়। কিন্তু হরিদাসের এ পরিবারে আর স্থান হয়না ; তাঁর ভণ্ড প্রকৃতির কথা সকলেই জানতে পারে। এতদিন সে সকলকে বলে এসেছে স্ত্রী-পুত্রের কোন বন্ধনই তার নেই, আসলে সংসারের দায়িত্ব বহন করার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না, সাংসারিক-জীবন অপেক্ষা সন্ন্যাসী-জীবন অনেক নির্ঝঞ্ঝাট, তার মত কর্মবিমুখ মানুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। হরিদাসের অতীত বেচুবাবুরা জানতে পেরে যান ; তবু তার অন্যান্য গুণের কথা চিন্তা করে তাকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু হরিদাস তার পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে কোন রকম উৎসাহ দেখান না। পূর্ব পাকিস্থান থেকে নানা গুজব এখানে আসে, হরিদাসের পরিবার সেখানেই থাকে। হরিদাসের স্ত্রী তার মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে হরিদাসকে চিঠি দেয়, কিন্তু হরিদাস এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ থাকেন। স্থানীয় লোকেরা বিশেষ করে হরিসভায় যারা যাতায়াত করতেন তারা সকলেই স্থির করেন এ ভাবে হরিদাসের পরিবারকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায় না, তারা স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে হরিদাসের স্ত্রী-কন্যাকে আনতে পূর্ব-পাকিস্থান চলে যান। এরপরেই হরিদাসের দেহটা সুবোধবাবুর বাড়ীর সংলগ্ন যজ্ঞডুমুর গাছের ডালে গলায় দড়ি লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায়। হরিদাস আত্মহত্যা করে। হরিদাসের আত্মহত্যায় একটি পরিবারে রাহুমুক্তি ঘটে।

হরিদাসের আগমনের পর সুবোধবাবুর সংসারে যে বিপর্যয় ঘটেছিল, এবং যার ফলে পরিবারের মানুষেরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, হরিদাসের অপঘাত মৃত্যুতে সেই বিচ্ছিন্ন পরিবারটি পারস্পরিক অভিমান ভুলে আবার একত্রিত হল। সমগ্র উপন্যাসে হরিদাসের ভূমিকাটি তাই

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুবোধবাবু অতসীবালা কিংবা সুশীলের জন্যই পরিবর্তিত হয়েছিল। হরিদাস এই পরিবারের সুনাম নষ্ট করে দিতে চায়, হরিদাস কেন এখানেই গলায় দড়ি দিলেন ? এর কোন সদুত্তর সুবোধবাবু খুঁজে পাননি। সুবোধবাবুর জীবনের চরম বিপর্যয় দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য, এই কারণে হরিদাসের আত্মহত্যা সাধারণভাবে কষ্ট কল্পিত বলে মনে হতে পারে। এরজন্য কোন পূর্ব প্রস্তুতিও ছিল না, কিংবা হরিদাসের পক্ষে আত্মহত্যা করা তার চরিত্র বা মানসিকতার অনুপন্থী নয়, এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক।

সতীনাথ ভাদুড়ী শিল্পের অপমৃত্যু ঘটিয়ে তাঁর নিজস্ব কোন বক্তব্য উপস্থাপন করেননি, হরিদাস চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ অনুযায়ী তার মৃত্যু অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। হরিদাস উন্নতমানের মানুষ না হলেও ধর্মাচরণের মধ্যে তার কোন ফাঁকি ছিল না। সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে যে জীবন সে ভালোবেসেছিল, সেখানে প্রতিষ্ঠা এবং সম্মান তার কাম্য ছিল, কিন্তু তাঁর অতীত সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল এবং বাধ্য হয়ে পুনরায় পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করার মত মানসিক বল হরিদাসের ছিল না, এমন অবস্থায় তার পক্ষে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলাটাই স্বাভাবিক। সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রধান বিশেষত্ব তিনি কেবল কাহিনীর সঙ্কট সৃষ্টি করার জন্য কোন চরিত্র পরিকল্পনা করেন নি। চরিত্রগুলির স্বাভাবিক বিকাশেই সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে এবং সঙ্কটের রূপ বা প্রকৃতিই তার শেষ কথা নয়—এর মুক্তিরও পথ নির্দেশ আছে। বাংলা উপন্যাসের সর্বাঙ্গীন আধুনিকতা তাঁর এই গ্রন্থটির মধ্যে সুস্পষ্ট।

পাদটীকা

১। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী।

২। সরোজমোহন মিত্র, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: 'জীবন ও সাহিত্য': পৃ. ২৩।

৩। প্রাগুক্ত: পৃ. ৩১।

৪। 'শ্বেত-তরুলতা': স-স্ব ৪৩।

৫। প্রাগুক্ত।

৬। শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য-সম্পাদক 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী' ৩ : পৃ. ৭১।

৭। প্রাগুক্ত : পৃ. ২১।

৮। প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৮।

৯। প্রাগুক্ত : পৃ. ১২।

১০। প্রাগুক্ত : পৃ ৭৮।

১১। প্রাগুক্ত : পৃ. ৮৩।

১২। প্রাগুক্ত : পৃ. ১১২।

১৩। প্রাগুক্ত : পৃ. ১৪০।

১৪। প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৭৫।

১৫। সনাতন পাঠক : 'সাহিত্য সংবাদ' : 'দেশ' : ১০. ৬. ১৯৭২. : পৃ. ৭১০

১৬। দ্রষ্টব্য ৬নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ১৫৪।

১৭। প্রাগুক্ত : পৃ. ১৬১।

১৮। প্রাগুক্ত।

১৯। প্রাগুক্ত।

২০। প্রাগুক্ত।

২১। প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮৫।

২২। প্রাগুক্ত : পৃ. ২৫২।

২৩। প্রাগুক্ত : পৃ. ২৬১।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনীতিমূলক

"ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি।"[১] রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি জনজীবনের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গস্বরূপ। রাজনৈতিক আবর্তের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে কোনো সচেতন শিল্পীই নিস্পৃহতার নির্মোকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই "নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন"[২] রবীন্দ্রনাথকেও বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। বিভূতিভূষণের মত আত্মসমাহিত নিরাসক্ত সাহিত্যিকও 'অশনি সংকেতে'র মধ্যে রাজনীতির সংকেতকে কিছুটা স্বীকৃতি দিয়েছেন। জীবনের অস্থিরতা ও উত্তাল ঘটনাপ্রাচুর্য লেখকদের উত্তরোত্তর কোন না কোন মতবাদের ছত্রতলে নিয়ে এসেছে। তবুও রাজনীতি নিয়ে বাংলা নাটক যত লেখা হয়েছে সে তুলনায় বাংলা উপন্যাস সামান্যই রচিত হয়েছে। মানুষের আত্মসচেতনতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ রাজনীতির সংস্পর্শেও এসেছে। রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারের সময় মানুষ নির্বিকারভাবে ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল খুশীর সামিল হত। কিন্তু সময় অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে, এমন কি আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মর্যাদার সঙ্গে জীবন-ধারণ করার জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধা বোধ করেনি। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র কায়েমের মধ্য দিয়ে সে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। বুদ্ধিজীবী মানুষ মাত্রই দেশের রাজনীতির খবরাখবর রাখতে আগ্রহী। আধুনিককালে রাজনীতি মানুষের নিঃশ্বাসের মতো জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক যেমন মানবিক সূক্ষ্ম ও জটিল অনুভূতির পাপড়িগুলিকে একটি একটি উন্মোচিত করেন, তেমনই শাসকের প্রতি শোষিতের তীব্র ঘৃণা, ক্ষোভ ইত্যাদিও প্রকাশ করে থাকেন। এই কারণে অনেক গ্রন্থকেই শাসকশ্রেণীর রাজরোষে পড়তে হয়েছিল। সমাজবিপ্লবী বা দার্শনিকদের অনেক কাজ অনেক সময় সাহিত্যিকেরাও করে থাকেন। বাংলা সাহিত্যে এ-বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ 'নীলদর্পণ' নাটকের উল্লেখ করা যায়। একটি নাটক এতবড় সমাজবিপ্লব

এনেছে যার সঙ্গে আমেরিকান উপন্যাস-Uncle Tom's Cabin-এর তুলনা করা চলে। একদিকে ক্রীতদাস প্রথার লোপ, আর একদিকে নীলকর-রোধ, দুটি বিষয় ভিন্ন হলেও তারা সামাজিক দর্পণে সমমর্যাদাসম্পন্ন ; যদিও 'নীলদর্পণ' নাটক এবং Uncle Tom's Cabin উপন্যাস।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলেও উপন্যাসটিকে সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাসের আখ্যা দেওয়া চলে না। শরৎচন্দ্রের উষ্ণ হৃদয়ের রোমান্টিক ভাবকল্পনা দেশপ্রেমের ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —'সন্তান কানা হোক, খোঁড়া হোক, কাল হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক, মা যেমন তাকে ভালবাসেন, শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের তেমনি ভালবাসতেন।"[৩]

বলাবাহুল্য এই ভালবাসায় অন্ধ হৃদয়াবেগই একমাত্র সম্বল, যুক্তিবিচারের কোন স্থান ছিল না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলতে পারে যে 'পথের দাবী' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমতও শরৎচন্দ্রের অনুকূলে ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাস দুইটিও যথার্থ অর্থে রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। রাজনীতিকে সীমিত অর্থে যে ব্যাখ্যাই করা হোক না কেন, দেশের সর্বসাধারণের সঙ্গে সংযোগ না থাকলে তাকে রাজ-নৈতিক মর্যাদা দেওয়া চলে না। রাজনীতি আজ আর রাজার নীতি নয়। রাজনীতির অর্থ এখন জননীতি। দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক কর্মীর রোমাঞ্চকর কার্যকলাপ বা পরস্পরের প্রতি সন্দিহান মানুষের আত্মকলহ আধুনিক রাজনৈতিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে না। আলোচ্য গ্রন্থগুলি রচনার জন্য উভয় লেখকেরই কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'ভারতী', 'কল্লোল', 'কালিকলমের' লেখকগোষ্ঠীর অধিকাংশই কলাকৈবল্যবাদ, দেহবাদ ইত্যাদির ঝোঁকে দেশের আশু সমস্যাকে উপেক্ষা করেছেন। পরাধীন দেশে বাস করেও জাতীয়তা-বাদী চিন্তার কোন প্রকাশ তাঁদের লেখায় নেই। সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুলের মত জাতীয়তাবাদী কবির দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও এই সকল লেখকের স্বদেশ ও জাতির প্রতি ঔদাসীন্য বিস্ময় উদ্রেক করে।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাস দুটিতে অবশ্য তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি বিশেষ অধ্যায়কে দেখতে পাওয়া

যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমির তেমন কিছু আভাস পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, রাজনীতি অপেক্ষা সমাজনীতির উপরই লেখকের অধিকতর দৃষ্টি ছিল, সে কারণে উপন্যাস দুটিতে বিপ্লববাদী আন্দোলনের প্রতিও সুবিচার করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের মতে রাজনীতি সমাজনীতিরই নামান্তর মাত্র। তাঁর নিজের ভাষায়: 'আমি জানি রাষ্ট্র-ব্যাপার সমাজের অন্তর্গত, কোনো দেশের ইতিহাসে তার অন্যথা হয়নি; সামাজিক ভিত্তির কথাটা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রিক ইমারতের কল্পনায় মুগ্ধ হয়ে কোনো লাভ নেই।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ আজীবন তাঁর নিজস্ব এক স্বতন্ত্র মৌলিক রাজনীতিবোধকে মেনে চলেছিলেন। স্বরাজ সাধনা কবির কাছে সূক্ষ্ম আত্মকর্তৃত্বের প্রশ্ন নয়। ইতিহাসের প্রয়োজনে কোটী কোটী ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ আত্ম-বিকাশের সাধনাই তাঁর কাছে স্বরাজসাধনা।

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রাণগঙ্গার গোমুখে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ক্ষীণস্রোতধারা প্রবাহিত করেছে। যদিচ রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন করার বাস্তব পরিকল্পনা বঙ্কিম পরবর্তীকালের চিন্তা। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পূর্ণ মূল্যায়ন বঙ্কিমচন্দ্র বা মধুসূদনের পক্ষে করা সম্ভব হয় নি। কারণ তখন ইংরেজ শাসন শুধু বাংলাদেশের পক্ষেই নয় সারাভারতের পক্ষেই কল্যাণকর ছিল। তখনকার দিনে বাংলার চিন্তাবিদ্‌দের মনে ইংরেজ শাসনের প্রতিক্রিয়া খুব তিক্ত হয়নি। রামমোহন ভারতের মঙ্গলের জন্যই আরও কিছুদিন ইংরেজ শাসন চেয়েছিলেন, অথচ তাঁর স্বাধীনতাপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। বঙ্কিম-চন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র শেষেও এই ইঙ্গিত রয়েছে যে আরও কিছুকাল ইংরেজ রাজত্ব চলবে। এঁরা স্বাধীনতা বলতে কোন বহিরঙ্গ শাসনের না-হস্তক্ষেপ বোঝেন নি, দেশের অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির উদ্বোধনকেই বুঝেছিলেন। তাই জাতি গঠনের দিকেই তাদের লক্ষ্য ছিল এবং সে বিষয়ে ইংরেজকে তাঁরা সহায়ক বলেই মনে করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত স্মরণ গানটিকে করা যেতে পারে: 'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হয়।'[৫]

একথা অবশ্যস্বীকার্য যে স্বদেশপ্রীতি থেকেই রাজনীতির জন্ম। দেশ-সেবার উদগ্র বাসনাই মানুষকে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নিয়ে আসে, বঙ্কিম-

চন্দ্রের অধিকাংশ রচনার মধ্যেই স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রসঙ্গে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন "দুর্গেশনন্দিনী আমাদের স্বদেশাভিমানকে জাগিয়েছিল।"*

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা শতসহস্র যুবককে দেশসেবায়, অনুপ্রাণিত করেছিল। তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথও মায়ের কাছ থেকে আনন্দমঠের পাঠ গ্রহণ করে জীবনে স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে চেতনা বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীর মানসলোক আন্দোলিত করেছিল তা ছিল স্বদেশপ্রেম, পরাধীনতার জগদ্দল পাথরটিকে সরিয়ে দেওয়াই তখন একমাত্র স্বপ্ন ছিল। স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচা যে প্রকৃত বাঁচা নয়, এ বোধ ইংরেজী শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই প্রথম প্রবেশ করে। অশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে স্বাধীনতালাভের স্পৃহা তেমন ছিল না, এইজন্য বাংলাদেশের রাজনীতি চর্চা বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের মধ্যেই দেখা গেছে। স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্ত করার মত বোধ সর্বসাধারণের মধ্যে থাকা স্বাভাবিক নয়। এই কারণে বাংলাদেশের রাজনীতি মূলত শহরকেন্দ্রিক ছিল।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবসমাজ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো, কিন্তু সঠিক পথ নির্ধারণ করতে পারলো না। স্বাধীনতা চিন্তা শহরমুখী হয়ে রইলো। দেশের আপামর জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত কোন আদর্শ তখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছিল না। কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যেই দেশের রাজনৈতিক চেতনা সীমিত ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন, সত্যাগ্রহ এবং অ-সহযোগিতা ভারতবর্ষের কেবল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কেই নয় সাধারণ মানুষের মনকেও বিশেষভাবে নাড়া দিল। দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করার উপায় কি হতে পারে এ ভাবনাই গান্ধীজীর ছিল। তিনি সরকারী উচ্চপদে দেশীয় লোকের নিয়োগ নিয়ে বেশী ব্যস্ত ছিলেন না, সর্বসাধারণের পক্ষে যা অপরিহার্য এমন বস্তুর সন্ধানেই আগ্রহী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর লবণ আইন অমান্য আন্দোলন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর রামরাজ্য পরিকল্পনা সরল ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দের আকৃষ্ট করেছিল এবং তাদের মনে ভগবানের আসনটি তিনি লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর

ইতিহাসে এতবড় অহিংস আন্দোলন আর কোথাও দেখা যায় না। বিভিন্ন ভাষা নিয়ে যে ভারতবর্ষ তার মধ্যে সাময়িক ঐক্য স্থাপন করা নিশ্চয়ই একটা বড় ঘটনা। বৈচিত্র্যহীন বাঙ্গালীর জীবনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব কয়েকটি দশক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রাজনৈতিক দোলায় কম্পমান মানুষের অস্থির মনোভাব নিয়ে উপন্যাস রচিত হতে পারতো যত, তত রচিত হয়নি। বিগত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করে এ সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে, গান্ধীজীর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। কাব্য, নাটক এবং উপন্যাস সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই গান্ধীজীর ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জনমানসে গান্ধীজীর অসামান্য প্রভাব লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "মহাত্মাজির সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মতের ঐক্য নেই। অর্থাৎ আমি যদি তাঁর মতো চরিত্রপ্রভাব সম্পন্ন মানুষ হতেম তা হলে অন্যরকম প্রণালীতে কাজ করতুম। আমার মননশক্তি যদি বা থাকে কিন্তু আমার প্রভাব নেই। এই প্রভাব আছে জগতে অল্পলোকেরই।"[৭]

মহাত্মাজীর রাজনৈতিক মতবাদ তৎকালীন বহু মনীষী একান্তভাবে গ্রহণ করতে না পারলেও তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনসাধনা অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকেও আকৃষ্ট করেছিল। এমন কি বামপন্থী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অহিংস তত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করতেন; কিন্তু ভারতীয়দের মত পশ্চাদপদ মৃত জাতির মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগাতে গান্ধীজীর ভূমিকাকে অস্বীকার করেননি। গান্ধীজী আত্মবিশ্বাসহীন মৃতপ্রায় জাতিকে যথার্থ গণনেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর এই ভূমিকা যে শ্রদ্ধার্হ এ ধারণা বামপন্থী ভাবনাপুষ্ট চিন্তাশীল রাজনীতিবিদেরাও অস্বীকার করেননি। পথ ও মতের পার্থক্য থাকলেও অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় এবং নাম্বুদ্রিপাদ গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের এবং বৈপ্লবিক দিকটির প্রতি তাঁদের গান্ধীজী-সম্পর্কিত গ্রন্থে সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। বিপ্লবী চেতনার কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে প্রণতি জানানোও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক ভূমিকা ছাড়াও জীবনাচরণে যে আদর্শ গান্ধীজী স্থাপন করেছিলেন তাও আপামর জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ঈশ্বরে আস্থা এবং সত্যভাষণ বহু মানুষকেই বিদেশীয়ানা পরিত্যাগ করে সরল জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সতীনাথ ভাদুড়ী এমন একজন মানুষ ছিলেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত হয়েও গান্ধীজীর সরল আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গান্ধীজীর মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়েই যে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন তা নয়, তিনি জীবনাচরণেও গান্ধীভাবনাকে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্যে গান্ধী-ভাবনাজাত উপলব্ধির বিমূর্ত ভাব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে কংগ্রেস প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করলেও গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের সাফল্যের উপর সকল নেতার আস্থা ছিল না। কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গঠন এবং ভারতের বাইরে থেকে ইংরাজের উপর আক্রমণ তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন [১৯১৪-১৮] রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা [১৯১৭] হওয়ায় বাম চিন্তাধারার আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের জন্য ভারতে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছে, তিনের দশক থেকেই মার্কসীয় দর্শন চিন্তাশীল লেখকদের নবভাবনার উদ্রেক ঘটায় এবং মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে মানবতার পূর্ণতর বিকাশ ঘটা সম্ভব এ বিশ্বাস আনে। প্রচলিত রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত মানবতার কান্না তাঁদের রচনায় প্রকাশ পায়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুটি সুস্পষ্ট ধারা প্রবহমান দেখা যায়; এক. গান্ধী-চিন্তাভাবনার লেখক, দুই. মার্কসীয় চিন্তাভাবনার লেখক। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে কোনও বাঁধা মত সুসম্পূর্ণভাবে জনমানসে বেশীদিন অচল হয়ে থাকে না, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানা মতাদর্শ জাতির চিত্তভাণ্ডারে জমা হয়।

গান্ধীজী পরিচালিত জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সমগ্র পথকে তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করা চলে : ক. অসহযোগ আন্দোলন [১৯২০-২১] খ. আইন অমান্য আন্দোলন [১৯৩০-৩২] গ. আগষ্ট আন্দোলন বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন [১৯৪২]।

স্বভাবতই এই তিনটি আন্দোলনের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের উপর, বিশেষ করে উপন্যাস শিল্পের উপর এসে পড়েছে। এর মধ্যে আবার আগষ্ট

আন্দোলনের পটভূমিকাতেই অধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গান্ধীভাবনাকে কেন্দ্র করে রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ' এবং মন্মথকুমার রায়ের 'নতুন ঢেউ' উপন্যাস দুটিই প্রথম দিকের উপন্যাস। দুটি উপন্যাসই অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকার উপর রচিত এবং গ্রন্থদুটির মধ্যে 'রাজপথ'ই সমধিক উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে ফ্রয়েডের দেহবাদ থেকে মার্কসবাদে উত্তরণের এক শিল্পোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজ বাস্তবতার এমন নিখুঁত, নিষ্ঠাবান ও সুদক্ষ শিল্পী বাংলা সাহিত্যে বেশী আসেনি। সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে, রাজনীতির বন্ধন শিল্পীর উৎকর্ষের হানি ঘটায়, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বরং রাজনীতির দীক্ষা তাঁর শিল্পীসত্তায় অনেক বিরোধ ও অসঙ্গতিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। তাই দেখা যায় তাঁর প্রথম দিককার রচনায় ব্যক্তি মানুষের অন্তর্জগতের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অতি আগ্রহ, পরবর্তীকালে অনেক স্তিমিত হয়ে সহজ, সরল ও বহির্মুখী হয়ে উঠেছিল। এই ভারসাম্য তাঁর রচনার শক্তিকে যে প্রখরতর করে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন চিন্তার জোয়ার আসতে শুরু করেছিল। ইংরেজী শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত যে বাঙ্গালী যুবসমাজ এক সময় ইংরেজকে স্বাগত জানিয়েছিল, অর্ধ শতাব্দী অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তারাই ইংরাজ এবং ইংরাজী শিক্ষাকে অবাঞ্ছিত মনে করলেন। ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই ভারতবর্ষের মানুষ পূর্ণ স্বরাজের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন; কিন্তু আন্দোলনের পথ নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একদিকে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন, অন্যদিকে ভাবাবেগ সমৃদ্ধ সন্ত্রাসবাদ এবং মার্কসীয় চিন্তার বিপ্লববাদ, কোন পথটি যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে উপযুক্ত হবে এ ধারণা অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। সতীনাথ ভাদুড়ী গান্ধীজী অনুসৃত পথটির অনুসরণ করেছিলেন।

রাজনীতি-চর্চা এবং সাহিত্য-চর্চা বিপরীতমুখী বিষয়। রাজনীতির উদ্দেশ্য সমাজে এবং রাষ্ট্রে মানুষকে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সামাজিক মানুষের অবস্থা এবং প্রকৃতিকে তুলে ধরা। প্রচলিত সমাজধারায় এবং সনাতন সমাজবিধির প্রয়োগে মানুষের দুর্দমনীয় অজেয় আত্মার

জাগরণ, সেই সঙ্গে মানুষের চিরন্তন বৃত্তির উন্মেষ। মানুষের প্রকৃতি এবং প্রকৃতি ও মানুষ ইত্যাদি সূক্ষ্ম দিকগুলিই সাহিত্যিকদের কাম্য বিষয়বস্তু।

অবশ্য সমাজে অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভশক্তির প্রতিষ্ঠা রাজনীতিকার এবং সাহিত্যকার উভয়েরই কাম্য হলেও, তাঁদের মধ্যে পার্থক্যও সমধিক। রাজনীতির বহু পথ এবং মত থেকে একটিকে বেছে নিয়ে তার প্রতি অবিচল থেকে অন্য মত এবং পথগুলি খণ্ডন করে স্ব-অনুসৃত পথ নির্দেশ করা এবং নিজ দলের আদর্শ তুলে ধরা রাজনীতিকারদের কাজ। বহু মানুষের ভিড়ে সাহিত্যকার যেখানে নৈর্ব্যক্তিক থাকতে পারেন, সেখানে রাজনীতিকারদের বহুজনকে নিয়েই থাকতে হয় ; নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধি সাহিত্যে থাকলেও রাজনীতিতে থাকতে পারে না।

(সতীনাথ ভাদুড়ী রাজনীতিবিদ্ সাহিত্যিক ছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শের রক্তস্রোত নিজ ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত করেছিলেন। তাঁর চিন্তা, কর্ম এবং আদর্শে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। তাঁর এই অকৃত্রিম চেতনা সাহিত্যের মধ্যে সজীব হয়ে উঠেছে। তিনি শিল্পসৃষ্টির তাগিদেও কোথাও আপোষ করেননি। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় তাঁর মত নির্ভেজাল মানুষ সে যুগে দুর্লভ ছিল। তিনি বাস্তব সচেতন লেখক ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শ রক্ষার জন্য শিল্পের সত্যকে কদাচিৎ অস্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে 'জাগরী' উপন্যাসের 'নীলু' চরিত্রের উল্লেখ করা চলতে পারে। নীলু যে রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল, সে আদর্শ সতীনাথ ভাদুড়ীর ছিল না। নীলু তার বিশ্বাস এবং আদর্শে অবিচল ছিল, সতীনাথ ভাদুড়ীও তাঁর বিশ্বাস এবং আদর্শে অবিচলিত ছিলেন। উভয় আদর্শের সংঘাত অনিবার্য, এ ক্ষেত্রে আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শিল্প খণ্ডিত হতে পারতো ; কিন্তু নীলুর চরিত্রের মধ্যে সামান্য কৃত্রিমতা থাকলেও, ভিন্ন মতাদর্শী নীলু লেখকের কাছে নিন্দিত হয়নি। নীলুর প্রতি লেখকের সহানুভূতি ছিল। তারাশঙ্কর আদর্শরক্ষার তাগিদে কখন কখন মানবিক সম্পর্কের মাধুর্য উপেক্ষা করেছেন। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ রাজনৈতিক কর্মোন্মাদনায় গার্হস্থ্য জীবনের নবলব্ধ সুখের কথাও বিস্মৃত হয়েছে। তখন "শিবনাথের মনের মধ্যে এত লোকের ভিড় দেখিয়া কলরব শুনিয়া ছোট্ট গৌরী সসঙ্কোচে অবগুণ্ঠন টানিয়া যেন কোন অন্ধকার কোণে নিতান্ত অনাদৃতার ন্যায় পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।"[৭])

গান্ধী-আন্দোলনের উপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আস্থাশীল ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভকাল থেকে গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণের মধ্যে দীর্ঘ নয় বছরের ব্যবধান। এই সময় সীমার মধ্যে গান্ধীভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক বাংলা উপন্যাস, রচিত হয়েছে। সব কয়টিই যে যথার্থ অর্থে রাজনৈতিক উপন্যাস তা না বলা গেলেও রাজনৈতিক ভাবাদর্শ পুষ্ট এই উপন্যাসগুলির মধ্যে সে সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

"তারাশঙ্করকেই বাংলার উপন্যাসে গান্ধীভাবের সবচেয়ে প্রতিনিধি-স্থানীয় বলা যায়। প্রথম যৌবনে তিনি গান্ধী আন্দোলনের আবর্তে ঝাঁপিয়েও পড়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁকে রাজনিগ্রহ ভোগ করতে হয়। কলেজে পড়ার ইতি তাতেই ঘটে। তারাশঙ্করের পরবর্তী জীবনের ছাঁচটাও মূলতঃ গান্ধী আদর্শে গঠিত। বস্তুত সুগভীর জাতীয়তাবাদ আর ঐকান্তিক মানবপ্রেমকে যদি গান্ধীভাবের দুই মৌলিক স্তম্ভ মনে করা যায় তবে শিল্পক্ষেত্রে তারই সার্থক প্রতিষ্ঠাকারী হলেন তারাশঙ্কর। তারাশঙ্করের সাহিত্য ধর্মের সঙ্গে জাতীয়তার সম্পর্ক ওতপ্রোত বললেও চলে।"[৯]

সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে তারাশঙ্করের জীবনের কিছু কিছু মিল আছে। যদিও অমিলটাই বেশী। সতীনাথ ভাদুড়ীও গান্ধীজীর ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন; কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ীর কাছে ভাবাবেগ অপেক্ষা ভাবাদর্শটাই বড় ছিল। সেজন্য তিনি ছাত্রজীবন সমাপ্তির পর এবং কর্মজীবনে প্রবেশের পর বেশ পরিণত বয়সেই রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি আগষ্ট আন্দোলনের বিপ্লবের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পরেও তারাশঙ্করের কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। 'ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথের যে উপলব্ধি নিয়ে তারাশঙ্করের রাজনৈতিক চেতনা প্রথম রূপলাভ করেছিল 'কালান্তরে'ও বিশ্বস্ত ভাবে তিনি তাকে অনুসরণ করে গেলেন। এ বিষয়ে তাঁর সর্বকালীন বিশ্বাস এই যে "মানুষের চৈতন্য চলেছে—হিংসা থেকে অহিংসার পথে।"[১০]

অপরপক্ষে সতীনাথ ভাদুড়ী ১৯৪৮-এর গোড়াতেই কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেন। তিনি যে আদর্শ ও বিশ্বাস নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন উত্তর-স্বাধীনতাপর্বে সে আদর্শ তিনি আর খুঁজে পাননি।

তিনি যে স্বাধীনতার জন্য একদিন সংসার ত্যাগ করেছিলেন তার অসারতা উপলব্ধি করতে বেশী সময় লাগেনি। সতীনাথ ভাদুড়ী সত্যানুসন্ধানী আত্মমগ্ন পুরুষ ছিলেন। কি সাহিত্যকর্মে, কি ব্যক্তিজীবনে কোথাও তিনি আপোষ করেননি।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিবাদী মনোভঙ্গী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু তারাশঙ্কর মানুষকে বিচার করেছেন মুখ্যতঃ আবেগের দ্বারা—যুক্তিবিচারের দ্বারা নয়। সমাজ জীবনের সামগ্রিক উন্নতি তাঁর নিশ্চয় কাম্য ছিল কিন্তু সে সমাজ ব্যক্তির উর্ধ্বে নয়। সতীনাথ এই দুইজনের মধ্যবর্তী। তিনি মানুষের বিচারে যেমন আবেগতাড়িত নন, তেমনই প্রখর যুক্তিবাদী বিশ্লেষণও তাঁর স্বভাবধর্ম নয়। তিনি নিজের মগ্নচৈতন্যে যা সত্য বলে জেনেছেন, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাকে অচেনা বলে মনে হয়েছে, গ্রহণে বা বর্জনে উভয়ক্ষেত্রেই তিনি সমান অবিচলিত থেকেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী রচিত তিনখানি রাজনৈতিক উপন্যাস বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায়। রাজনীতির বিভিন্ন দিক তাঁর এই রচনা তিনটির মাধ্যমে পাঠকের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে। লেখক হিসেবে সর্বক্ষেত্রেই সতীনাথ তাঁর সততা ও নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রেখেছেন।

\ সতীনাথ ভাদুড়ীর রাজনৈতিক উপন্যাসের সংখ্যা একাধিক হলেও 'জাগরী' তাঁর সর্বাধিক প্রচারিত ও জনমনবন্দিত রচনা। /

'জাগরী' উপন্যাসের সূত্রেই সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল, বস্তুত বাংলাদেশের সাহিত্য পাঠকের কাছে লেখকের এই একটি উপন্যাসই সমধিক আদৃত এবং পরিচিত হয়ে আছে। পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ী আরও অনেক বেশী মুন্সিয়ানায় সাহিত্যসেবা করে গেলেও 'জাগরী'র রচয়িতা হিসাবেই মূলত তাঁর স্বীকৃতি এ কথা অনস্বীকার্য।

'জাগরী' এমন একটি বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত যা অল্প শক্তিমান লেখকের হাতে অনায়াসেই অন্তঃসারশূন্য ভাবালুতায় পর্যবসিত হতে পারতো। (যে ঘটনা প্রবলভাবে দেশের মনকে আলোড়িত করেছে, যার সম্পর্কে পাঠকের মমত্ববোধ ও সর্বদা জাগরুক তা নিয়ে সার্থক উপন্যাস রচনার উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে বেশী নেই।

এ গ্রন্থ, লেখক তাঁদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন "যে সকল অখ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মীর কর্মনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের বিবরণ জাতীয় ইতিহাসে কোনদিনই লিখিত হইবে না।"

(উপন্যাসের ঘটনাস্থলও তাঁর একান্ত পরিচিত ছিল। কিন্তু এই পরিচিত এবং অকৃত্রিম সহানুভূতি তাঁর নিরাসক্ত সাহিত্যবোধকে কোথাও আচ্ছন্ন করে ফেলেনি। রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিষয়ের সঙ্গে লেখকের যে নিরপেক্ষ নির্লিপ্তির প্রয়োজন সতীনাথ এই উপন্যাসে তা সর্বত্র রক্ষা করে চলেছেন।

বাংলা সাহিত্যে 'জাগরী' একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। জেল বা কংগ্রেস আন্দোলন নিয়েও একাধিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এদের কোনটিই 'জাগরী'র মত সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। তাঁর কারণ লেখকের সত্যনিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা এই উপন্যাসে একান্তভাবে সক্রিয় ছিল।)

১৯৩৯ সালে সতীনাথ ভাদুড়ী সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তার আগেই, ধীরে ধীরে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি চলছিল। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার যখন সারা দেশকে প্লাবিত করে দিচ্ছিল তখন পূর্ণিয়াতে তার ঢেউ এসে লেগেছিল। গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য গোকুলকৃষ্ণ রায় পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেস গড়ে তোলেন। সতীনাথ এই সময় থেকেই খুব সক্রিয়ভাবে না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। স্থানীয় যুবকদের সহায়তায় মদের দোকানে পিকেটিং এবং পূর্ণিয়া জেলা স্কুলেও পিকেটিং করেন। রাজনীতির মত জটিল বিষয় মননশীল সতীনাথকে সহজেই নিবিষ্ট করতে পেরেছিল। তিনি মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ, র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম প্রভৃতি সকল বিষয়ই গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন এবং আত্মস্থ করেছিলেন। কম্যুনিষ্টদলের সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রতি তাঁর যথার্থ সপ্রশংস মনোভাব ছিল। তবে তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন ১৯৩৯ সালে। এই বছরই তিনি সমগ্র পূর্ণিয়া শহরকে বিস্মিত ও সচকিত করে বৈদ্যনাথ চৌধুরীর টিকাপট্টি আশ্রমে কংগ্রেসের সক্রিয়কর্মী হিসাবে যোগদান করেন। শুভার্থী গুরুজনদের আশঙ্কাকে অমূলক প্রতিপন্ন করে সতীনাথ আন্তরিক নিষ্ঠায় জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়ে পূর্ণিয়া শহরের একজন সর্বজনসম্মত সম্মাননীয় নেতারূপে

পরিগণিত হন।

রাজনৈতিক জীবনের সূত্রে সতীনাথ অনেক বেশী সংখ্যক মানুষের সংস্পর্শে আসেন। এই মানুষকে চেনা-জানার অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্যে স্থান পায়।

সতীনাথ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য তিনবার কারাবরণ করেন। প্রথমবার ১৯৪০ সালের জানুয়ারী এবং শেষবার ১৯৪৪ সালে। এ সবাই 'জাগরী'র ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তারাশঙ্করও গান্ধীবাদী কংগ্রেসকর্মী হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনে জেলে গিয়েছিলেন ১৯২৯ সালে এবং তিনিও গ্রামীণ সমাজকে খুব নিবিড় করে দেখেছেন। তাঁর এই দেখার ফল-স্বরূপ একাধিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাজনীতির ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ রাজনৈতিক কর্মীর থেকেও তারাশঙ্করের অনেক বড় পরিচয়—তিনি শিল্পী ছিলেন। তাঁর গভীর শিল্পবোধ এবং নিবিড় জীবনবোধ তাঁকে রাজনীতির বৃত্ত থেকে অনেক স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। তাঁর উপন্যাসে তাই রাজনীতি কখনই অন্তর্নিবিষ্ট হয়নি। সতীনাথ ভাদুড়ীর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তিনি রাজনীতির মধ্যে আত্মমগ্ন থেকেও জীবনধর্মী সাহিত্যসৃষ্টিতে সফল হয়েছেন। সংখ্যার দিক থেকে সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনা নগণ্য হলেও বিশালতা এবং ব্যাপ্তির দিক থেকে তা কম নয়। সমাজের বহু স্তরের মানুষের সমাগমে তাঁর রচনা সম্ভার বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধিশালী হয়েছে।

রাজনীতি সম্পর্কে সতীনাথ তাত্ত্বিক এবং বিশ্লেষণী মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর জানার পরিধি এবং গভীরতা ছিল বিস্ময়কর। তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে গ্রহণ এবং বর্জনে আত্যন্ত সক্রিয় এবং সচেতন ছিলেন। 'জাগরী' তাঁর এই নিবিড় চেতনার সাক্ষ্য বহন করে আছে। জেলের পরিবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মানুষগুলির বাস্তবতার প্রতীতি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। 'জাগরী'র প্রতিটি চরিত্র অলীক কল্পনা যেমন নয়, তেমনি কতকগুলি যান্ত্রিক মতবাদের ধারক মাত্রও নয়। রাজনৈতিক তত্ত্বগত সততার সঙ্গে শিল্পসুষমার এ এক আশ্চর্য সমন্বয়। এই কারণে 'জাগরী' একখানি নিখুঁত রাজনৈতিক উপন্যাস হয়েও একান্তভাবে জীবনরস স্নাত সার্থক সৃষ্টি।

জেলের পরিবেশে মানুষকে অনেক বেশী করে চেনা যায়। 'জাগরী'র চরিত্রগুলি তাই লেখকের একান্তভাবে চেনা ছিল। ফণীশ্বর প্রসাদ রেণু

স্মরণ করেছেন কি ভাবে জাগরীর চরিত্রগুলিকে তিনি নিজের দেখা চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। "'জাগরী'র পাণ্ডুলিপি কেউ পড়েন নি। আমার মাঝে মাঝে খুব হাসি পেত। অনেক ব্যক্তিকে দেখে মনে মনে ভাবতে থাকতাম আপনাদের স্কেচ 'জাগরী'তে আঁকা হয়ে গেছে নিখুঁত ভাবে।"[১১]

পূর্ণিয়া প্রবাসী একটি বাঙ্গালী পরিবারকে কেন্দ্র করে সতীনাথ ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের এক বিশ্বস্ত রূপ'জাগরী'তে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর পটভূমি ও চরিত্র সতীনাথের নিজেরই জীবনের ভগ্নাংশ। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁকে এই অবিস্মরণীয় সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে। অনেকে মনে করেন 'জাগরী'র মাষ্টারমশাই চরিত্রে পুরুলিয়ার সর্বজনশ্রদ্ধের হেডমাষ্টারমশাই নিবারণ দাশগুপ্তের ছায়াপাত ঘটেছে। এছাড়া নিজের পিতার ও পূর্ণিয়া কংগ্রেসের সভাপতি গোকুলকৃষ্ণ রায়ের প্রেরণাও এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল। 'জাগরী'র মা, জেঠাইমা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যেও নিজের মা ও পূর্ণিয়ার সুপরিচত খোকা ডাক্তারের মা কুসুমকুমারী দেবী আত্মগোপন করে আছেন। সতীনাথ নিজে নীলু ও বিলুর মিলিত সত্তা-স্বরূপ ছিলেন।

এই সকল প্রধান চরিত্রগুলি ব্যতীত অন্যান্য অপ্রধান চরিত্র, যেমন হরদা হাটের সর্বজনপরিচিত দুবে, দুবেনী, কারহাগোলার ধনী গৃহস্থ ধনপত যাদব, রহুয়া গ্রামের বাদর বাহরগামিয়ার মা প্রভৃতি সবই চেনা জানা জগৎ থেকে সংগৃহীত।

বীরগাঁও ষ্টেশন, ধানদাহা, কবৈয়া গ্রাম প্রভৃতি স্থানে সতীনাথের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল। সর্বোপরি "এক বৈদ্যুতিক শক্তি সহসা দেশশুদ্ধ লোককে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশাহারা করিয়া দিয়াছে যেখানে যাও, মনে হইতেছে যেন পাগলা গারদের ফাটক খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিক্ষুব্ধ অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা, কি করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না।"[১২] এই অবস্থার সঙ্গে সতীনাথের আত্মিক যোগাযোগ ছিল।

বাংলার মন্বন্তর ছাড়া এমন একটি আলোড়নকারী ঘটনা বাংলার জনজীবনে আর ঘটেনি। তবে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে এই বিক্ষোভ অনেক স্তিমিত ছিল। পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশে এর বিস্তার অনেক গভীর ও ব্যাপক ছিল। বিহারপ্রবাসী রাজনৈতিক কর্মী সতীনাথ ভাদুড়ী তাই দেশের ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ ঘটনাকে তাঁর উপন্যাসের

পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়কে অবলম্বন করে কোনো বিশেষ মতবাদ বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী পথনির্দেশ করা সতীনাথের উদ্দেশ্য ছিল না।

জেলের পরিবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোক যেমন মেহেরচন্দজী, যিনি একমাত্র 'রাষ্ট্র গগনকী দিব্বিয় জিয়োতী' এই গানটির সুর জানেন,—কমরেড সুখলাল যে মুখ দিয়ে চরখার ক্যারিকেচার করে, কিংবা সরল ছেলে সদাশিউ যে প্রত্যহ এক হাজার গজ সুতো কাটে প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী মানুষদেরও সতীনাথ অল্প কয়েকটি আঁচড়ের সাহায্যেই পূর্ণতা দান করেছেন। সতীনাথের সর্বাধিক কৃতিত্ব এই যে 'জাগরী' উপন্যাসটি সর্বাংশে রাজনৈতিক হয়েও দুর্বল বাক্‌সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। ফলে সতীনাথের রাজনীতিবোধের বিরোধী যাঁরা তাঁরাও সানন্দ অভিনন্দনে সাগ্রহে এই উপন্যাসের রসাস্বাদন করেছেন।

'জাগরী'র মত এত বেশী রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে সুদুর্লভ। এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের সম্পর্কের সংঘাত রাজনৈতিক কারণেই সংঘটিত হয়েছে। চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক ভাবনা এদের মর্মগহনে আমূল প্রোথিত ছিল।

'জাগরী' পূর্ণিয়া প্রবাসী এক বাঙ্গালী পরিবারের কাহিনী। গান্ধী-আন্দোলনের ফলস্বরূপ রাজনীতি যখন জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনকেও আবর্তিত করতে লাগল, এই পরিবারটিও সেই সময় সেই বিপুল উদ্দীপনার সামিল হয়। সমগ্র পরিবারটিই এই নবজাগ্রত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে।

পরিবারের কেন্দ্রে একজন আদর্শবাদী স্কুলশিক্ষক গৃহকর্তা ছিলেন। সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দেন। নিজের গৃহে গান্ধী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে সাবরমতী আশ্রমের সকল নিয়ম কানুন সযত্নে পালিত হত। দুটি ছেলের মধ্যে বড়টিকে ইংরাজী না পড়িয়ে কাশীর বিদ্যাপীঠে বিদ্যাশিক্ষা করতে পাঠান। সমগ্র পরিবারটি বারবার কংগ্রেসদলের নির্দেশে কারাবরণ করেছে। বিহার প্রদেশে এই রাষ্ট্রীয় পরিবারটির একটি সম্মানের আসন ছিল। এই সম্মান যে যথার্থ ছিল অকৃত্রিম গান্ধীবাদী 'বাবা' চরিত্রের মহানুভবতাই তা সপ্রমাণ করে। তাঁর জীবনে গান্ধীজী ঈশ্বরের মত পূজনীয় ছিলেন। জীবনের সবচেয়ে ক্রান্তিক্ষণে উপস্থিত হয়েও তিনি গান্ধীজীর নাম স্মরণ

করে মনে সাহস আনবার চেষ্টা করেছেন এবং ঈশ্বর ও গান্ধীজীকে একই সঙ্গে স্মরণ করেছেন : "ভগবান। গান্ধীজী। তোমাদের নাম লইয়াও মনে বল পাইতেছি না। আবার চরকাটি লইয়া বসি। ইহাই আমার শেষ সম্বল, অন্ধের যষ্টি, আমার জপের মালা।"

শুধু তাই নয় চরখার মধ্য দিয়েই তিনি নিজের স্বপ্নের জগতকে প্রত্যক্ষ করেন : "ইহা তো কেবলমাত্র এত হাত সুতো কাটা মাত্র নয়। এখন যে চরকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ইহা যে রামরাজ্য ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র অস্ত্র।"

সতীনাথ ভাদুড়ী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন করতে গিয়ে কোথাও বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করেন নি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যেমন বিপদকালে গান্ধীজীকে স্মরণ করেছেন, তেমনই 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে বিহারের অনগ্রসর এবং অশিক্ষিত সম্প্রদায়ও গান্ধীজীকে দেবতা বলে মনে করেছে। সতীনাথ ভাদুড়ী ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধী-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে উপন্যাস রচনার কাজে লাগিয়ে দেন। কিন্তু নিজে কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নি। এই নৈর্ব্যক্তিকতা সচরাচর রাজনৈতিক উপন্যাসে দেখা যায় না। সতীনাথ ভাদুড়ী একজন যথার্থ শিল্পী ছিলেন। শিল্পীর স্বচ্ছ দৃষ্টি তিনি চরিত্রগুলির অন্তরলোকে নিক্ষেপ করেছেন। যে রামরাজ্য ফিরিয়ে আনবার জন্য 'জাগরী'তে বিলু নীলুর বাবা 'চরখার' আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সেই রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য ঢোঁড়াই 'রামচরিত মানস' গ্রন্থকে নিত্যসঙ্গী করে নিয়েছিল। এই রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার অন্তরায় কোথায় লেখক তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বিলুর বাবার চরিত্রে অনেকে আদর্শবাদিতার আতিশয্য লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁকে অনেকাংশে ছাঁচে গড়া নিষ্প্রাণ প্রতীক মাত্র বলেছেন। কিন্তু আদর্শবাদী হলেও এই পরম গান্ধীভক্ত মানুষটি অন্যান্য মতামত সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। এমন কি নিজদলের ত্রুটি সম্পর্কেও সজাগ ছিলেন : "জেলের মধ্যেও দেখি রামশরণজী আর হরিহরজী জাতের ভিত্তিতে ছোট ছোট উপদল গড়িবার চেষ্টা করেন, বাহিরে গিয়াও যাহাতে তাঁহাদের সর্দারগিরি বজায় থাকে। আমাদের দেশে স্বরাজ কি কখনও হইবে, এক এক সময় ঘৃণা ধরিয়া যায়। নীলু বিলুর দলগুলি যাহা বলে তার সবই

ভুল নয়।”

কিন্তু তবুও নিজের মত ও পথের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা ছিল। নিজের দেশের ঐতিহ্যের জন্য গর্বমিশ্রিত সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব ছিল। দেশ-বিদেশের ইতিহাসের কথা পড়িয়াও নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারানোর কোন কারণ খুঁজে পাননি। সুগভীর বিশ্বাসে আত্মস্থ ছিলেন বলেই নিজের মতামতের জন্য কোন দ্বিধা তাঁর ছিল না। অন্য মতাবলম্বীর উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য ছিল এই : “দেশ বিদেশের ইতিহাসের কথা আমরাও পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া শিবাজীর গৌরবকথা ভুলিয়া যাই নাই। বিবেকানন্দের বাণী ছাড়িয়া মার্কসের বুলির ফাঁদে পড়ি নাই। মহাত্মাজীর অপেক্ষা ষ্ট্যালিনকে বড় বলিয়া মনে করিতে পারি নাই।”

বাংলা সাহিত্যে এমন এক মহৎপ্রাণ চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে সতীনাথ কোথাও কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। আদর্শবাদী হলেও বিলুর বাবা জীবন-বিমুখ ছিলেন না। তাঁর নিজের স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে এক শিক্ষাভিমানী, নিজের মতবাদে অবিচলিত, একটি পরিবারের গৃহস্বামীকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি।

আঙ্গিকের অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও এই চরিত্রটি যে এত জীবন্ত হতে পেরেছে তার কারণ লেখকের নিবিড় আন্তরিকতা সর্বদা সজাগ ও সক্রিয় ছিল। বাবা শুধু নিজের জবানীতেই নয় অন্যান্যদের মাধ্যমেও পাঠকের কাছে ব্যক্ত হন। বিলুর মা'র অভিযোগে জানতে পারা যায় পরিবারে স্ত্রীর কোন নিজস্ব মতামতের ক্ষেত্র ছিল না : “তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য সব ছেড়েছ সত্য কিন্তু আমাকে তো একটুও স্বাধীনতা দাওনি। কতদিন ভেবেছি যে ছেলেরা বড় হলে এ কথা একদিন ছেলেদের বলব।”

মায়ের অভিমানভরা এই উক্তির মধ্য দিয়ে বাবার চরিত্রটি আরও সম্পূর্ণতা পেয়েছে। অথচ তিনি উদাসীন ছিলেন না। পারিবারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াও পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের যে একটি বিশেষ মূল্য আছে তাও তিনি অনুভব করতেন। চিরকাল শিক্ষকতা করেছেন তাই ছেলেদের থেকে তিনি বরাবরই একটু সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রেখেছেন। অথচ ছেলেদের জন্য তাঁর মমত্ববোধ যে কত প্রবল ছিল, আপার ডিভিসন সেলে বিলুর ফাঁসির আগের দিন রাত্রে তাঁর আকুলতাই তা সপ্রমাণ করে। বিলুর জন্য উদ্বেগের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর জন্যও তাঁর নিবিড় সমমর্মিতা প্রকাশ

পেয়েছে। ঈশ্বরের কাছে তিনি স্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করেছেন, ছেলেকে দেখবার জন্য আর পাঁচজন পিতার মতই ব্যাকুল হয়েছেন, এমন কি ছেলের জন্য নিজের নীতি-আদর্শ সাময়িক কালের জন্য বিস্মৃত হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। /

নিলু বিলুর মা তাদের পিতার মতই পুত্রের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝতে পারেন না। স্বামীর সকল প্রকার কাজে-কর্মে সাহায্য করা এবং তাঁর মতের বিরুদ্ধাচরণ না করাই স্ত্রীর কর্তব্য—এই ধারণার মধ্যেই তিনি বড় হয়েছেন। স্বামীর পথই তাঁর পথ এই আদর্শেই তিনি বিশ্বাস করেন। গান্ধীবাদের তাত্ত্বিক মর্ম তিনি বোঝেন না। তাঁর স্বামী সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে গান্ধীজীর আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও সরল বিশ্বাসে স্বামীর সঙ্গে রাজনীতির বন্ধুর পথে এসে উপস্থিত হয়েছেন। স্বাভাবিক সংসারজীবন পরিত্যাগ করে দেশমাতৃকার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করলেও বারে বারেই তাঁর পূর্বের সংসার জীবনের কথাই মনে পড়েছে। ছেলেদের সংসারজীবনে প্রতিষ্ঠিত করে বৃদ্ধ বয়সে নাতি-নাত্‌নিদের নিয়ে একটি সুখী পরিবারের মধ্যে থেকে জীবনের শেষ কটি দিন আনন্দে কাটাবেন; এই সাধ তাঁর ছিল। রাজনীতির ঘূর্ণিঝড়ে তাঁর সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল। মায়ের জীবনের এই বেদনা এবং শূন্যতাবোধ উপন্যাসটিতে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

ঔপন্যাসিকরূপে সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রধান কৃতিত্ব এই যে, রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার মধ্যেও চরিত্রগুলির পূর্ণতর পরিচয় দানের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। 'জাগরী' উপন্যাসে রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধ আছে। স্মৃতি চারণার মধ্য দিয়ে কাহিনী বর্ণিত হলেও সেই কাহিনীতে উত্তেজনা, সংঘাত এবং নাটকীয় উপাদানের অভাব নেই। লেখক একদিকে চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে, অপর দিকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় কখনই সমতা হারিয়ে ফেলেনি। মায়ের চরিত্রটি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তিনি অসাধারণ পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এমন নিখুঁত পারিবারিক চিত্র সচরাচর বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় না, বিশেষ করে রাজনৈতিক ত নয়ই। 'আওরৎ কিতা'য় বসে বিলুর মা ফাঁসির পূর্বরাত্রে সকলের মতই আসন্ন ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্য উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছেন। এই চরম মুহূর্তে বিলুর মা

ভাবছেন তাঁর পুত্রের বিবাহের কথা। বিলু দেশের স্বাধীনতার লড়ায়ে অংশ নিয়ে বীরের মত দেশমাতৃকার চরণে শহীদ হতে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় তিনি ছেলের দেশমাতৃকার চরণে জীবন উৎসর্গের জন্য গর্বিত না হয়ে, জীবনে যা হয়নি, যা হতে পারে না, কিন্তু তাই হলে ছেলের ভাল হত কি মন্দ হত তারই কথা ভাবছেন। সরস্বতী নামে মিডিল পাশ করা এক হিন্দুস্থানী মেয়ের সঙ্গে বিলুর বিয়ের কথা হয়েছিল, কিন্তু তাতে বিলুর মা রাজী হননি। বিলুর প্রতি অবাঙ্গালী কিশোরী সরস্বতীর নাতিব্যক্ত অনুরাগ ছিল। শেষ পর্যন্ত বিলুর সঙ্গে সরস্বতীর বিয়ে হয় নি। কিন্তু যদি তাদের বিয়ে হত তাহলে কি বিলুর মা খুশী হতে পারতেন? সতীনাথ ভাদুড়ী বিলুর মা'র প্রতিক্রিয়া সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন: "আমি বলব সরস্বতী তো ওরা বলবে সরসোয়াতী। সরস্বতী শুক্তো রাঁধতে জানে? গোকুল পিঠের নাম শুনেছে? বিলু অড়হরের ডাল পছন্দ করে না, আর ওরা অড়হরের ডাল ছাড়া আর অন্য কোনো ডাল ভালবাসে না।"

বিলু '৪২-এর আন্দোলনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে ফাঁসির আসামী। বিলুর মা স্বামীর সঙ্গে রাজনীতিতে যোগদান করার অপরাধে একই জেলের 'আওরৎ কিতায়' বন্দী হয়ে আছেন। বিলুর অপরাধের গুরুত্ব তিনি জানেন; তিনি বিলুর প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন, তাঁরই আর এক ছেলে নিলু দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য বিলুর আজ ফাঁসি হতে চলেছে, —মা হয়ে একথা তিনি বিশ্বাস করেন কি করে? একদিকে এক সন্তানের আসন্ন বিপদ, অপর দিকে আর এক সন্তানের প্রতি অবিশ্বাসের সূচনা এই দুই-এর দ্বন্দ্বে আন্দোলিত বিলুর মার চরিত্রটি লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন: "আমি রাজ্যসুদ্ধ লোকের মা; জেলার সব কংগ্রেস-কর্মীর মা, আমার তো বিশ্বজোড়া ছেলে। কিন্তু মন যে বিলু নীলুর উপর পড়ে থাকে। এদের ছাড়া অন্য কোনো ছেলের মা হতে আমি চাই নি।"

বিলু নীলুর মা, গান্ধীবাদী পরম শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই-এর স্ত্রী, জেলার ছোটবড় সকলেই তাঁকে মাতৃজ্ঞানে সম্মান করে, কিন্তু তিনি বিলু নীলুর মা হয়েই থাকতে চান। এমন সহজ এবং অকপট স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে মায়ের চরিত্রটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসধারায় 'জাগরী'র স্থান সর্বাগ্রে, একথা স্বীকার করলেও 'জাগরী' যে একেবারে আদর্শবাদ, রোমান্টিকতা এবং ভাবাবেগ

বর্জিত সে কথা বলা যায় না। সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনাবলীর মধ্যে 'জাগরী' উপন্যাসেই তাঁর শিল্প-শক্তির সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে তাও নয়, কিন্তু বিতর্কিত রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে সুগভীর জীবনদৃষ্টির এমন সুসম মিশ্রণ সাধারণতঃ কোন রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় না। লেখক প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও কোন চরিত্রকে রাজনীতির কোন বিশেষ মতাদর্শের ভাষ্যকার রূপে চিত্রিত করেন নি। মার্কসীয় সমাজ দর্শনের সঙ্গে গান্ধীবাদের মৌলিক পার্থক্য আছে; নীলু এবং বিলু পরস্পর বিরোধী দুই মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাসী হলেও লেখক কোন বিশেষ মতবাদ প্রচারের জন্য কারো পক্ষ সমর্থন করেন নি।

একথা সত্য যে গ্রন্থটির মধ্যে নীলুর চরিত্রটি আংশিকভাবে অস্পষ্ট থেকে গেছে। নীলু কম্যুনিষ্ট দলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তার কথায় এবং কাজে সব সময় সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। নীলু অপেক্ষা বিলু যে শ্রেষ্ঠ এ বিশ্বাস বিলুর মার ছিল, তিনি বিলুর সঙ্গে নীলুর তুলনা করে বলেছেন "কিসে আর কিসে।" নীলুর এমন কোন আচরণ লেখক পূর্বে দেখান নি যার জন্যে নীলু মায়ের কাছে এতটা হেয় হতে পারে, কিন্তু বিলুর ফাঁসির জন্য নীলুই যে দায়ী এ সত্যও তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারেন নি। নীলুকে যদি তিনি হেয় জ্ঞানই করতেন তাহলে বিলুর ফাঁসির জন্য যে নীলুই দায়ী এ ধারণায় আসতে তাঁর কোন দ্বিধা থাকতো না। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে যে সন্তান দাঁড়িয়ে থাকে, জননীর চোখে অন্যান্য সন্তানের থেকে সেই শ্রেষ্ঠ হয়, বিলুকে নীলুর থেকে বেশী বড় করে দেখার এটাই কারণ। নীলু, বিলুর মায়ের আচরণের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও নীলুর আচরণে কিছুটা অসঙ্গতি থেকে গেছে। ছেলেবেলায় নীলু এবং বিলু দু-ভাই একবার সাহেবদের ক্লাবের দেওয়ালে চড়ার অপরাধে ধরা পড়ে। তখন সাহেবরা তাদের নিজেদের থুতু চাটবার আদেশ দিয়েছিল, বিলু সাহেবদের আদেশ অগ্রাহ্য করার মত চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখালেও নীলু কিন্তু সে আদেশ অগ্রাহ্য করেনি, এতে নীলুর চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই কাপুরুষ নীলুই পরবর্তী কালে কম্যুনিষ্ট দলের সদস্য হয়ে কেবল পার্টির মতাদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার জন্য দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ী রাজনৈতিক জীবনে কম্যুনিষ্ট ভাবাদর্শের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। এই কারণে অনেকের মনে এই ধারণাই আসতে পারে যে তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবেই নীলুকে হেয় করে অঙ্কিত করেছেন,

কেবল রাজনৈতিক বিশ্বাসের উপর নিজের অনাস্থা প্রকাশের জন্য ; লেখকের উদ্দেশ্য তাই হলে, তিনি যে শিল্পসত্যকে হত্যা করেছেন একথাই প্রমাণ হয়। গ্রন্থটি সমগ্রভাবে আলোচনা করলে আমরা লক্ষ্য করি যে, নীলুর চরিত্রের অস্পষ্টতা নীলুর রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি লেখকের অশ্রদ্ধাজনিত নয়। নীলুর চরিত্রের পরস্পর বিরোধী কাজই তার চারিত্রিক বিশেষত্ব, একথা বোঝানই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। •

বিলু নীলুর বাবা, যিনি গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে গান্ধীজীর মত সহজ সরল অনাড়ম্বর আশ্রমিক জীবন যাপন করতেন তিনিও নিজেদের পার্টির মধ্যে দুর্নীতি এবং পার্টির সদস্যদের নীতিহীনতাকে সমালোচনা করতেন, পক্ষান্তরে নীলুদের পার্টির সদস্যদের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতাকে প্রসংশা করতেন : "নীলু বিলুর কী পড়ার ঝোঁক ? আর আমাদের পন্থার লোকেদের ? তাহাদের কথা আর বলিয়া কী হইবে ? আমি একখানা বই লইয়া বসিলেই বলে, মাষ্টার সাহেব আবার ইস্তিহান দিবেন নাকি ?"

'জাগরী' উপন্যাসে লেখক নীলুর চরিত্র পরিকল্পনাতেই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রথমতঃ নীলু যে রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করে তাতে দেশের যথার্থ স্বাধীনতার অর্থ বিদেশী শক্তির হাত থেকে কেবল ক্ষমতা দখল নয়, সেই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল সংস্কার করে শোষণ-মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করাও তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ। এই দিক থেকে বিচার করলে নীলুর বাবা এবং তার দাদা উভয়ই তার কাজের সাফল্যের পথের অন্তরায়। ফলে একদিকে পারিবারিক সম্পর্কের নিগূঢ় বন্ধন, অপরদিকে তার জীবনের আদর্শ—উভয়ের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। নীলু যে পরিবারের মধ্যে মানুষ হয়েছে সেই পরিবারের সকলেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এক সময় নীলুও তার দাদার রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তার রাজনীতির আদর্শের পরিবর্তন ঘটে। নীলু যে পথে এগিয়ে যায় সেই পথ তার বাবা মা দাদার পথ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেখক যদি নিরপেক্ষ না থাকতে পারতেন, লেখকের যদি সামান্য সংযমের অভাব ঘটতো, তাহলে নীলু সম্পূর্ণ 'খল' চরিত্রে পরিণত হয়ে যেত। লেখক নীলুর অধ্যায়টির উপরও সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নীলু বিলুর বাবা,

সব সময়ই বিলুর সঙ্গে নীলুর নামও উচ্চারণ করতেন। নীলু তার দাদা বিলুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেও তিনি নীলুকে কখনই ছোট করে দেখেন নি, উপরন্তু নীলুর হঠকারিতার সমর্থন করেছেন: "আর নীলু, সেই বা কম কিসে? তার কঠোর কর্তব্য জ্ঞানের সম্মুখে স্নেহ, ভালোবাসা আত্মীয়তার দাবি, জনমত অত আদরের দাদা সব তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।" সাহিত্যে আদর্শ-বাদী মানুষের অভাব নেই কিন্তু আদর্শবাদিতার সঙ্গে মানবীয় স্বভাব-গুণান্বিত মানুষের চিত্রাঙ্কন সহজলভ্য নয়।

'জাগরী' উপন্যাসে রাজনীতি কেবল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়নি অথবা মতবাদের সুউচ্চ গ্রামে কাহিনীর সুরও বাঁধা নেই, তবুও চরিত্রগুলির মানসিক গঠনে রাজনীতি সক্রিয় থেকেছে সেইজন্যই গান্ধীজীর ভাবাদর্শে বিশ্বাসী নীলুর বাবা বিলুর ফাঁসির পূর্বমুহূর্তে প্রার্থনা করেছেন: "ভগবান। মহাত্মাজী। বিলুর মাকে আঘাত সহ্য করিবার শক্তি দাও, নীলুর মনে বল দাও, বিলুর আত্মাকে শান্তি দাও।" সকলের জন্য প্রার্থনা করলেও নিজের কথা একবারও ভাবেন নি, কারণ তিনি মানসিক আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা, তাঁর জীবনাচরণের মধ্যেই অর্জন করেছিলেন। বিলুর বাবা তাঁর জীবনা-চরণের সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শকে এক করে মিলিয়ে নিতে পারলেও নীলু-বিলুর মা'র পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। সতীনাথ ভাদুড়ী প্রতিটি চরিত্র চিত্রণের সময় চরিত্রদের কার্যাবলীর সম্ভাব্যতার সম্পর্কে অতি-সচেতন ছিলেন। বিলু-নীলুর বাবা গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় সংসার বিবাগী হয়েছিলেন। গান্ধী এবং ভগবানকে একাসনে বসালেও তিনি গান্ধীজীর রাজনৈতিক আদর্শের অনুগত ছিলেন। তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দেবতা মনে করতেন না। দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করাতে হলে ব্যক্তিস্বার্থের কথা চিন্তা করলে চলে না, এজন্যই তিনি বিলুর ফাঁসির জন্য যতটা নিজে ভেঙ্গে পড়ছিলেন, নীলু এবং বিলুর মার জন্য তার থেকে বেশী কাতর হয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে এই আচরণ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর রাজনীতির আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। নারীর সংস্কারানুযায়ী তিনি স্বামীর অনুগামিনী হয়ে ছিলেন। ঈশ্বর বিশ্বাসী বিলুর মার কাছে গান্ধীজী ভগবানেরই অবতার, তাঁর সেবা করতে নিজের সংসার ছারখার হয়ে যাওয়ার জন্য সেই বিশ্বাসে আঘাত লেগেছিল, এইজন্য তিনি গান্ধীজীর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ এনেছেন:

া, তুমি আমার একি করলে? তুমি আমাদের একেবারে পথের ভিখিরি করে ছেড়েছ; সত্যিকারের ভিখিরি। তুমি মাসের শেষে হাতে তুলে কিছু দেবে, তবে আমরা চারটি খেতে পাব। নিজের ঠাকুর দেবতা ছেড়ে, তোমার পূজো করেছি তোমার জন্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়েছি, হাসতে ভুলেছি।" নীলু বিলুর মা'র দৃঢ় বিশ্বাস তিনি যদি তাঁর ইষ্টদেবতার থেকে গান্ধীজীকে বড় না মনে করতেন তাহলে তাঁর সংসারের এই বিপর্যয় আসতো না। তাই চরম বিপদের মুহূর্তে শরণাগতির জন্য নিজের চিরাভ্যস্ত দেবতাকেই স্মরণ করেছেন: "মা তুমি তো জাগ্রতা দেবী, বিলু তো একরকম তোমারই ছেলে, ওকে একবার বাঁচিয়ে দাও। আর আমি তোমার কাছে কোনো দোষ করব না। আর আমি গান্ধীজীকে তোমার চাইতে বড় মনে করব না।" একই পরিস্থিতিতে বিলুর মা এবং বাবার বিপরীতধর্মী আচরণের মধ্যে দুটি চরিত্রই অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

আধুনিক উপন্যাসে চেতনা-প্রবাহ-রীতি বলতে যা বোঝায় তারই প্রথম এবং সার্থক প্রয়োগ 'জাগরী' উপন্যাসে দেখা যায়। এই রীতিতে ঘটনা অপেক্ষা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রতি বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয় বলে অনেক সময় ঘটনার গতি ব্যাহত হয়। 'জাগরী' রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মূলতঃ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস এ ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয়। বিলুর রাজনৈতিক কারণে ফাঁসির আসামী না হয়ে যদি অন্য কোন কারণে ফাঁসির আসামী হোত তাহলেও বিলুর পরিবারের অপর সদস্যদের মানসিক প্রতিক্রিয়া অনুরূপভাবে উপন্যাসে দেখানো সম্ভব ছিল। সতীনাথ ভাদুড়ীর কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি 'জাগরী' উপন্যাসের রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে কাহিনীর প্রেক্ষাপটরূপে ব্যবহার করেন নি, দেশের সমগ্র রাজনৈতিক ঘটনাস্রোতের সঙ্গে এক পরিবারের জীবনধারাকে মিশিয়ে দিয়ে অসাধারণ জীবনধর্মী উপন্যাস করে তুলেছেন। স্মৃতিচারণ এবং আত্মকথনের সূত্রে বিধৃত হলেও কাহিনীর গতি ব্যাহত হয়নি, উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বেগবান হয়ে উঠেছে। 'জাগরী'র কাহিনীর মধ্যে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমগ্র ভারতবর্ষ যখন কম্পিত তখন বিলুর বাবা সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেসী কাজে যোগ দেন। পূর্ণিয়া

জেলায় আশ্রম তৈরী করে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর স্ত্রী গান্ধী-ভাবের তাত্ত্বিক মর্ম না বুঝলেও স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণীরূপে একই পথের অনুগামিনী হন। ছেলেদের সংসার-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে, নাতি-নাতনী নিয়ে শেষ জীবনে সংসারের মধ্যমণি হয়ে থাকবেন, তাঁর এই বাসনা থাকলেও স্বামীর স্বার্থে সেই সাধ-আহ্লাদ পরিত্যাগ করেন। বিলু-নীলু দুই ভাই, বাল্যকাল থেকেই গান্ধী আশ্রমের পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিল। বিলুকে ভারতীয় আদর্শের প্রতি আস্থাবান করার জন্য কাশী বিদ্যাপীঠে সংস্কৃত অধ্যায়ন করতে পাঠানো হয়েছিল। বিলু এবং নীলু বাল্যকালে পিতার মনোমত কংগ্রেসের ভাবধারাতেই বড় হয়ে উঠেছিল। বিরোধ সৃষ্টি হল বয়ঃপ্রাপ্তির পর। কংগ্রেসের আন্দোলন নির্ভুল নয়, এর মধ্যে অনেক গলদ আছে, এই সত্য আবিষ্কারের পর সমাজতন্ত্রী আদর্শের প্রতি আস্থাবান হয়ে তারা কংগ্রেস স্যোসালিষ্ট পার্টিতে যোগ দিল। দু-ভাই একত্রিত থেকে কংগ্রেসের মধ্য থেকেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পে অটুট ছিল। এর জন্য তাদের অনেকবার কারাবাস করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ভারতীয় রাজনীতিতে এক পরিবর্তন দেখা দিল। কারাবাস কালে নীলু কম্যুনিষ্টদের সংস্পর্শে এসে তাদের মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক পরিত্যাগ করলো, নীলুর ভাই বিলু কিন্তু সমাজতন্ত্রী দলেই থেকে গেল। নীলুর সাম্যবাদী মতাদর্শ গ্রহণের ফলে দাদার সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বাভাবিক কারণেই ফাটল দেখা দিল। নীলু সমাজতন্ত্রী দল ত্যাগ করলেও বিলু ততদিনে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার একজন গণ্যমান্য নেতা হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রীর আদর্শকে নীলু 'পাতি বুর্জোয়া' আদর্শ ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। সমাজতন্ত্রীর নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা আসতে পারে তাতে কেবল শাসকই পালটাবে শোষণের ধারা অব্যাহত থাকবে, এই বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থাকার জন্য নীলু ক্রমশই তার দাদার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। অবস্থা চরম পর্যায়ে এল যখন স্যোসালিষ্টদের নেতৃত্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিংসাত্মক আকার ধারণ করলো। রেল লাইন উপড়ানো, টেলিগ্রাফের তার কাটা, বিকল্প সরকার গঠন, থানা দখল, ইত্যাদি বিধ্বংসী কাজ গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনকে চাপা দিয়ে সহিংস আন্দোলনের আকার ধারণ করলো। গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' নীতিকে স্যোসালিষ্টরা

নিজেদের মনোমত রূপ দিয়ে আন্দোলনের তীব্রতাকে বাড়িয়ে তুললো। কম্যুনিষ্টদের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ হওয়ার জন্য তারা সরাসরি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করলো না। বিলু এবং নীলু পরস্পর বিরোধী দুটি রাজনৈতিক শিবিরে অবস্থান করার জন্য তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকাই আর সম্ভব ছিল না। বিলু পূর্ণিয়া জেলা আগষ্ট আন্দোলন-গঠনের একজন গণ্যমান্য নেতা ; নীলুর বিশ্বাসে পার্টিই সব কিছুর ঊর্ধ্বে। তার রাজনৈতিক দলীয় বিশ্বাস যে সকল আবেগের ঊর্ধ্বে এই আত্ম-অহং-কারে রাজসাক্ষী হয়ে তার দাদাকেই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল। হিংসাত্মক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বদানের অপরাধে বিচারে বিলুর ফাঁসির আদেশ হল। যে জেলে বিলু ফাঁসির জন্য অপেক্ষমান ছিল সেইখানেই ভিন্ন ভিন্ন 'সেলে' তার বাবা-মা'ও বন্দী ছিলেন। নীলু জেল গেটে দাদার মৃতদেহ সৎকারের জন্য উপস্থিত ছিল। ফাঁসির পূর্বরাত্রে এই চারজনের স্মৃতি চারণার মধ্যে 'জাগরীর' আখ্যানবস্তু বিস্তার লাভ করেছে। শেষ পর্যন্ত বিলুর ফাঁসি আর হয়নি, সরকারী হুকুমে তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ স্থগিত হয়ে যায়। \'জাগরী' উপন্যাসে প্রধান পাত্রপাত্রী চারজন। এদের মধ্যে বিলুই প্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। বিলুর প্রতি লেখকেরও যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। বিলুর চরিত্রের মধ্যেও বিশেষ কোন জটিলতা নেই, কেবল বয়ঃপ্রাপ্তির পর পিতার রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে তার বিশ্বাসের অমিল হয় এই কারণে যে, সে কংগ্রেস স্যোসালিষ্ট দলে যোগদান করেছিল। তার ধারণায় এই পথেই দেশের স্বাধীনতা আসবে। নীলুর জন্য তার ফাঁসির আদেশ হলেও বিলু তার ভাইকে দোষারোপ করেনি, বরং বাল্য এবং কৈশোরের সুখস্মৃতিগুলি মনে করেছে। বিলু ভাবপ্রবণ ছিল ; আবেগ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাও প্রসংশনীয় ছিল। নীলুর চরিত্র এর বিপরীত।

বিলুর ধারণায় : "নীলুর মন ও দৃষ্টিভঙ্গি স্থূল। কলমতুলিকা তাহার জন্য নয়। সে বোঝে কায়িক পরিশ্রমের কথা, হাতুড়ি কাস্তে শাবলের কথা আর তার হাতে শোভা পায় ইস্পাতের ক্ষুরধার অসি—পরশুরামের কুঠারের মতো নিষ্করুণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ।"/

কাহিনীর মধ্যে নীলুর চরিত্রটিই বিতর্কিত। তার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধটিও দেখানো হয়েছে। লেখক ব্যক্তিগত জীবনে ভিন্ন

রাজনীতিতে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য নীলুর চরিত্রটি মধ্য দিয়ে তাঁর উষ্মা প্রকাশিত হয়েছে এমন ধারণা হওয়াও অসম্ভব নয়। নীলু একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সুতরাং তার কোনো হঠকারিতার জন্য সমগ্র ভাবে সেই দলের রাজনৈতিক বিশ্বাসের উপর লেখকের অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে এমন ধারণা করাও সঙ্গত নয়। লেখক অত্যন্ত সচেতন এবং সহানুভূতির সঙ্গে নীলুর চরিত্রটির পরিকল্পনা করেছেন। তিনি নীলুকে দলীয় মুখপাত্র রূপে চিত্রিত করেন নি। নীলুর মধ্যে পরস্পর বিরোধী সত্তা যুগপৎ সক্রিয় ছিল। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করার মত মানসিক স্থৈর্যের অভাবের জন্য নীলু মনের দিক দিয়ে কোনোদিনই সবল ছিল না। দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া এবং পরমুহূর্তেই তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া, বারে বারে রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তন তার চরিত্রের এই দুর্বলতাই প্রমাণ করে। দাদার প্রতি একদিকে তার যেমন শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ছিল, অপরদিকে দাদার সুখ্যাতি তার অবচেতন মনে কিছুটা ঈর্ষার ভাব সৃষ্টি করেছিল। নীলুর মধ্যে নানা জটিলতা থাকার জন্য নীলুর চরিত্রটি পাঠকের কাছে কিছুটা অস্পষ্ট হলেও লেখক নীলুকে সহানুভূতির সঙ্গেই চিত্রিত করেছেন। নীলুর আচরণের মধ্যে অসংগতি থাকলেও লেখকের ব্যক্তিগত মতামত নীলুর চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে এ ধারণা করা সঙ্গত নয়। সতীনাথ ভাদুড়ী রাজনীতির মত বিতর্কিত বিষয়েও তাঁর শিল্পীসত্তাকে অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিলেন। অন্তর্মুখী কাহিনীতে বাইরের জগতের ব্যাপ্তি, চরিত্রের মধ্যে রাজনৈতিক ভাষ্যের সাঙ্গীকরণ, প্রতিটি চরিত্রের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা, বহু মানুষের মিছিলে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে নৈপুণ্য, সর্বোপরি ভাষার সাবলীলতায় কখনও মনে হয় না যে এটি লেখকের প্রথম উপন্যাস। বাংলা ভাষায় রচিত রাজনৈতিক উপন্যাসের তালিকায় 'জাগরী' যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন, সে কথা অবশ্য স্বীকার্য। /

রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়েই সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী' বাংলাভাষায় স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত একটি সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের সূত্রেই সতীনাথ ভাদুড়ীর বাংলা পাঠক মহলে পরিচিত হন। 'জাগরী'র মত জনপ্রিয়তা না পেলেও সতীনাথ ভাদুড়ীর দুখণ্ডে

প্রকাশিত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (প্রথম চরণ বা খণ্ড ১৩৫৬, দ্বিতীয় চরণ বা খণ্ড ১৩৫৮) উপন্যাসটির মধ্যেই লেখকের অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসটি 'জাগরী' অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট মানের। জনমানসে রাজনৈতিক চেতনার এমন সূক্ষ্ম এবং স্বাভাবিক বিকাশ সচরাচর কোন গ্রন্থে চোখে পড়ে না। লেখক কোন রাজনৈতিক মতবাদ বা রাজনীতিবিদ্‌দের ক্রিয়াকলাপ গ্রন্থে আরোপ করেন নি। জীবনযুদ্ধের প্রয়োজনেই অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীনতা-পূর্ব রাজনৈতিক আন্দোলনে সতীনাথ ভাদুড়ী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিতে এক রাষ্ট্রীয় পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শী সদস্যদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধের মধ্য দিয়ে 'জাগরী' উপন্যাসে এক পারিবারিক কাহিনী রচনা করেছেন। অপর পক্ষে 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' বিহারের নিম্নতর সমাজের তাৎমাটুলির ঢোঁড়াইকে দীর্ঘ জীবন পরিক্রমার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বাতাবরণে নিয়ে এসেছেন। গান্ধীভাবনাপুষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলন সমাজের অন্ত্যজ মানুষদের কেমন ভাবে স্পর্শ করেছিল তারই পরিচয় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে পাওয়া যায়। বিহারের গ্রামসমাজের জাতিভেদ, গোষ্ঠীকলহ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শোষণ, সরকারী আমলা, আইন আদালতে পুলিশের শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টা, ভূমিহীন কৃষকদের দুরবস্থা ছাড়াও মানব মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির স্বচ্ছ প্রকাশ 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের দুটি খণ্ডে বিধৃত হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবনাপুষ্ট আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এমন বিস্তৃত জীবনধর্মী উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে সচরাচর দেখা যায় না। এই গ্রন্থটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ঢোঁড়াই এর ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্বদেশ-চেতনাই ছাপিয়ে উঠেছে। কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই কেবল স্বাধিকার রক্ষার তাগিদেই ঢোঁড়াই রাজনৈতিক জগতে এসেছে, তার রাজনীতি তার জীবনের বাইরে নয়, জীবনে স্বাধীনতার স্বার্থেই সে রাজনৈতিক কর্মী হয়েছে, গ্রাম্য সমাজের নানা অসঙ্গতিই তাকে স্বাধিকার রক্ষায় চেতনা এনে দিয়েছে। লেখক তার উপর কোন মতবাদ আরোপ করেন নি, ঢোঁড়াই এর জাগরণ অবিচারের বিরুদ্ধে জনমানসের স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ ; এই কারণে

অন্যান্য রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির সঙ্গে ঢোঁড়াই-এর পার্থক্য সহজ-দৃষ্ট।

মহাকাব্যোপম উপন্যাস বলতে যা বোঝায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসকে সেই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। ঢোঁড়াই-এর রাজনৈতিক কর্মজীবনে উত্তরণ কাহিনীর বিষয়বস্তু হলেও আলোচ্য উপন্যাসে বিহারের জনপদের এক বিস্তৃত অংশের বহু মানুষের বিচিত্র জীবনেতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাস রচনায় লেখক কেবল ঔপন্যাসিকের ভূমিকাই পালন করেন নি, সেই সঙ্গে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্ [Social Anthropologist]-এর দৃষ্টি দিয়েই একটি বিশেষ অঞ্চলের সামগ্রিক পরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি গবেষকের বিশ্লেষণী ক্ষমতায় জাতি-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ও আচার-আচরণের বাস্তবানুগ ছবি তুলে ধরেছেন। এই কারণে দেশপ্রেমের আবেগের ঘূর্ণাবর্তে, আদর্শবাদের দুর্লঙ্ঘ্য শিখর-অভিযানে উপন্যাসটি পথভ্রষ্ট হয়নি, মানব প্রকৃতির সার্থক রূপায়ণের মধ্যে জীবনের চিরন্তন মূল্য প্রকাশ করেছে। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' রাজনৈতিক উপন্যাস হয়েও উপন্যাসের সকল গুণ এর মধ্যে বর্তমান আছে, মানব প্রকৃতির স্বাধীন এবং স্বাভাবিক বিকাশ, মতবাদের ষ্টীমরোলারের চাপে নিষ্পেষিত হয়ে যায়নি। যদিও লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী এই উপন্যাসে ঢোঁড়াইকে এ-যুগের রামচন্দ্রের আদলে তৈরী করতে চেয়েছিলেন, তুলসীদাসের রামচরিত মানসের অনুকরণে তাঁর উপন্যাসের নামকরণ 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' করেছেন এবং রামচরিত মানস থেকে বহু পদের যত্রতত্র উদ্ধৃতি দিয়েছেন; তবুও একথা স্বীকার্য যে লেখকের এই পরিকল্পনা কাহিনীর বহিরঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করলেও আত্মধর্মে এটি একটি জীবনরস সমৃদ্ধ সার্থক উপন্যাস হয়ে উঠেছে। গান্ধীজীর ভাবাদর্শের এমন সাহিত্যিক রূপায়ণ ভারতীয় সাহিত্যে সহজলভ্য নয়। ঢোঁড়াই এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র, তারই মানস দর্পণে একটি জনপদের লোক-জন আচার-বিচারসহ সে-সময়কার রাজনৈতিক বাতাবরণ প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

জিরানিয়া, বিহারের এক মফঃস্বল শহর। তার থেকে চার মাইল দূরে তাৎমাটুলি: "বোধহয় তাৎমারা জাতে তাঁতি। তারা যখন প্রথম আসে, তখন খালি একজনের কাছে ছিল একটা ভাঙাচোরা গোছের গামছা বোনার তাঁত। দ্বারভাঙ্গা জেলার রোশরা গ্রামের কাছ থেকে অনেকদিন আগে এখানে এসেছিল দল বেঁধে পেটের ধান্ধায়।" এই ভাবে কাহিনী শুরু হয়,

একটা সম্প্রদায়ের নতুন জায়গায় বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে, নাম হয় তাৎমাটুলি। তাৎমাটুলির লোকেরা তাঁতি হলেও তাদের তাঁত বুনতে কেউ কোনদিন দেখেনি, তারা চাষের কাজও করে না। এখানকার তাৎমাদের বৃত্তি কুয়োর বালি ছাঁকা আর ঘরামীর কাজ করা। তাৎমাটুলির পাশেই ধাঙড়টুলি। মাঝখান দিয়ে কাশী-শিলিগুড়ি পাকা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার দুধারে দুই সম্প্রদায়ের বাস। ধাঙড়টুলিতে ধাঙড়দের বাস। পাকা রাস্তাটি যেন দুটি সম্প্রদায়ের হৃদয় বিদীর্ণ করেছে। তাৎমারা হিন্দু আর ধাঙড়দের অনেকেই খৃষ্টান, তারা মজুরের কাজ করে কিংবা সাহেব বাড়ীতে মালীর কাজ করে। সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি এই দুই জাতের মধ্যে নেই। তাৎমাদের মধ্যে স্নানের বালাই নেই বলে ধাঙড়েরা তাদের নোংরা জানোয়ার বলে, আর তাৎমারা ধাঙড়দের বুড়বক্ কিরিস্তান বলে। তাৎমারা হিন্দু, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য কথায় কথায় তুলসীদাসের রামচরিত মানসের দোহাই দেয়। এই তাৎমা সম্প্রদায়েরই একজন ঢোঁড়াই—সতীনাথ ভাদুড়ী তাকেই এ-যুগের রামচন্দ্রের আদলে গড়তে চেয়েছেন।

তিনি কাহিনীর অধ্যায়গুলি 'রামচরিত মানসে'র অনুকরণে আদিকাণ্ড বালকাণ্ড নামকরণ করেছেন, এই ভাবেই পঞ্চায়েতকাণ্ড, রামিয়াকাণ্ড পরপর অধ্যায়গুলি এসেছে। তাৎমাটুলির বুধনীর ছেলে ঢোঁড়াই-এর যখন মাত্র দেড় বছর বয়স তখন তার বাবা মারা যায়। বুধনী বেশীদিন বিধবা রইল না, তাদের সম্প্রদায়ে সে ধরণের কোন বাধ্যবাধকতাও নেই, তাই বুধনী বাবুলালকে বিয়ে করলো। জননী পরিত্যক্তা এবং পিতৃহারা ঢোঁড়াই গ্রামের দেবস্থানের পূজারী বৌকাবাওয়ার কাছে মানুষ হতে আরম্ভ করলো। বুধনী আর একটা বিয়ে করলেও ঢোঁড়াই এর জন্য তার মন ব্যাকুল থাকতো। কিন্তু শিশুকাল থেকেই ঢোঁড়াই মায়ের কাছে যেতে চাইত না। বৌকাবাওয়া ঢোঁড়াই-এর প্রতি বুধনীর কোনদিন হৃত-স্নেহের ভাব লক্ষ্য করে নি, হাজার হলেও পেটের সন্তানকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু ঢোঁড়াই-এর প্রতিক্রিয়া অন্য রকম ভাবে দেখা দিল। মায়ের আচরণ তাকে বাল্যকাল থেকেই বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তার বাল্যকালের এই বিদ্রোহী মনোভাবই পরবর্তী কালে তাঁকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি সে তখন থেকেই অর্জন করেছিল। ঢোঁড়াই এর মানসিক গঠন তার

সম্প্রদায়ের আর দশজনের মত ছিল না। দেবস্থানে মানুষ হওয়ার জন্য শিশুকাল থেকেই সে মুক্ত জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হয়েছিল। বৌকা-বাওয়াও তাকে কোনদিন কোন শাসনের মধ্যে রাখেনি। সংকীর্ণ গ্রাম্য-জীবনের বাইরে থাকার জন্য তার মনের প্রসার ঘটেছিল, গ্রাম সীমানার বাইরের বৃহত্তর পৃথিবীকে চিনতে সাহায্য করেছিল। সতীনাথ ভাদুড়ী 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রলেপ দিলেও তিনি ঢোঁড়াই চরিত পরিকল্পনায় এক অনন্য সাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ঢোঁড়াই রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। গান্ধী-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব সমাজের প্রায় অন্ধকার অংশেও প্রবেশ করে আলোকিত করেছে, দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে তাৎমাটুলির এবং বিসকান্ধার মানুষেরাও আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেনি; কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী কোন ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে কারো উপর এই আন্দোলনের গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি, স্বাভাবিক ভাবেই একজন মানুষ তাতে অংশ গ্রহণ করেছে। ঢোঁড়াই তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে শিখেছে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিশ্চেষ্ট থাকলে অন্যায়কারী মাথা তুলে দাঁড়ায়। ঢোঁড়াই-এর জীবনের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সংগে এমন সুসমঞ্জস-ভাবে রাজনীতি অনুপ্রবেশ করেছে যার জন্য ঢোঁড়াই চরিত্রের ক্রমবিবর্তন কোথাও কৃত্রিম বলে মনে হয় নি।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে সমগ্র কাহিনীটি ঢোঁড়াইকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ঢোঁড়াই-এর মধ্য দিয়ে লেখক বিহারের লোকজীবনের সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরেছেন। 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এই দুটি গ্রন্থই গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভাবাদর্শের উপর, স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হলেও গ্রন্থদুটির মধ্যে কোনরকম সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। কাহিনী বর্ণনাতেও লেখক দুটি গ্রন্থে ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। 'জাগরী' এক রাত্রির কাহিনী। একটি পরিবারের চারজন সদস্যের একই সময়ের চিন্তায় ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে 'জাগরী' উপন্যাসে লেখক কাহিনী বিবৃত করেছেন; কিন্তু 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে লেখক বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ঢোঁড়াই এর জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে প্রত্যক্ষ ভাবে হিংসাত্মক রাজনীতিতে যোগদান এবং শেষ পর্যন্ত আশাভঙ্গ হয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে

ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। কাহিনীর মধ্যে বিশেষ কোন জটিলতা নেই। ঢোঁড়াই-এর ব্যক্তি জীবনের বেদনার সঙ্গে লেখক এক অনগ্রসর সম্প্রদায়ের দুঃখ দারিদ্র্যকে একাকার করে দিয়েছেন। ব্যক্তি জীবনের বেদনাময় অভিজ্ঞতাই ঢোঁড়াইকে জনগণের নেতৃত্ব দেবার মনোবল জুগিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ঢোঁড়াই কংগ্রেসী ভলেনটিয়ারদের কথায় এবং কাজে ফাঁকি প্রত্যক্ষ করে মাঝে মাঝে হতাশ হয়েছে, আবার পর মুহূর্তেই গান্ধীজীকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করে নতুন করে প্রেরণা লাভ করেছে।

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের স্থান যে কত উর্ধ্বে লেখক অতি সুকৌশলে অনগ্রসর জনসাধারণের বাস্তব-চরিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে তার পরিচয় দিয়েছেন। রামায়ণ পড়তে জানা মানুষের উপর ঢোঁড়াই এর শ্রদ্ধা এ কথাই প্রমাণ করেছে, ঢোঁড়াইদের মত সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে রামায়ণের আদর্শ জীবনের কত গভীরে অনুপ্রবেশ করেছিল। ঢোঁড়াই তাৎমাটোলার লোক, তাৎমাটোলার লোকেরা বলে রোজ', রোজগার, রামায়ণ, এই নিয়েই লোকের জীবন। রামায়ণই ঢোঁড়াই-এর জীবনের প্রাণ। নিজে রামায়ণ পড়তে পারে না বলে তার মনে খুবই দুঃখ। যারা রামায়ণ পড়তে পারে তাদের কাছে মনের কথা খুলে বলতে সে সঙ্কোচ বোধ করে। গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল, তাই ধর্মচেতনা থেকেই তিনি বৃহত্তর জন-সমষ্টির কাছে সহজেই পৌঁছুতে পেরে-ছিলেন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে অনেক উপন্যাস রচিত হলেও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ সতীনাথ ভাদুড়ী এত সূক্ষ্মভাবে তার প্রকাশ করতে পেরেছেন তা সচরাচর চোখে পড়ে না। সাধারণ রাজনৈতিক উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ঠিক সেই শ্রেণী-পর্যায়ে পড়ে না। এই উপন্যাসে দেশপ্রেমের জ্বালাময়ী বক্তৃতা নেই, দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদানের মহিমা কীর্তিত হয়নি, কর্তব্যবোধ এবং ভালোবাসার মধ্যে কোন সংঘাত সৃষ্টি হয়নি ; পরিবর্তে স্বাধীনতাকামী একটি রাজনৈতিক দলের নানা ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিস্বার্থের চিন্তা প্রভৃতি কলঙ্কের দিকগুলিই লেখক বাস্তবতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটন করেছেন—অথচ কোথাও তিনি সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেননি। আনুমানিক ১৯২০ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৫ সাল সুদীর্ঘ

সময়ের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিত্রের অনেকটাই 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

তাৎমাটোলা আর ধাঙড়টোলার মাঝের ডিসট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তাটিকে গ্রামের লোকেরা 'পাক্‌কী' বলে। সতীনাথ ভাদুড়ী এই পাকা রাস্তাটিকে কাহিনীতে চলমান জীবনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ঢোঁড়াই-এর জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে এই রাস্তাটির কথাটিও বারবার উল্লিখিত হয়েছে। তাৎমাদের বৃত্তি যাই হোক ঢোঁড়াই-এর জীবনের সঙ্গে অন্যান্য তাৎমাদেরও জীবনের কোন মিল নেই। শিশুকালে মাতৃহারা হয়ে ঢোঁড়াই 'গোঁসাইয়ের থানে' বৌকাবাওয়ার কাছে মানুষ হয়। বৌকাবাওয়া গোঁসাই-এর থানের সেবায়েৎ, তাৎমাদের কাছে সে শ্রদ্ধার পাত্র। তাৎমারা তাকে সন্ন্যাসী জ্ঞানে পূজো করে। বৌকা বিবাহ করেনি, কিন্তু পিতৃহারা ঢোঁড়াইকে সে পুত্রের মত স্নেহ করে। বৌকার মনের ইচ্ছা ছিল, ঢোঁড়াইকে সে তারই আদর্শে মানুষ করবে এবং শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াইকেই থানের পূজারী করে দেবে। ঢোঁড়াই বৌকাবাওয়াকে ভালোবাসলেও তার থানের মোহান্তগিরি করার কোন ইচ্ছা নেই। পাকা রাস্তাটির প্রতি আকর্ষণ সে বাল্যকাল থেকেই অনুভব করতো। গতানুগতিক জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে সে, মিলিয়ে নিতে পারে না। ঢোঁড়াই একটু বড়ো হতেই তার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটলো। এই স্বাধীনচেতনা থেকেই পরবর্তীকালে ঢোঁড়াই রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেছে। রামায়ণ পড়তে না জানলেও ঢোঁড়াই-এর উপস্থিত বুদ্ধি, বাক্‌পটুতা এবং নির্ভীকতার জন্য গ্রামের অন্য সকলে ঢোঁড়াইকে একটু আলাদা চোখে দেখতো। প্রথা ভাঙ্গার নেশা ঢোঁড়াই-এর রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল, তাৎমা আর ধাঙড়দের চিরকালের বিবাদ ভুলে গিয়ে নিজেদের জাতের বৃত্তির বাইরে গিয়ে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের বড়ো রাস্তায় ['পাকিক্‌'তে] ধাঙড়দের সঙ্গে মাটি ফেলার-কাজে যোগ দিল। তাৎমারা ধান কাটার কাজ করে ধাঙড়দের মত কুলির কাজ তারা করতে পারে না। তাৎমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার অনেক বিপদ একথা ঢোঁড়াই জানতো, কিন্তু তাই বলে ঢোঁড়াই তার স্বাধীন ইচ্ছাকে অবদমিত রাখতে পারে না। তাৎমারাও নিশ্চুপ থাকার নয়, তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ঢোঁড়াই-এর আশ্রয়দাতা বৌকাবাওয়ার 'থান' পুড়িয়ে দিল। থান জালিয়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া গুরুতর হল। পুলিশ তাৎমাদের শায়েস্তা

করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াই-এর মধ্যস্থতায় পুলিশদের ঘুষ দিয়ে সে-যাত্রা তাৎমা অপরাধীরা নিস্তার পেল। এই ঘটনার ফলে ঢোঁড়াই গ্রামের একজন গণ্যমান্য লোক হয়ে গেল। গ্রামবাসীদের কাছ তার মর্যাদা বেড়ে গেল, কেউ আর তাকে ঘাঁটাবার সাহস করতো না। একদিন পাকা রাস্তাটি দিয়েই গান্ধীজীর বার্তা ঢোঁড়াইদের গ্রামে এসেও পৌছায়। দেশের হৃদপিণ্ডের সংগে যুক্ত এই পাকা রাস্তাটি।

ভারতবর্ষের সর্বত্র তখন গান্ধীজীর ডাকে লবণ আইন অমান্য শুরু হয়েছে। সেই বিখ্যাত লবণ আইন আন্দোলনের সময় গান্ধী-ভক্তরা তাৎমাটোলার 'মরণাধারের' পুলের কাছে নাবাল জমিকে নুন তৈরীর মহলা দেবার জন্য নির্বাচিত করেছিল; কিন্তু পুলিশ আর 'রংরেজী টুপি' পরা হাকিমেরা সেখানে উপস্থিত হল। সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো, তাদের কাছে সরকারই 'মা-বাবা'। এই ভীরু কাপুরুষদের মধ্যে ঢোঁড়াই-ই রুখে দাঁড়ালো। অপমান, লাঞ্ছনা আর শোষণের বিরুদ্ধে সে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানালো। ঢোঁড়াই-এর চরিত্রবলই ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। নিপীড়িত ভীরু সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেও তার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল ছিল। এই থেকেই কংগ্রেসীদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ হল, সেও একজন মহাত্মাজীর ভক্ত হয়ে উঠলো। রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে ঢোঁড়াই-এর অনুপ্রবেশ ঘটলেও সতীনাথ ভাদুড়ী কিন্তু ঢোঁড়াইকে সর্বস্বত্যাগী আদর্শবাদী গান্ধীভক্ত করে তোলেন নি। ঢোঁড়াই-এর ব্যক্তি-মনের বাসনা-কামনা-হিংসা-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ দিয়ে তাকে এক স্বাভাবিক মানুষ তৈরী করেছেন। ভাবাবেগের অনুবর্তী হয়ে জীবনের ধর্ম থেকে ঢোঁড়াই সরে যায় নি।

তাৎমাদের মহতো প্রধান এবং তার গিন্নী ঢোঁড়াইকে খুব ভালোবাসে। ঢোঁড়াই তাদের আদরের আতিশয্যের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। মহতোর মেয়ে ফুলঝরিয়া জন্ম থেকেই পঙ্গু, তার সঙ্গেই অভিভাবকহীন ঢোঁড়াই-এর বিয়ে দিতে চায়, কিন্তু ঢোঁড়াই তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আগেই সাবধান হয়ে যায়। ঢোঁড়াই নিজের পছন্দমত বিয়ে করতে চায়, তার ভালোবাসার পাত্র রামিয়াকে জীবনসঙ্গিনী করতে চায়। ধাঙড়টুলির রবিয়ায়ের বাড়ীতে 'পশ্চিমের মেয়ে' রামিয়া আশ্রয় পেয়েছে। এই বিয়েতে বৌকা যে খুশীমনে সম্মত হতে পারে না, এ ধারণা ঢোঁড়াই-এর ছিল। বৌকাকে ঢোঁড়াই অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করলেও নিজের জীবনসঙ্গিনী নির্বাচিত করার ব্যাপারে

তার পালক-পিতা বৌকার কথাও অমান্য করে। ঢোঁড়াই তখন রামিয়ার রূপে হাস্যে লাস্যে বিমুগ্ধ। রামিয়াকে ঢোঁড়াই অন্তর থেকে ভালোবাসে, তাকেই সে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে। ঢোঁড়াই-এর বিয়ের পর একদিন বৌকা কোনো কাজের উপলক্ষে থান থেকে বেরিয়েছিল, কিন্তু আর ফিরে এল না। এই ঘটনায় ঢোঁড়াই খুব আঘাত পেল। রাজনৈতিক উপন্যাসে ব্যক্তি-জীবনের ট্রাজিডির এমন সার্থক রূপায়ণ বড় একটা দেখা যায় না। ঢোঁড়াই-এর চরিত্র সার্থক ট্রাজিডির চরিত্র হয়েছে। ঢোঁড়াই-এর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন-ভঙ্গের মধ্য দিয়ে কাহিনীর শেষ পরিণতি ঘটেছে। বৌকা বাওয়া নিরুদ্দেশ হওয়ায় ঢোঁড়াই মনে আঘাত পেয়েছিল খুবই; কিন্তু সেই দুঃখ রামিয়ার ভালোবাসার মধ্যে ভুলতে চেয়েছিল, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নিরুদ্বেগে জীবন-যাপনের মধ্যে যে শান্তি, সেই শান্তিই ঢোঁড়াই-এর কাম্য ছিল। সতীনাথ ভাদুড়ী অত্যন্ত কৌশলে ঢোঁড়াই-এর রাজনৈতিক জীবনের হতাশা তার ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। রামিয়ার সঙ্গে ঢোঁড়াই-এর বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী হল না। ধাঙড়টোলার খৃষ্টান স্যামুয়রের প্রতি রামিয়া আকৃষ্ট হল, ঢোঁড়াই উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে রামিয়ার গায়ে হাত দেওয়াতে রামিয়া গ্রামের পঞ্চ-প্রধানের দরবারে নালিশ জানালো যে, ঢোঁড়াই তাকে অকারণে মারধোর করেছে, তাই সে ঢোঁড়াই সঙ্গে ঘর করতে অনিচ্ছুক। পঞ্চায়েতের সঙ্গে বিরোধিতা করার মধ্য দিয়েই ঢোঁড়াই-এর সংগ্রামী জীবনের আরম্ভ হয়েছিল; কিন্তু রামিয়ার সঙ্গে সে কোন বিরোধ না চালিয়ে, নিজের দুর্ভাগ্য বলে সে সব কিছু মেনে নিয়েছিল। এরপর থেকেই তার মনে স্ত্রীজাতির উপর বিদ্বেষ দেখা দেয়, কিন্তু এ বিদ্বেষও সে দীর্ঘকাল মনে মনে পোষণ করতে পারে না। মানুষের প্রতি মমত্ববোধ তার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে, মানুষকে ঘৃণা করতে ঢোঁড়াই জানে না, তাই তাৎমাটোলা ছেড়ে নতুন করে জীবিকার সন্ধানে সে যখন ভিন্ন গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন তার অস্থির চিত্তে সাগিয়া নামে একটি মেয়ে সান্ত্বনার বারি সিঞ্চন করে, ঢোঁড়াই আবার নতুন করে বাঁচার অর্থ খুঁজে পায়। বিস্কান্ধায় এসে ঢোঁড়াই-এর জীবনের আর এক পর্ব শুরু হয়।

ঢোঁড়াই-এর জীবনের একটি সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার জন্য সতীনাথ ভাদুড়ী কিঞ্চিদধিক তিরিশ বছর সময় সীমা বেছে নিয়েছিলেন। এই

ত্রিশ বছর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক ঘটনা বহুল সময়। এই সকল ঘটনা কেবল শহরাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, গ্রাম গ্রামান্তরে তার অভিঘাত এসে গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে নতুন চিন্তার আলোড়ন তুলেছিল। দিল্লীর দরবারের সময় অর্থাৎ ১৯১১ সালে ঢোঁড়াই-এর জন্ম হয়। জিরানিয়া শহরে তখন এই উপলক্ষ্যে নানা তামাশা। এই তামাশা দেখতে বুধনী যেতে পারেনি, কেন না ঢোঁড়াই তখন মাত্র পাঁচদিনের শিশু। জিরানিয়ায় প্রথম মোটর গাড়ী আসে ১৯১৩ সালে, একথা লেখক পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। এই পরিবর্তিত সময়ের মধ্যে ঢোঁড়াই জন্মগ্রহণ করে। পাদটীকায় এই ঘটনার উল্লেখ, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পাশ্চাত্ত্য যন্ত্র সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর থেকে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো আস্তে আস্তে পাল্টাতে আরম্ভ করে। এর পরের যুগান্তকারী ঘটনাগুলিকে লেখক কাহিনীর মধ্যে গেঁথে দেন। গ্রামের সঙ্গে শহরের দূরত্ব কমে গিয়ে শহরের জাগরণ গ্রামের নিদ্রিত জন-সমষ্টিকে জাগিয়ে দেয়; নতুন চিন্তার তড়িৎ স্পর্শে মৃতপ্রায় মানুষ হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে। এই আকস্মিক আঘাতের বহিঃপ্রকাশ লেখক ঢোঁড়াই-এর চরিত্রের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। এরপর থেকে বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাস্রোত থেকে সুদূর গ্রামগঞ্জও বিচ্ছিন্ন থাকে না। ১৯১৭ সালে যুদ্ধের জন্য চাঁদা সংগ্রহ উপলক্ষ্যে টুর্নামেণ্ট হয়। ১৯১৯ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে 'হড়তাল' হয়। মাষ্টার সাব সরকারী চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন। গান্‌হী বাওয়ার বার্তা এসে পৌঁছোয়; মদের দোকানে পিকেটিং হয়। এ-সব ঘটনা ঢোঁড়াই-এর শৈশবেই ঘটে যায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি এক ভাবরাজ্যের বিশাল প্রেক্ষাপটে কাহিনীর বিস্তার করলেও গ্রামীণ জীবনের বহুযুগের লালিত কুসংস্কারগুলির বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় দিতে ভুলে যাননি। গ্রামের মানুষ গান্ধীজীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর মূর্তি বিলাতি কুমড়োর উপর অঙ্কিত হতে দেখে। এ সমস্ত ঘটনা কাহিনীর বহিরঙ্গ শোভাবর্ধনের জন্য লেখক উল্লেখ করেন নি, চরিত্রগুলির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন।

প্রকৃতিবাদী হয়ে যান। সতীনাথ ভাদুড়ীর কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি তার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। ব্যক্তি জীবনের দুরূহ অভিজ্ঞতায় তিনি যা অর্জন করেছিলেন তার কোন অংশই বর্জনযোগ্য নয়।

এই উপন্যাসের আঞ্চলিকতা প্রাথমিক লক্ষণ। তাৎমাটোলা পরিত্যাগের পর ঢোঁড়াই বিস্কান্ধায় সাগিয়াদের বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিল। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্প সে সময়ই হয়। সাগিয়ার সান্নিধ্যে আসার পর থেকে ঢোঁড়াই-এর স্ত্রীজাতের উপর অশ্রদ্ধার ভাবটা চলে যায়। রামিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা সাময়িকভাবে তার মনে যে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, সাগিয়ার সংস্পর্শে আসার পর সে ভাব কেটে যায়। সাগিয়ার মার তামাক ক্ষেতেই ঢোঁড়াই কাজ করতো। ভূমিকম্প যখন হয় তখন সে, সাগিয়া এবং সাগিয়ার মার সঙ্গে তামাক ক্ষেতে কাজ করছিল, হঠাৎ আলোড়নে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রাণ ভয়ে 'পাক্‌কী' রাস্তার দিকে দৌড়ে গিয়েছিল, মাটি ফেটে দু-ভাগ হয়ে যাওয়ার সময় তার সাগিয়ার কথা মনে পড়েনি—সাগিয়ার চিৎকারে ঢোঁড়াই থমকে দাঁড়িয়ে দেখে ; বালির মধ্যে সাগিয়ার কোমর পর্যন্ত ঢুকে গেছে। ঢোঁড়াই আর সাগিয়ার মা মোসম্মত মিলে সাগিয়াকে কোনক্রমে টেনে তোলে। ঢোঁড়াই-এর মন তখন নিজের দেশ তাৎমাটুলিতে চলে গেছে। সেখানেই তার আপনজনদের বাস। তার ছোট্ট ছেলেটাও সেখানে আছে, রামিয়া তাকে ছেড়ে চলে গেলেও রামিয়া তারই আত্মজের মা, তার অমঙ্গল ঢোঁড়াই চায় না। জীবনের প্রতি এত গভীর অনুরাগের এমন বাস্তব-সম্মত প্রকাশ, জীবনবাদী সতীনাথের মতো লেখকের পক্ষেই করা সম্ভব।

এখানেই ঢোঁড়াই চরিত্রের সার্থকতা। তার মত অশিক্ষিত নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে রাজনীতির সুমহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন-বিবিক্ত আদর্শবাদের পূজারী হওয়া সম্ভব নয়। লেখকও তাকে সেই ভাবে চিত্রিত করেন নি।

এই ভূমিকম্পে বিস্কান্ধা তছনছ হয়ে যায়। বিপদের দিনে গ্রামের লোক ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত হয়। বালিতে বুজে যাওয়া কুয়ো পরিষ্কার করতে ঢোঁড়াই এগিয়ে আসে। এটাই তাদের জাতের আসল কাজ, কৃষিকাজ নয়। সতীনাথ ভাদুড়ী এরই ফাঁকে ফাঁকে রিলিফের টাকা নিয়ে গ্রামের প্রধানদের ষড়যন্ত্র, সেই টাকা আত্মসাতের প্রচেষ্টা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনগুলিতে গান্ধীর নাম করে ভোট আদায়, ভোটে জিতে আত্মসিদ্ধি ইত্যাদি বিষয়-

গুলিকে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছেন যা ঢোঁড়াইয়ের বৃহত্তর জীবনে উত্তরণে সাহায্য করেছে। গ্রামের বড় লোকদের প্রতি তাদের পূর্ব ধারণা পালটে গেছে, তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। একদিকে গান্ধীজী আর তাদের মত দরিদ্র অসহায় মানুষজন—আর অপর দিকে পুলিশ দারোগা, হাকিম, গ্রামের জোতদার, সরকারী আমলা ; এই সত্য উপলব্ধি করেছে।

নতুন গ্রাম বিস্কান্ধায় এসে ঢোঁড়াই সাগিয়ার মা মোসম্মতের ক্ষেতের মজুর হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিল। এই গ্রামের গিধর মণ্ডল অনেক জমির মালিক। তার ইচ্ছা মোসম্মতের মেয়ে সাগিয়াকে বিয়ে করে মোসম্মতের জমি দখল করা। ঢোঁড়াই সাধারণ বুদ্ধিতে গিধর মণ্ডলের উদ্দেশ্য ধরতে পারে। ঢোঁড়াই গিধর মণ্ডলের উদ্দেশ্য সাধনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রাম্য দলাদলিতে ঢোঁড়াই নিজের বুদ্ধির জোরেই সকল মানুষের আস্থাভাজন হয়ে পড়ে। সাগিয়ার স্নিগ্ধ সাহচর্যে জীবনে নতুন করে উৎসাহ পায়। সাগিয়ার জন্য বিস্কান্ধা গ্রাম, আর গ্রামের মানুষজন তার আপনার লোক হয়ে যায়। এই গ্রামের মানুষদের বীজধানের দাবীর মিছিলের নেতৃত্ব দেয় সে। গ্রাম-প্রধানের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাবার চেষ্টা করে। ঢোঁড়াই সাগিয়াকে নিয়ে আবার নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। মহাত্মাজীর দর্শনের জন্য সাগিয়াকে নিয়ে ঢোঁড়াই শহর জিরানিয়ায় যায়। গিধর মণ্ডলও নিশ্চুপ থাকে না, মোসম্মতকে ঢোঁড়াই-এর বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলবার চেষ্টা করে। মোসম্মতও গিধরের কথায় তার বিরক্তি ঢোঁড়াই-এর কাছে প্রকাশ করে। রামিয়াকে হারাবার পর ঢোঁড়াই-এর জীবনে যে শূন্যতা এসেছিল তার পরিবর্তে আবার তার জীবনের প্রতি মায়া হতে আরম্ভ করে, সাগিয়ার প্রতি সমবেদনায় তার মন ভরে যায়। এর পর ঢোঁড়াই-এর জীবনে আবার নতুন করে আঘাত আসে। সাগিয়া কাউকে না জানিয়ে 'বিদেশিয়া'র দলের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। মোসম্মত তার একমাত্র মেয়ের এভাবে চলে যাওয়াতে ভেঙে পড়ে। তাই সে সাগিয়াকে ফিরিয়ে আনার জন্য ঢোঁড়াইকেই অনুরোধ করে। ঢোঁড়াই সাগিয়ার সন্ধান পায় কিন্তু তার প্রতি অনুরাগের কথা ব্যক্ত করতে পারে না। সাগিয়ার বিরুদ্ধে গিধর মণ্ডলের দেওয়া সমস্ত কলঙ্ক যে মিথ্যা ঢোঁড়াই সে-কথা বিশ্বাস করে। সাগিয়া ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার মেয়ে নয়, গিধরের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই মায়ের উপর অভিমান করে সাগিয়া, বিদেশিয়াদের দলের সঙ্গে চলে গেছে।

ঢোঁড়াই-এর জীবনে যখনই কোন স্থিতি আসে তখনই তার জীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, এরজন্য ঢোঁড়াই কাউকে দোষারোপ করে না, তাকে নিজের দুর্ভাগ্য বলেই মেনে নেয়।

মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই ঢোঁড়াই নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াবার প্রেরণা পেয়েছে। জীবনের সঙ্গে রামায়ণকে মিশিয়ে নেওয়ার জন্য সত্যের পথে নির্ভীক ভাবে চলার ক্ষমতা অর্জন করেছে; কিন্তু তার নৈতিক আদর্শ চারপাশের মানুষের থেকে স্বতন্ত্র, তাইসাংসারিক জীবনে, সমাজ-জীবনে, এমন কি রাজনৈতিক জীবনেও ঢোঁড়াই-এর সাফল্য আসে না, সর্বত্র অসঙ্গতি তাকে ব্যথিত করে; শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে সে একা হয়ে যায়। ঢোঁড়াই-এর জীবনের ট্রাজিডি এখানেই। সে বাঁধা পড়তেই চেয়েছিল। রামিয়ার কাছে আঘাত পেয়ে, সাগিয়ার কাছে ধরা পড়তে চেয়েছিল, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার ধর্মের মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে ছিল,—গান্ধীজীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে বলে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু কোথাও স্থায়ী হতে পারে নি। সতীনাথ ভাদুড়ী ঢোঁড়াই-এর জীবনের এই ট্রাজিডিকে সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন; প্রাসঙ্গিক ভাবে ভারতবর্ষের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পটভূমিতে ঢোঁড়াইকে নিয়ে এসেছেন; কিন্তু কোথাও বৃহত্তর রাজনীতিতে ঢোঁড়াইকে প্রধান পুরুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন নি, রাজনীতির ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঢোঁড়াই এমন কোন কাজ করেনি যা তার পরিবেশের পক্ষে অনুপযুক্ত। অগাষ্ট আন্দোলনের সময় ঢোঁড়াই প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেয়। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলে পর আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে। ঢোঁড়াই-এর প্রকৃতির মানুষের পক্ষে এ-সময় ঘরে বসে থাকা সম্ভব নয়, সেও সকলের সঙ্গে সরকারী ঘরবাড়ী পোড়াতে যায়। পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে সে গুপ্ত সংগঠন 'আজাদ দস্তা' যার পরবর্তী নাম ক্রান্তিদল—তাতে যোগদান করে। এখানেই তার রাজনীতির প্রথম পাঠ, কিন্তু রাজনীতির আসল পাঠ নেবার সময় সে যতটা উৎসাহ বোধ করে তার থেকে রামায়ণ পাঠ শিক্ষায় তার বেশী উৎসাহ দেখা যায়। এই দলে তার নাম রামায়ণজী হয়। দলের সকলেই সর্বভারতীয় নেতার নামে এক একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করে। দলের মধ্যে শৃঙ্খলার পরিবর্তে কলহ ঢোঁড়াইকে ব্যথিত করে। যত মিটিং হয়, তার থেকে বেশী ঝগড়া চলে। নেতাদের মধ্যে অন্তর্কলহে দল দিন দিন ছোট হয়ে আসে। অনেকে

পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে, অনেকে দলের পিস্তল, টাকা নিয়ে নেপালে পালিয়ে যায়। ঢোঁড়াই-এর প্রাথমিক উন্মাদনা ক্রমেই কমে আসে, তাই সে রামায়ণ পাঠে অধিক মনোযোগ দেয়। দলের কাজে ঢোঁড়াইকে বিস্কান্ধায় যেতে হয়। পুলিশের কাছে ধরা পড়ার ভয় সব সময়ই আছে। গ্রামের লোকও সুযোগ-সুবিধা মত তাদের দলের লোকদের ধরিয়ে দেয়। সর্বত্রই অবিশ্বাস আর সন্দেহ।

ঢোঁড়াই রাত্রে মোসম্মতের বাড়ী যায়, সেখানে সাগিয়াকে দেখতে পায়, কিছুদিন আগে সে ফিরে এসেছে। এই সাগিয়াকে নিয়েই ঢোঁড়াই একদিন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল, গিধর মণ্ডলের চক্রান্তের জন্য তার সে আশা অপূর্ণই থেকে গেছে। এখন সাগিয়ার সান্নিধ্যে এসে পুরাণো কত কথাই মনে আসছে, কিন্তু তাকে চলে যেতেই হবে, যে কোন মুহূর্তেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। তাদের দলের কত ছেলেই যে সামান্য ভুলের জন্য ধরা পড়েছে। ঢোঁড়াই পরে জানতে পেরেছে পুলিশ তাকে ধরতে না পারলেও সাগিয়া আর সাগিয়ার মাকে ধরে নিয়ে গেছে। তাদের গ্রেপ্তারের জন্য দলের লোক বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেনি। ঢোঁড়াই মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছে, রাজনীতির জটিল তত্ত্ব তার মাথায় ঢোকে না, রামচন্দ্র মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেন, কিন্তু দলের কাজ করতে আসার পর মানুষের বিদ্বেষ যেন তার কাছে বেশী করে ধরা পড়েছিল।

"ক্রান্তিদলের লোকেরা বলবে, 'কংগ্রিসের বড় নেতাদের সরকার ছাড়ছে বলে সুযোগ বুঝে সলণ্ডর করেছে 'কায়েরটা' [কাপুরুষ]"—এসব কথা তার কাছে খুবই তুচ্ছ। তার মনের মানুষ সাগিয়া জেলের ভাত খাচ্ছে। তারও স্থান জেলখানাতেই হওয়া উচিত। ঢোঁড়াই এস· ডি. ও. সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যায়। এখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

সতীনাথ ভাদুড়ীর কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি ঢোঁড়াই-এর জীবনের ট্রাজিডিটি সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজনীতির মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঢোঁড়াই-এর প্রকৃতির মানুষের পক্ষে নিজেকে উৎসর্গ করা স্বাভাবিক নয়, লেখক সেভাবেই ঢোঁড়াইকে অঙ্কিতও করেন নি। ঢোঁড়াই যা করেছে নিজের জীবনবোধের চেতনা থেকেই করেছে। তার জীবনের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে লেখক সামগ্রিক ভাবে দেশের রাজনৈতিক চেহারাটার পরিচয়

দিয়েছেন। সেখানে ঢোঁড়াইয়ের মত অনেক লোকই দেশের অস্থিরতার মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে এমন কোন উপাদান নেই যার জন্য গ্রন্থটি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে; সতীনাথ ভাদুড়ী গ্রন্থের জনপ্রিয়তার জন্য তেমন কোন উপাদানের আমদানিও করেন নি, তিনি তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মন নিয়ে এক অখ্যাত জনপদের বহু মানুষের জীবন-ধারাকে সাহিত্যরসে সিঞ্চিত করেছেন। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' জনপ্রিয় উপন্যাস না হলেও শিল্পরস-সমৃদ্ধ এক অনন্য সাধারণ উপন্যাস হয়েছে। চরিত্র-গুলির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে, আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য রূপায়ণে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণে গ্রন্থটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ সালে। ধারাবাহিক ভাবে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশ কালে গ্রন্থটির নাম 'মিনাকুমারী' ছিল। 'মিনাকুমারী' এই গ্রন্থের নায়িকা, নায়িকার নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করলেও পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় গ্রন্থটির নাম 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' রাখা হয়। ১৩৫৫ সালে 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় যখন প্রথম উপন্যাসটি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে তখনও এর নাম 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' ছিল, কিন্তু মাঝ পথে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হওয়াতে পরবর্তী সময়ে যখন 'মাসিক বসুমতী'তে উপন্যাসটি পুনরায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে তখন এই উপন্যাসের নাম পরিবর্তন করে 'মিনাকুমারী' নামটি সাব্যস্ত হয়। এই নাম পরিবর্তনের কারণ স্বরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, লেখক পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধেই পত্রিকাতে প্রকাশ কালে গ্রন্থটির নাম পরিবর্তনে রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় তিনি আবার নিজস্ব নামটিই ব্যবহার করলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখক 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' [দুই খণ্ড] দুটি উপন্যাস রচনা করেন, কিন্তু 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এই উপন্যাসের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রমিক মালিক বিরোধে শ্রমিক সংগঠনগুলির ভূমিকা, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো এবং মর্যাদার সঙ্গে তাদের কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা, মালিকের মাত্রাতিরিক্ত লোভ, শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে দমন করার

জন্য মালিক শ্রেণীর ঘৃণ্য চক্রান্ত প্রভৃতি উত্তেজক উপাদান নিয়ে 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। যদিও উপন্যাসটির কাহিনী-কাল স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে গান্ধীজীর মৃত্যুর পরদিন পর্যন্ত বিস্তৃত—তবুও এই উপন্যাসের উপাদান আজকের দিনেও নির্মম সত্য। শ্রমিক সংগঠনের বাস্তবোচিত বর্ণনা, সাধারণ শ্রমিকের নিখুঁত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং মালিক শ্রেণীর স্বরূপ উদ্ঘাটনে লেখক একদিকে যেমন তাঁর তীক্ষ্ম রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে একটি সংযত বিয়োগান্তক প্রেমের কাহিনী বর্ণনায় তেমনিই কবিত্বশক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। সতীনাথের সাহিত্যে যুবক-যুবতীর প্রেমের চিত্র নেই বললেই চলে। এই উপন্যাসে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার এই অনাবিষ্কৃত দিকটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি জনজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত, এ জনজীবন আবার শ্রমিক জীবন। শ্রমিক জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এর মধ্যে একটি করুণরসাত্মক প্রেমের কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করেছে। কাহিনীর প্রধান পাত্র অভিমন্যু বলীরামপুর জুটমিলের শ্রমিক সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী এবং কাহিনীর প্রধান পাত্রী অনাথালয়ে পালিতা এই মিলেরই মহিলাকর্মী মিনাকুমারী। উভয়েরই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাহিনী পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। উপন্যাসটি যথার্থ ট্রাজিডি হয়েছে। এই গুরুগম্ভীর কাহিনীটির এমন একটি হাল্কা নামকরণ করলেন কেন? এ বিষয়টি একটু ভেবে দেখার দরকার। সুসাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটক সতীনাথ ভাদুড়ীকে অনুরোধ করে লেখেন: "আমার বক্তব্য ছিল 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' নামটি যদি পরিবর্তন করে দেন।"[১]

বিষয়ানুযায়ী গ্রন্থের নামকরণে যে সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি এ প্রশ্ন অনেকের মনেই এসেছিল। বিশেষ করে সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর উপন্যাসগুলির নামকরণের ব্যাপারে যথেষ্ট মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলির শিরোনামগুলি লক্ষ্য করলে সহজেই এ ধারণা করা যেতে পারে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সকল উপন্যাসেই আঙ্গিকের অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত রীতিতে উপন্যাস রচনা করার প্রবণতা তাঁর রচনার মধ্যে দেখা যায় না। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটির পরিবেশনাতেও তিনি একটি অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন: "...তাঁর দপ্তরের আত্মহত্যা বিভাগ

থেকে জরুরী ফাইল টেনে নিয়ে বসেন চিত্রগুপ্ত; মিনাকুমারীর ঘটনাবহুল জীবনের ফাইল। আত্মহত্যায় মরতে হবে মিনাকুমারীকে—এ তাঁর প্রাথমিক নির্দেশ। তার জীবনের নাট্য আরম্ভ হওয়ার আগেই এই অমোঘ নির্দেশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে।” এই ভাবে কাহিনী আরম্ভ হয়েছে। কাহিনীর শেষে পাঠকেরা অবশ্য জানতে পারে, লেখক বর্ণিত চিত্রগুপ্ত আমাদের প্রচলিত ধারণার চিত্রগুপ্ত নয়। চিত্রগুপ্ত একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচকের ছদ্মনাম।

সাহিত্য সমালোচনায় আয় নেই বলে সমালোচক এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম ‘চিত্রগুপ্ত বাণী প্রতিষ্ঠান।’ এর কাজ উদীয়মান লেখকদের গল্প লেখা শেখানো। নতুন লেখকদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া, গল্পের প্লট সরবরাহ করা। এই পদ্ধতি গ্রহণ করে সতীনাথ ভাদুড়ী এক অসাধারণ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রগুপ্ত নির্দেশিত পরামর্শানুযায়ী কাহিনীটি কতদূর সার্থক হয়েছে তাই পাঠকের বিবেচ্য। উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে জীবনের ব্যাপ্তি প্রকাশের উপর, কাহিনীর আয়তনের উপর নয়। স্বল্প পরিসরের মধ্যেই সতীনাথ জীবনের এই ব্যাপ্তি প্রকাশ করেছেন। ‘চিত্রগুপ্ত বাণী প্রতিষ্ঠান’ কর্তৃক প্রেরিত নির্দেশাবলী লেখক কতদূর সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পেরেছেন, তাই ‘চিত্রগুপ্ত বাণী প্রতিষ্ঠানের’ চিত্রগুপ্ত তাঁর ফাইলে সংরক্ষিত সূত্রগুলির সঙ্গে খুঁটিয়ে মিলিয়ে নিচ্ছেন। সাধারণের ধারণা অনুযায়ী মানুষের জীবনের পরিণতিও চিত্রগুপ্তের খাতায় পূর্বাহ্নেই সযত্নে রক্ষিত থাকে, লেখকেরাও পূর্বাহ্নেই কাহিনীর খসড়া তৈরী করে নেন, সতীনাথ ভাদুড়ী সুকৌশলে এই উভয় ধারণার সংমিশ্রণে কাহিনীটিতে এক অতিরিক্ত ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। আপাত-লঘু নামকরণের মধ্যে দিয়ে লেখক গভীর জীবন-বোধেরই পরিচয় দিয়েছেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সকল উপন্যাসের মত ‘চিত্রগুপ্তের ফাইল’ উপন্যাসেরও পটভূমি বিহারের একটি মফঃস্বল শহর। এই উপন্যাসের সকল পাত্র-পাত্রীরাই বিহার প্রদেশের মানুষ। এই ছোট মফঃস্বল শহরে দু-একটি কলকারখানা আছে। এ ছাড়া শহরটির আর কোন গুরুত্ব নেই। এই শহরেরই ‘বলীরামপুর জুট মিলে’র শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে শিউচন্দ্রিকার রাজনৈতিক কর্মী বন্ধু অভিমন্যু এসে উপস্থিত হয়। শিউচন্দ্রিকার পার্টির

শ্রমিক সংগঠন তৈরীর পূর্বে আরও দু-একজন রাজনৈতিক কর্মী শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মজদুর ইউনিয়ন তৈরী করেছিল; কিন্তু শ্রমিকদের ঠকিয়ে কিছু পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্য নিয়েই এই সব শ্রমিক সংগঠনগুলি তৈরী হয়ে থাকে এবং কাজ হাসিলের পর সে সব সংগঠনের নেতারা সরে পড়ে। এই সমস্ত কারণে শ্রমিকদের মজদুর ইউনিয়নের নেতাদের উপর কোন আস্থা ছিল না। শিউচন্দ্রিকা শ্রমিকদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং সংগঠন চালাবার জন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে কোনরকম চাঁদাও গ্রহণ করতেন না। শিউচন্দ্রিকা একজন যুক্তিবাদী কর্মনিষ্ঠ মজদুর নায়ক ছিলেন। সাধারণ ভাবে তাঁর মধ্যে কেউ কোনদিন ভাবাবেগ লক্ষ্য করেনি, পার্টিই তার জীবনের ধ্যানজ্ঞান ছিল। পাটির সংগঠনকে বাড়ানোর জন্য এবং শ্রমিকদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য তার কাজে কেউ কোনদিন ত্রুটি লক্ষ্য করেনি। সাহেব মালিকের সঙ্গে চোস্ত ইংরেজীতে কথা বলতে এবং শ্রমিক আইনের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়গুলি সময় মত তুলে ধরার জন্য শিউচন্দ্রিকার নেতৃত্ব সম্পর্কে কারো মনে কোন দ্বিধা ছিল না। শিউচন্দ্রিকা মজদুর ইউনিয়ন করার পূর্বে ১৯৩৭ সালে 'বলীরামপুর জুটমিলে' প্রথম মজদুর ইউনিয়ন হয়। তখনকার ইউনিয়নের সেক্রেটারি ইস্রাইল মিয়া কোন নারী ঘটিত গোলমালে জড়িয়ে পড়ার পর শ্রমিকদের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে পালিয়ে যায় এবং যাওয়ার সময় ইউনিয়নের টাকা আত্মসাৎ করে। এর অনেকদিন পর আমীরচাঁদ দ্বিতীয় মজদুর ইউনিয়ন তৈরী করেছিল; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে শ্রমিক-মহলে কানাঘুষো শোনা যায় যে আমীরচাঁদ মালিকদের হয়ে দালালী করছে। তাই আমীরচাঁদকেও শেষ পর্যন্ত মিল ছেড়ে চলে যেতে হয়, কিন্তু যাওয়ার সময় সেও ইউনিয়নের টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে যেতে ভোলে না। শিউচন্দ্রিকা এ সমস্ত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই অতি সন্তর্পণে তার সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেত। সতীনাথ ভাদুড়ী বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই শিউচন্দ্রিকার মত একজন যথার্থ রাজনৈতিক কর্মীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন।

অভিমন্যুর চরিত্র শিউচন্দ্রিকার ঠিক বিপরীত ছিল। "রাজনৈতিক কর্মীর জীবন সে নিয়েছিল, ঐ জীবন সে ভালোবাসে বলে নয়। অধিকাংশ লোকের মতো তার কৈশোরের ভাবপ্রবণ মনকে উদ্বেলিত করেছিল রোমাঞ্চকর রাজনীতির স্বপ্ন-উন্মাদনা।" এই উন্মাদনা তার

একদিন কেটে গিয়েছিল, কিন্তু গতানুগতিকতার চাপে পড়ে কর্মী-বন্ধুদের সান্নিধ্য হারাবার ভয়ে শেষ পর্যন্ত তার আর দল ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তার স্বভাব হালকা প্রকৃতির ছিল। কোন জিনিস তলিয়ে দেখার মত তার ধৈর্য ছিল না। কাজ কর্মে তার প্রায়ই ভুল হতো। শিউচন্দ্রিকার মত নিয়মের বাঁধা জালে আবদ্ধ থাকতে অভিমন্যু হাঁপিয়ে উঠতো। অভিমন্যুর উপর শিউচন্দ্রিকার কিছুটা দুর্বলতা ছিল। পার্টির অন্যান্য সদস্যেরাও অভিমন্যুর আপনভোলা প্রকৃতির জন্য তাকে ভালো-বাসতো, কিন্তু শিউচন্দ্রিকাকে এ ব্যাপারে ঠাট্টা করতে ছাড়তো না। শিউ-চন্দ্রিকা তার জবাবে বলতো: "ময়ের সব চাইতে নিচের ধাপে যে বসে আছে তাকে আর নাবাবে কোথায়?"

শিউচন্দ্রিকা এবং অভিমন্যুর মধ্যে চরিত্রগত কোন সাদৃশ্য না থাকলেও অভিমন্যু শিউচন্দ্রিকার সব থেকে বেশী অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়ার মর্যাদা পেয়েছিল। কেবল প্রকৃতিতেই যে দুই বন্ধুর বৈসাদৃশ্য ছিল তাই নয়, আকৃতিতেও তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। অভিমন্যুর ঋজু অথচ নমনীয়, ছ-ফুট লম্বা এবং সুন্দর মুখশ্রীর জন্য সে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তার সুন্দর চেহারার জন্য 'বলীরামপুর জুট মিলে'র নতুন ম্যানেজার ম্যাকলীন সাহেব অভিমন্যুকেই ইউনিয়নের সেক্রেটারি মনে করে শিউচন্দ্রিকাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তার সঙ্গে আলোচনা করতে আরম্ভ করেছিল। শিউচন্দ্রিকার বেঁটে কালো চেহারার উপর সাহেবের কোন নজরই পড়েনি। একজন মজুরের তিনটি আঙুল কেটে যাওয়ায় ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য শিউচন্দ্রিকা এবং অভিমন্যু সাহেবের কাছে গিয়েছিল। সাহেবের ভুল ভাঙতে বেশী দেরী হয়নি। শিউচন্দ্রিকার চেহারাটা যেমনই হোক তার চরিত্র যে ইস্পাতের মত দৃঢ়, এ উপলব্ধি করতে সাহেবের বেশী সময় লাগে নি। অভিমন্যু আইনের সূক্ষ্ম মার প্যাঁচগুলি বুঝতে পারে না। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আঙুল দিয়ে মেপে কি করে ঠিক হয়, তা তার বুদ্ধিতে আসে না। শিউ-চন্দ্রিকার মত তার একমুখী চিন্তা ছিল না। তার মধ্যে সংসার ছাড়া সন্ন্যাসীর ভাবটি থাকলেও জীবনের প্রতি তার অসীম আসক্তি ছিল।

সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর অপর দুটি রাজনৈতিক উপন্যাসে সামগ্রিক ভাবে ভারতবর্ষের রাজনীতির উপর গান্ধীজীর প্রভাব কি ভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তাই চিত্রিত করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'তে মধ্যবিত্ত

শিক্ষিত একটি পরিবারের উপর গান্ধীজীর প্রভাব কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তাই তিনি একটি পরিবারের চারজন সদস্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে বিহারের অনগ্রসর জনপদের মধ্যে গান্ধীজী কি ভাবে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার বিস্তৃত এবং বাস্তবোচিত বিবরণ দিয়েছেন। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসে শ্রমিক সংগঠনগুলির মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের আধুনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন। এই তিন উপন্যাসের কাহিনী এবং শ্রেণী-চরিত্রের পার্থক্য থাকলেও একটি জায়গায় আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রাজনীতির ক্ষেত্র যে ভাবপ্রবণ মানুষের পক্ষে উপযুক্ত বিচরণ ক্ষেত্র নয়, এ কথা তিনি তিন উপন্যাসের তিন প্রধান চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। 'জাগরী'র বিলু, 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র ঢোঁড়াই এবং 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসের অভিমন্যু এরা তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করলেও তাদের মানসিক গঠন একই ধাতুতে নির্মিত ছিল। ফাঁসীর মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে বিলুর ফেলে আসা জীবনের প্রতি গভীর মমত্ব; জীবন সঙ্গিণীকে না পেয়ে ঢোঁড়াই-এর আত্মসমর্পণ, এবং ভালোবাসার পাত্রীর সম্মান রক্ষার্থে অভিমন্যু নির্দোষ হয়েও আত্মপক্ষ সমর্থন না করার মধ্যে এ কথাই প্রমাণ করে যে, তারা রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখকে মিলিয়ে একাকার করে দিতে পারে নি। অন্তরজগৎ এবং বহির্জগতের মধ্যে এই সংঘাত তাদের না রাজনৈতিক জীবন না ব্যক্তিগত-জীবন, কোন জীবনেই সার্থকতা এনে দিতে পারে নি। সতীনাথ ভাদুড়ীর শিল্পী হিসাবে কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি চরিত্রগুলিকে আদর্শবাদের ভারবাহী যন্ত্রে পরিণত করেন নি, জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল, তিনি সমগ্র ভাবে কাহিনীর কাল-সীমার মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশটির যথাযথ চিত্র তুলে ধরতে পেরেছেন। কি জাতীয় আন্দোলনের স্তরে, কি শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে দেশের বৃহত্তর পরিচয় প্রদানে তিনি সার্থক হয়েছেন।

'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' সমগ্র গ্রাম-বিহার, উপন্যাসে এক বড় ভূমিকা পালন করেছে। বহু চরিত্র এবং বহু ঘটনা উপন্যাসে এমন ভাবে অনু-প্রবেশ করেছে যে তাদের ভূমিকার অপ্রাসঙ্গিকতার কথা কখনও মনে হয়

না। বাংলা ভাষায় রচিত অন্যান্য রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনার স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। 'জাগরী' উপন্যাসে রাজনৈতিক মতাদর্শের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থাকলেও লেখক অগাষ্ট আন্দোলনের সর্বভারতীয় রূপটির যথার্থ পরিচয় দান করেছেন। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি মূলতঃ শ্রমিক সংগঠনের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও স্বাধীন ভারতের শ্রমিক মালিক সম্পর্কটিও তিনি নিখুঁত ভাবে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই সমস্ত বিষয় উপন্যাসের অঙ্গশোভা বর্ধনের জন্য লেখক আমদানি করেন নি, কাহিনীর মূল ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসে অভিমন্যু এবং মিনাকুমারীর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী প্রাধান্য লাভ করলেও স্বাধীনতার সামান্য পরবর্তী কালের বলীরামপুর জুটমিলের মালিক ও মজুর ইউনিয়নের দ্বন্দ্ব, জেলার জমিদার, আধিয়ার, জোতদার, বাটইদারদের সংঘর্ষ, মিল ম্যানেজার ম্যাকলীন, অ্যাসিস্টেট ম্যানেজার জয়নারায়ণ, মালিক পক্ষের সঙ্গে পুলিশ, এস. ডি. ও. এবং সরকারী আমলাদের গোপন আঁতাত, মালিক-শ্রমিকদের সম্পর্কের ভাঙ্গন ধরানোর জন্য দালাল ইউনিয়ন তৈরীর অপচেষ্টা, শ্রমিক কল্যাণ খাতে বরাদ্দ টাকা নিজেদের স্বার্থে ব্যয় করা, এক কথায় সামগ্রিক ভাবে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটির নিখুঁত ছবি লেখক অঙ্কন করেছেন।

মুখর শ্রমিক-মালিক বিরোধের পাশাপাশি অভিমন্যু এবং মিনাকুমারীর মৌন প্রেমের আখ্যানটি কাহিনীতে স্নিগ্ধ-করুণ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। মিলের অদূরেই অনাথালয়, সেখানে অনেক হতভাগ্য শিশুর সঙ্গে মিনাকুমারী এবং রুকিণীও বড় হয়ে উঠেছে। অনাথালয় পরিচালনার ব্যাপারে মিল কর্তৃপক্ষেরই হাত হাছে। অনাথালয়ের মেয়েদের চাল চলন সম্পর্কে কারো ধারণাই ভালো নেই এবং মিল কর্তৃপক্ষের পরোক্ষভাবে অনাথালয় পরিচালনা করার গোপন উদ্দেশ্য কি? সে ধারণাও সকলেরই কাছে স্পষ্ট। ইউনিয়নের আয় বাড়ানোর জন্য 'কেসরপাক' নামে একধরণের মিষ্টি তৈরী করে অনাথালয়ের ছেলেদের দিয়ে ট্রেনে ট্রেনে ফিরি করানো হোত। এই সুবাদে অনাথ ছেলেদেরও কিছু আয় হোত। অভিমন্যুর দেওয়া এই পরিকল্পনাকে শিউ-চন্দ্রিকা অন্তর থেকে মেনে নিতে না পারলেও ইউনিয়নের আয়ের কথা চিন্তা করে তাঁকে সাময়িক ভাবে মেনে নিতে হয়েছিল। 'কেসরপাকে'র হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব মিনাকুমারীর উপর ন্যস্ত ছিল। এই সূত্রেই অভিমন্যুর

সঙ্গে মিনাকুমারীর পরিচয়। এই পরিচয় আরও নিবিড় হয় যখন মিলের ক্যান্টিনের হিসাব রাখার কাজে মিনাকুমারী এবং রুকণী নিযুক্ত হয়। শিউচন্দ্রিকার মত বাস্তববাদী মানুষ শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থেকে তাদের মনস্তত্ত্ব সহজেই অনুধাবন করতে পারতেন। এই কারণে অনাথালয়ের মহিলাদের সঙ্গে মিলের কোন সম্পর্ক থাকুক এটা শিউচন্দ্রিকা চাইতেন না। শিউচন্দ্রিকা মালিকের চক্রান্ত ধরতে পারেন নি, অভিমন্যু বা কর্তৃপক্ষ কেউ তাঁকে এ ব্যাপারে কিছুই জানায়নি। অভিমন্যুর স্বচ্ছন্দ স্বভাবের জন্যই মিনাকুমারী তার কাছে সহজেই ধরা পড়ে। সহজ আবেগে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়। মিনাকুমারী ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। মিনাকুমারী অনাথালয়ের পুরনো খাতায় দেখেছে, বলীরামপুর জংশন ষ্টেশনের প্লাটফর্মে তাকে পাওয়া গিয়েছিল। তারপর থেকে সে অনাথালয়ে আছে, কেউ কোনদিন তার খোঁজ নিতে আসেনি। "বড় হওয়ার পর মিনাকুমারী প্রতিদিন অনুভব করেছে যে অনাথালয়ে থাকলে পরিচয় হয় কেবল জগতের আঁধার আর উষর পিঠটার সঙ্গে। স্নেহ-ভালোবাসা, আদর আবদার এ সবের জায়গা কোথায় এখানকার আবহাওয়ায়?" মিনাকুমারীর বুভুক্ষু মন এমন একজন জীবনসঙ্গী চায় যার কাছ থেকে সে গভীর ভালোবাসার প্রত্যাশা করে, "এত গভীর যে তার রুক্ষ বাল্য-জীবনের সব বাকী-বকেয়া উসুল করে নেওয়ার পরও যেন পুঁজিতে হাত না পড়ে।"

মিনাকুমারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে অভিমন্যুরও খুব আগ্রহ। মিনাকুমারীও অভিমন্যুকে একান্ত করে পেতে চায়, কিন্তু বিবাহ করে তার সঙ্গে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করতে কিছুটা দ্বিধা ছিল। মিনাকুমারী নিরুদ্বেগ জীবন চায়, একজন রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে অনিশ্চিত জীবনে প্রবেশ করতে তার কিছুটা দ্বিধা থাকাই স্বাভাবিক। সতীনাথ ভাদুড়ী মিনাকুমারীর চরিত্রটি বাস্তবতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘকে ভয় পাবেই। অনাথালয়ে পালিতা মিনাকুমারী অভিমন্যুর মত একজন সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে কেবল আবেগের বশে সংসারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। অনাথালয়ের মুনিমজী আর জয়নারায়ণ প্রসাদের কাছে সে বহুদিন থেকেই শুনে আসছে এই সমস্ত শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের ঠকিয়ে নিজেদের পকেট ভরবার জন্য এখানে আসে, কিছু টাকা রোজগারের পর একদিন পালিয়ে যায়। মিনাকুমারীর মনে অহরহ দ্বন্দ্ব চলে, সে যে

শান্তিময় জীবন চায় তা অভিমন্যুকে পেলে পূর্ণ হবে কি না সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হতে পারে না। থানা-পুলিশ, অভাব-অনটন, অনিশ্চয়তা রাজনীতিক কর্মীর জীবনের নিত্যসঙ্গী। মিনাকুমারীর সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনের লোভে অভিমন্যু কি তার রাজনৈতিক জীবন ছেড়ে আসতে পারবে? এ ধরণের নানা সন্দেহ মিনাকুমারীর মনে উঁকি দিতে থাকে, তার হিসেবী মন অভিমন্যুর কাছ থেকে তার বিষয়ে সব কিছু খুঁটিয়ে জেনে নিতে চায়। অভিমন্যুর সংসারে থাকার মধ্যে আছে এক কাকা-কাকীমা, তাও রাজনীতি করার জন্য কাকা-কাকীমা তার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখেন নি। রাজনৈতিক জীবন পরিত্যাগ করে অভিমন্যু যে অন্য কোন চাকুরী করবে এ ধারণা করাও ভুল। এরই সঙ্গে জীবনকে বেঁধে ফেলার মধ্যে বিপদের ঝুঁকি থেকে যায়। তবু অভিমন্যুকে পাবার লোভটাও তার কাছে কম নয়। এই দোটানার মধ্য দিয়েই মিনাকুমারী অভিমন্যুর খুব কাছেই এসে গিয়েছিল। শিউচন্দ্রিকা এ ব্যাপারে কোন কিছুই জানতো না। সে তার শ্রমিক সংগঠন নিয়েই ব্যস্ত। বহু পরিশ্রমের পর ইউনিয়নের শক্তি বাড়তেই সে অনাথালয়ের সঙ্গে 'কেসরপাকে'র পাট চুকিয়ে দিয়েছে। এখন অনাথালয়ের সঙ্গে মিল কর্তৃপক্ষের গোপন সম্বন্ধের কথায় খোলাখুলি ভাবে আক্রমণ করে। ক্যান্টিনে শ্রমিকদের জন্য নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয় বলে ক্যান্টিন ম্যানেজার-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনে। বিষয়টিকে নিয়ে সরকারী উচ্চতর বিভাগে সে নালিশ করে। এই বিভাগেই মিনাকুমারী এবং রুকণী কাজ করে। তারাও পরোক্ষভাবে এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে,—এ কথা রুকণী মিনাকুমারীকে বোঝায় এবং অভিমন্যুও যে এর জন্য দায়ী সে কথা বলে মিনাকুমারীর মন অভিমন্যুর প্রতি বিষিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।

মিনাকুমারীর প্রতি রুকণী ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল। মিনাকুমারীর থেকে সে সুন্দরী হয়েও অভিমন্যুর মনে কোন সাড়া জাগাতে পারে নি। অভিমন্যু মিনাকুমারীকে বিয়ে করে এখান থেকে চলে যাক তাও সে চায় না। একই সঙ্গে তারা অনাথালয়ে বড় হয়েছে, তার মধ্যে একজনের সংসার জীবনের স্বীকৃতি অপরজনের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবনী থেকে জানতে পারা যায় তিনি সোসালিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, এই সময়কার কাটিহার জুট-মিলের শ্রমিকদের অবস্থা

সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কাটিহার জুট মিলের ধর্মঘটের সময় শ্রমিক শোষণের পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা তাঁকে 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি রচনার প্রেরণা দিয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর জীবনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে তদানীন্তন শ্রমিক মালিক বিরোধের দলিল তৈরী করেন নি—কাহিনীর কেন্দ্রে মিনাকুমারী এবং অভিমন্যুর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী এনে উপন্যাসটিতে ট্রাজিডির রস সঞ্চারিত করেছেন। রাজনীতির সঙ্গে শিল্প মনের সংমিশ্রণে 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' একটি সার্থক উপন্যাস হয়ে উঠেছে। অথচ তার জন্য লেখককে কাহিনীর মধ্যে ট্রাজিডির উপাদান সংগ্রহ করতে বিষয়ান্তরে যেতে হয় নি, কাহিনীর মূল ধারার মধ্যে ট্রাজিডির বীজ উপ্ত করেছেন।

মিনাকুমারীর প্রতি অভিমন্যুর দুর্বলতা এবং রুকণীর ঈর্ষা, কর্তৃপক্ষ তাদের কার্য উদ্ধারের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছে। মিনাকুমারীকে দেওয়া অভিমন্যুর একখানা গোপন চিঠি মিলের কুচক্রী অ্যাসিণ্টাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণপ্রসাদ হাতিয়ে নেয়। এই চিঠির বিষয়টা মিনাকুমারী একেবারেই জানতে পারে না। মালিক-মজুরের সভায় শিউচন্দ্রিকার অকাট্য যুক্তির সামনে যখন মিল কর্তৃপক্ষ নাজেহাল হয়ে পড়েছে, তখন জয়নারায়ণপ্রসাদ, অভিমন্যুর চরিত্র হননে ঐ চিঠি অব্যর্থ ভাবে প্রয়োগ করে, শ্রমিক নেতার আসল স্বরূপ উদ্ঘাটন করে শ্রমিকদের সহজেই ক্ষিপ্ত করে তোলে। শিউচন্দ্রিকা পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে সভা থেকে বেরিয়ে আসে। অভিমন্যু ইচ্ছা করলেই সে যে লম্পট নয় এ কথা প্রমাণ করার জন্য মিনাকুমারীর তাকে দেওয়া চিঠিখানা সভার মধ্যে দেখিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতো, কিন্তু জনসমক্ষে মিনাকুমারীর প্রসঙ্গ এনে সে তার ভালোবাসার অমর্যাদা করতে চায়নি; উল্টে ভেবেছে তার মিনাকুমারীকে লেখা চিঠি কর্তৃপক্ষের হাতে কি করে যেতে পারে? মিনাকুমারী কি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? অন্তরে অভিমান নিয়ে মজদুরদের দণ্ডাদেশ মাথায় করে বলীরাম জুট মিল ছেড়ে সে গ্রামের কাজে চলে গেল। অভিমন্যুর অপরিণামদর্শিতার জন্য শিউচন্দ্রিকা তাকে কোন মতেই পার্টিতে রাখার পক্ষপাতী ছিল না, কিন্তু পার্টির অন্যান্য সদস্যদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত অভিমন্যুকে গ্রামের কাজের জন্য শিরনিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। অভিমন্যু নীরবে সমস্ত কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে বলীরামপুর ছেড়ে

চলে গেল। সতীনাথ ভাদুড়ী যখন 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' রচনা করেছিলেন তখন তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন ভারতের মোহ অনেকটাই কেটে গিয়েছিল। শাসকের পরিবর্তনে শোষণের কোন রূপই পালটায় নি, শ্রমিক, কৃষকের অবস্থা অপরিবর্তনীয় থেকে গেছে। অভিমন্যু এবং শিউচন্দ্রিকার মত ঐকান্তিক শ্রমিক কর্মীদেরও নানা চক্রান্তের বলি হতে দেখেছেন। পরাধীন ভারতে বলীরামপুরের ডাক বাংলাটিতে বিদেশী সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিত্য তিরিশ দিন ভিড় লেগে থাকতো; স্বাধীন ভারতেও নানা হাকিম, এস. ডি. ও.-দের ভিড়ে ডাক বাংলো সব সময় সরগরম থাকে। মিল মালিকেরা অফিসারদের রুচি অনুযায়ী ডাক বাংলায় সব কিছুই যোগান দিয়ে তাদের খুশী করতে জানে। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে সতীনাথ ভাদুড়ী দুর্নীতি এবং শোষণের আসল চেহারাটি দেখেছিলেন; কিন্তু অন্তরে ছিলেন তিনি একজন প্রকৃত শিল্পী, এই কারণে কেবল অত্যাচারের নির্মম সত্যই উদ্ঘাটন করেন নি, মোহহীন হলেও তিনি অবিশ্বাসীর দৃষ্টি দিয়ে কিছু দেখেন নি; পরন্তু জীবনের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ ছিল, এই মমত্ববোধ থেকেই তিনি চরিত্রগুলিকে দেখেছিলেন,—সে কারণে পরিবেশ-নিরপেক্ষ ভাবে সৃষ্ট তাঁর অধিকাংশ চরিত্রই জীবনধর্মী হয়ে উঠেছে। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসের অভিমন্যু এবং মিনাকুমারীর মর্মন্তুদ পরিণতির জন্য তিনি কেবল রাজনৈতিক চক্রান্তকেই দায়ী করেন নি, উভয়ের মানস গঠনের মধ্যেই ট্রাজিডির বীজ নিহিত ছিল। ভালোবাসার মান-অভিমানের টানা পোড়েনে দুটি কোমল প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

অভিমন্যু গ্রামে গিয়ে আধিয়াদের নেতা হয়ে ফসলের লড়াই-এ জমিদার আর পুলিশের লাঠিতে গুরুতর আহত হয়ে অচেতন অবস্থায় বলীরামপুর জুটমিলের ইউনিয়ন আপিসে শিউচন্দ্রিকার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। শিউচন্দ্রিকা অনেক চেষ্টা করেও বন্ধুকে বাঁচাতে পারেনি, শেষ শয্যায় গান্ধীজীর হত্যা সংবাদ শুনে তার মৃত্যু হয়েছে। অভিমন্যুর চিতার পাশে শিউচন্দ্রিকা এতদিনের অজ্ঞাত সব কথা জানতে পেরেছে। অভিমন্যুর ঝুলিতে মিনার চিঠি সযত্নে রক্ষিত দেখেছে, রুকণীও তার সব অপরাধ বুঝতে পেরেছে। অভিমন্যুর ভালোবাসার গভীরতা উপলব্ধি করে মিনাকুমারী অনুশোচনা আর আত্মদহনে একেবারে ভেঙে পড়েছে। জীবনে বাঁচার অর্থ তার কাছে এখন মূল্যহীন; একদিন দীক্ষিতদের আম বাগানের নিভৃতে একান্ত করে

অভিমন্যুকে সে পেয়েছিল, সেই আমবাগান তাকে দুর্বার আকর্ষণে টানছে, সেখানেই সে অভিমন্যুকে ফিরে পাবে। এখানেই মিনাকুমারী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসগুলির মধ্যে তিনটি উপন্যাসকে রাজনৈতিক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা যায়। 'জাগরী', ঢোঁড়াই চরিত মানস' এবং 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'। এর মধ্যে 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' শ্রমিক সংগঠনের উপর ভিত্তি করে রচিত। শ্রমিক-মালিক বিরোধের মধ্য দিয়ে লেখক সংযত হাতে করুণ প্রেমের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা উপন্যাসটির মধ্যে গীতি-কবিতার সুর-মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। শিল্পী রূপে সতীনাথ ভাদুড়ীর সার্থকতা এইখানেই।

পাদটীকা

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; 'কালান্তর' [রবীন্দ্র-রচনাবলী : জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ : পৃ. ৩৩৩]।

২। প্রাগুক্ত।

৩। অজিতকুমার ঘোষ : 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য-বিচার : [১৯৬৭] : পৃ. ৩৫৩।

৪। দ্রষ্টব্য : ১নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৩৮৪।

৫। 'মেবার পতন' ['দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী' : সাহিত্য সংসদ সং] : পৃ. ৩৫০।

৬। বিপিনচন্দ্র পাল : 'চরিত্রচিত্র' [১৯৫৮] : পৃ. ১৫৯।

৭। দ্রষ্টব্য : ১নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৩৮৪।

৮। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ; 'ধাত্রীদেবতা'। এই পাদটীকার সংখ্যায় ছাপার ভুল আছে।

৯। নারায়ণ চৌধুরী ; 'গান্ধীজী' [১ম সং] : পৃ. ৬৭-৮।

১০। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : 'কালান্তর'।

১১। 'ভাদুড়ীজী' [সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'সতীনাথ স্মরণে'] : পৃ. ৩৪।

১২। 'জাগরী' ['গ্রন্থাবলী' : ১ খণ্ড : শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত] : পৃ. ১৫৪-৫।

পঞ্চম অধ্যায়

ভ্রমণকাহিনী

সংখ্যায় কম হলেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য সম্ভার সমৃদ্ধশালী। চিরাচরিত প্রথায় আশুতোষ পাঠকের মুখ চেয়ে তিনি কোন কাহিনী রচনা করেন নি। তিনি সাকুল্যে সাতটি উপন্যাস রচনা করেছেন। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে তিনটি উপন্যাসের উপাদান তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। 'জাগরী', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এবং 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' এই তিনটি গ্রন্থ আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে আলোচনাকালে লক্ষ্য করেছি যে ঘটনাবহুল রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যেও তিনি এক জীবনরসপিপাসু শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই তিন উপন্যাসের পর সতীনাথ বৃহত্তর জনজীবনের ব্যাপ্তি থেকে নিজের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে ব্যক্তি চরিত্রের মনের গভীরে তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। রাজনীতির বহির্জগতের কোলাহল থেকে সরে গিয়ে মানব মনের অন্তর্লোকের পরিচয় দেবার জন্য মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সুকঠিন দায়িত্বটি গ্রহণ করেন। 'অচিন রাগিনী', 'সংকট' এবং 'দিগ্‌ভ্রান্ত' এই তিন উপন্যাসে বাইরের বিস্তৃত জনজীবনকে সুকৌশলে এড়িয়ে, কয়েকজনমাত্র নরনারীর অন্তর্লোকের অপার রহস্য সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। এই ভূমিকাতেও তিনি বিস্ময়কর ভাবে সংযত শিল্পী-মনের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর মত মননশীল ব্যক্তি দেশের জন আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের মধ্যে থেকে তৃপ্ত থাকতে পারেন না, পাশ্চাত্য জীবনের রূপ ও রস সন্ধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠাটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই ব্যাকুলতা নিয়েই তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণে যান। এই ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফসল হলো তাঁর 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই লেখক রচনাটিতে একটি স্বতন্ত্রসত্তা আরোপ করেছেন। ভ্রমণকাহিনীর সত্য, বাস্তবসত্য এবং উপন্যাসের সত্য একবস্তু নয়। উপন্যাস এবং ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' এমন একটি রচনা যার মধ্যে উপন্যাসের উপাদানের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তি জীবনেরও মানস প্রকৃতির একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অন্যান্য ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে

সতীনাথ ভাদুড়ীর আলোচ্য গ্রন্থটির পার্থক্য তাই সহজেই চোখে পড়ে। শরৎচন্দ্র যখন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন তখন প্রথমে গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'। ছদ্মনামের আড়ালে নিজের জীবনেরই বিচিত্র ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা সাজিয়ে একটি নিটোল ভ্রমণকাহিনী রচনা করার অভিপ্রায় লেখকের ছিল। লেখক অচিরেই উপলব্ধি করলেন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কাহিনীর সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে উপন্যাসের আকার ধারণ করেছে। এইজন্য তিনি গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে কেবল 'শ্রীকান্ত' নামটি রাখলেন। প্রথম দিকে পাঠকের মনে ধারণা হয়েছিল যে এটি বোধহয় শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী, কিন্তু এ ধারণা যে ঠিক নয় লেখক স্বয়ং যে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র নায়ক 'লেখকে'র সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর মানসিকতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থটির মধ্যে লেখক নিজেকেও অনেকাংশে চিত্রিত করেছেন।

এই কারণে 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'কে সাধারণ ভ্রমণ-সাহিত্যের পর্যায়-ভুক্ত করা যায় না। সতীনাথ ভাদুড়ীর কৃতিত্ব এইখানেই যে, তিনি সামান্য ক-টি গ্রন্থ রচনা করলেও প্রত্যেকটি গ্রন্থ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র সঙ্গে তুলনীয় গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর উন্নত একটি জাতির প্রতিভা, জীবন-যাত্রা এবং মানস প্রকৃতির অন্তর্লোকের উপর আলোকপাত করে নিরপেক্ষ অথচ উদারভাবে বহির্বিশ্বের সামনে তুলে ধরার মত প্রতিভা কিংবা প্রয়াস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই পাওয়া যায়; কিন্তু তিনি তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্যকে কোন ভাবেই উপন্যাসের আঙ্গিনাতে নিয়ে আসেন নি। বাঙলা ভাষায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাকে একটি দেশকে জানা এবং জানানোর জন্য সার্থকভাবে প্রয়াস করে গেছেন। মনীষীরা যে দৃষ্টি দিয়ে একটি দেশ এবং জাতিকে দেখবার চেষ্টা করে গেছেন সতীনাথের দেখা কোনক্রমেই তাঁদের সঙ্গে তুলনীয় নয়—এমন কি অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' বা 'সত্যাসত্য'কে সামগ্রিক ভাবে মিলিয়ে দেখলেও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র সঙ্গে তা তুলনীয় হতে পারে না। সতীনাথ তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং বৈদগ্ধ্যের সাহায্যে লঘু ভাবে ফরাসী এবং ইংরেজদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক বিশেষত্বগুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। সতীনাথ আজীবন ফরাসী ভাষা

এবং সাহিত্যের অনুরাগী এবং একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। ইংরেজী ভাষার কোন সাহিত্যিকের নাম তিনি কদাচিৎ উল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য তিনি ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন কিনা এর কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, তাঁর মানসিক গঠন যতখানি এক জন ইংরেজ জেণ্টেলম্যান-এর সদৃশ ছিল, ততখানি ফরাসীদের সঙ্গে ছিল না। সতীনাথ অবশ্য 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'তে লেখকের বকলমে লিখেছেন: "ইংরাজদের উপর লেখকেরও বোধ হয় অনেক কালের একটা সঞ্চিত বিদ্বেষ আছে।" এই বিদ্বেষ কিন্তু লেখকের কোন রচনাতেই প্রকাশ পায় নি, উপরন্তু লেখক তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি ছোটগল্পে ইংরেজদের যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন এবং তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির রূপায়ণে তিনি বরাবরই নিরপেক্ষ ছিলেন। সতীনাথের রচনায় আর যে ত্রুটিই থাকুক না কেন, তিনি যে একদেশদর্শী ছিলেন, এ অভিযোগ আনা যায় না। পাশ্চাত্ত্য দেশ পরিভ্রমণান্তে সেই দেশের শিল্প-সংস্কৃতি, জাতীয় বৈশিষ্ট্য এমনকি ব্যক্তি মানুষের আচার-আচরণের বিশেষত্ব বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' এবং 'পরিব্রাজক' গ্রন্থ দুটিতে পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ অত্যন্ত সহজ এবং অনাড়ম্বর ভাবে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি যখন 'উদ্বোধন' (১৩০৫-০৬) পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে, তখন এর নাম 'বিলাতযাত্রীর পত্র' ছিল। বিবেকানন্দ একজন কর্মবীর সন্ন্যাসী হলেও তাঁর মধ্যে সাহিত্যিক সত্তা বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু 'বিলাতযাত্রীর পত্র' পরবর্তী কালে 'পরিব্রাজক' নামে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের এই নাম পরিবর্তনেই প্রমাণিত হয় যে এটি সাধারণ বিলাত যাত্রার কাহিনী নয়। ইউরোপ পরিভ্রমণের পটভূমিতে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী', য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি রচনার মধ্যে একটি দেশ এবং জাতিকে জানার প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করেছে। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনার সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ী রচিত 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র বহিরাঙ্গিক কোন সাদৃশ্য নেই এবং লেখক সেরূপ কোন প্রচেষ্টাও করেননি। বহির্বিশ্ব পরিভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ যে বিপুল এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করেছিলেন, তাই তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মধ্যে কবির সৌন্দর্য দৃষ্টি ছিল, সেই দৃষ্টি দিয়ে তিনি চলমান জীবন-ধারার রূপায়ণ করেছেন। তাঁর রসবোধ, ভাষার প্রাঞ্জলতা, মানবচরিত্র বিশ্লেষণের স্বাভাবিক ক্ষমতা 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষায় একটি উচ্চাঙ্গের ভ্রমণ-কাহিনীতে পরিণত করেছে। বিবেকানন্দের মধ্যে কবিত্বশক্তি বর্তমান থাকলেও, তাঁর ভ্রমণকাহিনীর ভিতর দিয়ে ভারতবাসীর মনের অজ্ঞানতা এবং অলসতা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন। মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন নানা আচার এবং সংস্কারের কূপমণ্ডুকতার মধ্যে ভারতবাসীরা নিবীর্য হয়ে পড়েছিল। বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য ভারতবাসীকে বলবান জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা তিনি করে গেছেন। ধর্মের নামে একই জাতির মধ্যে ভেদাভেদ করে আমরা যে ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছি, এই সত্য উদ্ঘাটন করার জন্য তিনি ভ্রমণ-কাহিনীকেও শিক্ষামূলক করে তুলেছেন।

সতীনাথ ছিলেন মূলতঃ সাহিত্যিক। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হৃদয়-বৃত্তিকেও সমান প্রাধান্য দিয়েছেন। এই জন্য তাঁর রচিত 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী' গ্রন্থটিতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে একটি সুমধুর হৃদয়গ্রাহী কাহিনী-বৃত্তও পাওয়া যায়। এই কাহিনী আবার জীবন বহির্ভূত কোন কাহিনী নয়। একেবারে জীবনেরই কাহিনী। একটি সার্থক উপন্যাস হতে গেলে যে যে উপাদানের প্রয়োজন হয়, এই গ্রন্থটিতে সেগুলির অভাব খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। এই কারণে 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না হলেও উপন্যাসের উপাদান যে এতে একেবারেই নেই সে কথা বলা ঠিক নয়।

'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে 'দেশ' পত্রিকাতে ধারাবাহিক ভাবে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৫৭ সালের চৈত্র মাস থেকে ১৩৫৮ সালের শ্রাবণ মাস পর্যন্ত মোট সতেরটি সংখ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' আত্মপ্রকাশ করে। প্রকাশের পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় গ্রন্থটি সম্পর্কে নিম্নরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছিল : "আগামী সপ্তাহ হইতে শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ীর য়ুরোপ পর্যটনের অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় লেখা নতুন রচনা 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইবে। ইহা ভ্রমণকাহিনী না উপন্যাস তাহা রসিক পাঠকরাই বিচার করিবেন।"

পত্রিকা-সম্পাদক রসিক পাঠকবর্গের বিচার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে

গ্রন্থটিকে উপন্যাস কিংবা ভ্রণমকাহিনী কোন বিশেষ প্রকরণে চিহ্নিত করেন নি। লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীও গ্রন্থের নামকরণে তাঁর ভ্রমণের স্থানের নাম উল্লেখ না করে 'সত্যি' শব্দটিকে সংযোজিত করে এক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। গ্রন্থটি উপন্যাস কিংবা নিতান্তই ভ্রমণকাহিনী এই বিচার করার পূর্বে লেখকের সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষত্ব সম্পর্কে একটু সাধারণ ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সমগ্র সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি লঘুভাবে পদ সঞ্চরণ করেন নি, বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য, জীবনবোধের গভীরতা কাহিনীর মধ্যে সবসময়ই একটি অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। এক অর্থে তাঁর সবকটি উপন্যাসই ট্রাজিডি। সর্বত্র বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি না ঘটলেও, সমগ্র আখ্যানবস্তুর মধ্যে একটি করুণ রাগিণী ধ্বনিত হয়েছে। অপর পক্ষে অধিকাংশ ছোটগল্প, এমনকি প্রবন্ধগুলির মধ্যেও তাঁর স্মিত-হাস্যের বিদ্যুচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়েছে। কখনও তীক্ষ্ম ব্যঙ্গে, কোথাও 'নির্মল শুভ্র হাস্যে', কোথাও বা কেবল রঙ্গরসে, কোথাও বা তির্যক ভাষণের বক্র ব্যঙ্গে তাঁর গল্পগুলিকে এক একটি হীরক-খণ্ডের মত কঠিন অথচ দীপ্তিময় মনে হয়। বস্তুতপক্ষে ছোট গল্পগুলিতেই সতীনাথ ভাদুড়ীর বহুমুখী রচনা-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি হাস্যরসকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করেছিলেন তা নয়, কিন্তু তা কখনই বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে ম্লান করে দেয় নি। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' গ্রন্থটি তিনি উপন্যাস রচনার মানসিকতা দিয়ে রচনা করেন নি, এমন ধারণা করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' গ্রন্থেও একটি জীবনধর্মী কাহিনী আছে। ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ফাঁকে ফাঁকে লেখক অতি সুকৌশলে একটি জীবনধর্মী কাহিনীবৃত্ত রচনা করেছেন। কাহিনীটি বিয়োগান্তক এবং নাটকীয়তারও কোন অভাব নেই, কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে জীবনের যে পরিপূর্ণতা পাওয়া যায়, এই গ্রন্থে তার অপ্রতুলতা আছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর রচিত সাহিত্যের বিশেষত্ব, তিনি নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করেন নি, তেমন কোন চরিত্রকে তিনি তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্র বিন্দুতে স্থাপন করেন নি। এমন কি অপ্রধান গুরুত্বহীন বিষয়ের উপরও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' কেবল বিদেশের পটভূমিকাতেই রচিত নয়, এর প্রধান চরিত্র সকলও বিদেশী। অল্প কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ

অপরিচিত জীবনকে নিয়ে উপন্যাসের রূপদান করা সতীনাথের সাহিত্যরীতির বিরুদ্ধ। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি আলোচনা কালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তিনি প্রত্যিটি বিষয়ের খুঁটিনাটির উপর এতটা জোর দিতেন যার জন্য তাঁর উপন্যাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেনি। অল্পদিনের ইউরোপ পরিভ্রমণান্তে সেখানকার মানুষ-জনকে নিয়ে সম্পূর্ণ জীবনধর্মী উপন্যাস রচনা করা সম্ভব নয়। এ ধারণা তাঁর ছিল। এই কারণে তিনি উপন্যাস রচনা না করে ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাকে অভিনবভাবে তাঁর সাহিত্য-শাখায় সংযোজন করেছেন। ভ্রমণকাহিনী সম্পর্কে লেখকের নিজের ধারণা: "ভ্রমণকাহিনী বললেই বুঝতে হবে যে, খানিকটা সত্যের ভেজাল নিশ্চয়ই মেশানো আছে লেখাটার মধ্যে।"[১] ফরাসী দেশ এবং জাতির প্রতি তাঁর কৌতূহল ছিল দীর্ঘকালের। ফরাসীভাষা এবং সাহিত্যপাঠে তিনি যে পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করেছিলেন তারই সঙ্গে চোখে দেখার অভিজ্ঞতাকে মেলাবেন বলেই তিনি পৃথিবীতে এতদেশ থাকতে ফ্রান্সকেই তাঁর ভ্রমণ স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর ধারণায় "ইংরাজের মনটা বেনের আর ফরাসী মনটা কবির। সে শেয়ার কিনতে হলে ইংরাজ কোম্পানির কিনবে, ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে হলে ইংরাজের ব্যাঙ্কে রাখবে, কিন্তু যেসব দেশের লোক ভাবোচ্ছ্বাসের আস্বাদ জানে না সে সব দেশে সে থাকতে চায় না।"[২] সতীনাথ অত্যন্ত সরসভাবে ইংরেজ এবং ফরাসীজাতির তুলনা করেছেন। যথার্থ ভ্রমণ-সাহিত্যের একটা শিক্ষার দিক আছে। ইতিহাসবোধ এবং তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে একটি জাতির সামগ্রিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন করার মত ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল। এই জন্য তাঁদের রচিত ভ্রমণকাহিনীতেও ইতিহাসের সত্য খুঁজে পাওয়া গেছে।

ভ্রমণ-সাহিত্যের প্রধান ত্রুটি এই যে অনেক সময় লেখকের দুর্বল বিশ্লেষণের জন্য পাঠকের মনে অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। সত্যের ছদ্মবেশে মিথ্যার আত্মপ্রকাশ এমন ভাবে ঘটে থাকে যার জন্য পাঠকের পক্ষে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। উপন্যাস পাঠকালে পাঠকের মনে প্রস্তুতি থাকে। লেখকের মানসরাজ্যে বাস্তবের দেখা জীবন যে আকার ধারণ করে তার, সম্ভাব্য-অসম্ভব জীবনের মধ্যে পাঠক নিজেদেরই খুঁজে পায়, কিন্তু ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে স্থানিক মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলবার জন্য লেখকেরা অনেক সময়ই কল্পনাকেই বাস্তব বলে চালাবার চেষ্টা করেন। লেখকের

কথায় : "মিথ্যাটাকে সত্যের মতো করে লিখলে হয় ভ্রমণকাহিনী"।

সতীনাথ ভাদুড়ী পরিহাস করে যাই বলুন না কেন, তিনি যে গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বিদেশ গিয়েছিলেন, তা তাঁর জীবন থেকেই আমরা জানতে পারি। দেশ-বিদেশের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্পর্কে তিনি গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। বিদেশীকে সঠিক ভাবে জানার জন্য পরিশ্রমের সঙ্গে তাদের ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ নেওয়ার পর, স্বাধীনতা-উত্তর কালে ইংরেজের দেশে গেছেন। তাঁর মধ্যে জানার আগ্রহ এবং দেখার নেশাটা প্রবল পরিমাণে ছিল। তিনি আগ্রহ সহকারে ইউরোপীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী কেবল একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বই ছিলেন না, অনায়াসভঙ্গীতে গল্পও সাজাতে পারতেন। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'তে একদিকে তিনি তাঁর বৈদগ্ধ্যের কষ্টিপাথরে পাশ্চাত্য কৃষ্টিকে যাচাই করেছেন, অপরদিকে একটি সুমধুর কাহিনীও রচনা করেছেন। গ্রন্থটি কেবল ভ্রমণ-কাহিনীর মত উপাদেয়ই নয়, সেই সঙ্গে শিক্ষামূলকও। বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভ্রমণকাহিনীগুলির সঙ্গে 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র পার্থক্য এখানেই। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে যেমন রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-সাহিত্যকে পৃথক করা যায় না, তেমনি সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন-ভাবনা থেকে 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী'কে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নিজেকে জানার তীব্র ব্যাকুলতায় কখনও তিনি 'সঙ্কট' উপন্যাসের 'বিশ্বাসজী' হয়ে এসেছেন, আবার 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী'তে 'লেখক' হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

প্রচলিত ভ্রমণকাহিনীর মত সতীনাথ ভাদুড়ীর 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'তে-ও একটি কাহিনী আছে এবং এই কাহিনীর অংশটিতেই উপন্যাসের কিছু কিছু ধর্ম বর্তমান। লেখকের অন্যান্য উপন্যাসগুলির সঙ্গে 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী'র উপন্যাস অংশের সাদৃশ্য নেই। একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে সতীনাথ ভাদুড়ী অল্পসংখ্যক উপন্যাস রচনা করলেও প্রতিটি উপন্যাসে তিনি লোক-চরিত্রের জটিল গ্রন্থিগুলি মনস্তত্ত্ববিদ্-এর ন্যায় উন্মোচন করেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা, গভীর অধ্যয়ন এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে মনস্ক পাঠককে চিন্তার খোরাক দিয়েছেন। তাঁর চিন্তাশীলতার জন্য তিনি 'লেখকদের লেখক'—এই নামে খ্যাত হয়েছেন। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র উপন্যাস অংশ তুলনায় অনেক লঘু

স্তরের রচনা, তবে সমাপ্তিটি করুণ রসাত্মক।

'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র ভ্রমণ অংশের মধ্যে লেখক লঘু ভাবে ইউরোপীয়ান-দের বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশের সংস্কৃতি, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, লোকাচার, সেই সঙ্গে শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে লঘু ভাবে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মাধ্যমে একদিকে লেখকের যেমন রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে তেমনি ইউরোপীয় শিল্প-সংস্কৃতি, এবং ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে তাঁর অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মূলত রোমান্টিক কবি—তিনি মন্ময়ভাবে দেশবিদেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে আত্মগত করে কবির দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। তাঁর রচনার প্রসাদগুণে ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিও দীর্ঘ গীতি-কবিতার মত কাব্য-সুষম হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। অপর পক্ষে সতীনাথ ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তিঁনি সহজ দৃষ্টিতে প্রতিটি বিষয়ের বিদগ্ধ বিচার করেছেন, অথচ কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন নি। ভাষার বর্ণনার দুরূহ বক্তব্যকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। তিনি তন্ময়ভাবে বিষয়ের বিশ্লেষণ করেছেন।

'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র কাহিনী অংশটি অকিঞ্চিৎকর হলেও একটি করুণ প্রেমের কাহিনী লেখক পরিহাস এবং রঙ্গের সঙ্গে বিবৃত করেছেন। সাধারণ প্রেমকাহিনী হলেও লেখক কিছু কিছু স্থানে নরনারীর হৃদয়ের সম্পর্কটিকে কাব্যময় করে তুলেছেন।

গ্রন্থের নায়ক 'লেখক'-এর লেখা অপেক্ষা পড়ার দিকেই বেশী ঝোঁক। লেখক দেশের মানুষের একঘেয়েমী জীবন থেকে পালিয়ে ইউরোপে নতুন জীবনের সন্ধানে এসেছেন এবং বিদেশে এসে দেশী লোকের সংস্পর্শ এড়িয়ে থাকতেই চান, কেননা তা না হলে বিদেশীকে উদার মন দিয়ে নিরীক্ষণ করা সম্ভব নয়। তবু লেখকের পক্ষে ভারতীয়দের এড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। ফ্রান্সে আসার পর প্রথমেই তাঁর আদবানীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। সেই-ই লেখককে প্যারিস দেখাতে চায়, কিন্তু লেখক যে চোখ দিয়ে ফ্রান্সকে দেখতে চান আদবানীর সে চোখ নেই। প্রথমদিকে লেখকের আদবানীর জন্য কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। সতীনাথ ভাদুড়ী আদবানী এবং লেখকের মধ্য দিয়ে একই বিষয়কে ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখিয়েছেন। প্যারিস সম্পর্কে সাধারণ লোকের

ধারণার সঙ্গে লেখকের ধারণা এক হতে পারে না। অধিকাংশ মানুষই দেশের বাহ্যরূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়—দেশ এবং জাতির অভ্যন্তরে প্রবেশের মত ধৈর্য এবং অনুসন্ধিৎসা থাকে না। গ্রন্থের নায়ক 'লেখক' পর্যটকের মন নিয়ে দেশ দেখতে আসেন নি, রীতিমত পকেটের পয়সা খরচ করে জীবনের পুঁজিকে বাড়াবার জন্য এসেছেন। ছেলেবেলায় ফরাসী বিপ্লবের কিশোর সংস্করণ পাঠ করেই ফরাসী দেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে। দেশবিদেশের শিল্প-সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করে প্যারিস-ই যে ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। দেশকে জানতে হলে সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হয়, লেখক এই বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাস নিয়ে তিনি মোটর কারখানার মজুরপাড়ার এক অনামী হোটেলে এসে উঠেছিলেন। সতীনাথ সাধারণ ফরাসী জাতির সঙ্গে যে কেবল ভারতীয়দের, বিশেষ করে বাঙ্গালীদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য খুঁজে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন তাই নয়, তিনি ইংরেজ জাতির সঙ্গে ফরাসীদের চরিত্রগত পার্থক্যগুলি অতি স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দীর্ঘকাল ইংরেজের অধীনে ভারতবর্ষ থাকার জন্য ভারতীয়দের সাহেব সম্পর্কে যে ধারণা জন্মায় তা যে ঠিক নয়, তিনি ফ্রান্সে এসে সেই সত্য উপলব্ধি করেন: "এতদিনের একটা সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ইংরাজ আমাদের বোঝে না, আমরাও ইংরাজদের বুঝি না। ফরাসীরা কিন্তু আমাদের চেনা মানুষ। স্বাভাবিক বলেই তারা এত সুন্দর।"

ইউরোপ ভ্রমণের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে লেখক ইংরেজের কারাগারে বন্দী থাকলেও তিনি ইংরেজের উপর বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে তাদের ত্রুটিগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন নি, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'তে একটি নিটোল কাহিনী আছে; কিন্তু সে কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে ইউরোপীয় জীবনধারার বিশেষত্ব-গুলি নিরপেক্ষ গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন। সে কারণে রচনা কোথাও ক্লান্তিকর হয়ে উঠেনি।

সতীনাথের সাহিত্যের একটি প্রধান গুণ, তথ্যভিত্তিক রচনার মধ্যেও তিনি হৃদয়গ্রাহী জীবনধর্মী কাহিনী রচনা করতে পারতেন। তথ্যের ভারে

কাহিনীর রস কোথাও চাপা পড়েনি। তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বহু কর্মকাণ্ডের মধ্যেও একটি জীবনমুখী কাহিনীই আত্মপ্রকাশ করেছে। 'জাগরী' উপন্যাসে বিপ্লবাত্মক আগষ্ট আন্দোলনের ভিতরও ছোট ছোট চরিত্রগুলি নিজ নিজ সুখ-দুঃখ নিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ঢোঁড়াই-এর সুদীর্ঘ জীবন পরিক্রমার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে বহু মানুষের ভিন্ন জীবনদর্শন স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে ; এমন কি 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসে শ্রমিক-মালিক বিরোধের মত শুষ্ক বিষয়েও অভিমন্যু এবং মিনাকুমারীর প্রেমের কাহিনীটি-গীতি কবিতার মত হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে।

'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র কাহিনী অংশেও একটি নিরুচ্চার্য প্রেমের চিত্র শিল্পীর তুলিকায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অথচ লেখক ভ্রমণকাহিনীতে যে কেবল কাহিনী অংশটিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তাই নয়, পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্নস্থানের শিল্প-সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলির ইতিহাসবিদ্-এর মত মূল্যায়ন করেছেন।

অবিবাহিত ভারতীয় যুবকের সঙ্গে হোটেলের পরিচারিকার ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র নায়ক 'লেখক' প্যারিসের একটি সস্তা হোটেলেই আশ্রয় নেওয়ার পর এই হোটেলেরই সুন্দরী যুবতী পরিচারিকা অ্যানির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে। কাহিনীর নায়ক যে সাধারণ স্তরের লোক নন, অ্যানি তার সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই সে ধারণা করতে পেরেছিল। একজন বিদ্বান লেখক জাতের লোকের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অতিরিক্ত সম্ভ্রমবোধ থাকাই স্বাভাবিক। অ্যানিও লেখকের প্রতি অতিরিক্ত কৌতূহল অনুভব করতো। লেখকের কাছে এসে গল্প করে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নানা কাজ করে দেয়। অ্যানির মধ্য দিয়েই লেখক ফরাসীজাতের বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। ফরাসীরা ইংরেজদের মত তত প্রথা-প্রকরণ মেনে চলে না, তারা সহজ সচ্ছল এবং মিশুকে প্রকৃতির। লেখকের সঙ্গে অ্যানির সাধারণ সহজভাবে মেশার মধ্যে যে কেবল সৌজন্যবোধটুকুই থাকতে পারে লেখক তা অনুমান করতে পারেন নি। এই স্বভাব ভদ্রতাটুকুকেই তিনি অনুরাগ বলে মনে করেছেন। লেখক কিছুদিনের জন্য প্যারিসের বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন, ফেরার দিন অ্যানি তার জন্য

ষ্টেশনে অপেক্ষা করবে, এই আশা তিনি করেছিলেন ; সেই কারণে অ্যানির কাজের ছুটির দিনকে তিনি তাঁর ফেরবার দিন নির্বাচন করেছিলেন, যাতে করে অ্যানির আসতে কোন অসুবিধা না হয়। লেখকের জন্য অ্যানির ষ্টেশনে আসার কোন সঙ্গত কারণ না থাকলেও, এটাই যেন লেখকের কাছে দাবী হয়ে উঠেছিল, তাঁর মনের গোপন স্থানে অ্যানির উপর অধিকার অজান্তে দানা বেঁধে উঠেছিল। ষ্টেশনে অ্যানিকে না পাওয়াতে লেখক মর্মাহত হলেন, তাদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা হতেও তাঁর সময় লাগলো না : 'ওরা অমনি, ওদেশের মেয়েরা লঘুচিত্তের।'

স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই লেখক অ্যানির কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবার চেষ্টা করেন। লেখকের অভিমান দীর্ঘস্থায়ী হল না, কফি বানানোর সূত্রে নতুন করে অ্যানিকে আবিষ্কার করলেন, অ্যানির প্রতি তাঁর ক্ষোভ সহানুভূতিতে ভরে উঠলো। সতীনাথ ভাদুড়ী অনুরাগের পর্বটিকে সূক্ষ্মভাবে আকারে-ইঙ্গিতে কাব্যময় করে তুলেছেন। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' তাই সাধারণ প্রেমের গল্পে পরিণত হয়নি। অ্যানির প্রতি তীব্র অনুরাগ বোঝাতে গিয়ে তিনি লেখককে আস্তে আস্তে প্যারিসিয়ান করে তুলেছেন। প্যারিসের প্রতি লেখকের অতিরিক্ত টান যে আসলে অ্যানির প্রতিই তাঁর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ এ ধারণা রসিক পাঠক সহজেই করে নিতে পারবে। লেখক অ্যানিকে ফরাসীজাতের খাঁটি দুহিতা বলে মনে করেছেন।

লেখকের দেশ থেকে বড় সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্তির টেলিগ্রাম এল, তাতে করে লেখকের থেকে অ্যানিরই আনন্দ হল বেশী। বিদেশে আসার পূর্বে লেখকের ধারণা ছিল ভারতীয়রা বিদেশে এসে শ্বেতাঙ্গিনীদের নিয়ে অকারণ মাতামাতি করে। এগুলিকে লেখক আদিখ্যেতা বলেই মনে করতেন। কিন্তু অ্যানির সংস্পর্শে আসার পর লেখকের সে ধারণা পালটে যায়। অ্যানি যে ধরণের মেয়ে, তাতে তাকে নিয়ে জীবনের বাকী কটা দিন খুবই আনন্দে কাটাতে পারবেন। অবিবাহিত লেখকের মনে অ্যানিকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন উঁকি দিতে আরম্ভ করে। দেশের লোক লেখকের এই কাজকে নিন্দা করলেও তিনি অ্যানির জন্য সব কিছুই ছাড়তে প্রস্তুত। লেখক বই পড়েই বাল্যকাল থেকে ফরাসী দেশকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছিলেন, ফরাসী মেয়ে অ্যানিকে পেলে তাঁর ভালোবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। অ্যানি ফরাসী মেয়ে নয়, সে হিটলারের বিতাড়িত ইহুদি জার্মান, এ-কথা

লেখক জানতে পারলেন। যে ফরাসী দেশকে তিনি বাল্যাবধি ভালোবেসে এসেছিলেন অ্যানি সে দেশের মেয়ে নয়, কিন্তু ততদিনে লেখক অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন, তিনি অ্যানিকেই জীবন-সঙ্গিনী রূপে পেতে চান। ফরাসী জাতের মধ্যেও অনেক দোষ ত্রুটি আছে, এই সত্য তিনি এতদিনে আবিষ্কার করলেন। রেসকোর্সে গিয়ে লেখক একদিন অ্যানিকে অন্য এক পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে আলাপরত দেখে আঘাত পেলেন, দুজনকে ঠিক বন্ধু বলে মনে হল না। অ্যানির এ-ধরনের আচরণকে মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি প্যারিস ছেড়ে ইতালিতে চলে গেলেন। ইতালিতে অনেক কিছু দেখলেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশে এসেছিলেন অ্যানির স্মৃতি সেই উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন ঘটাতে আরম্ভ করলো, লেখক আবার প্যারিসে ফিরে গেলেন। তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন—আর দেরী করবেন না, সরাসরি অ্যানির পাণিপ্রার্থনা করবেন। হোটেলে এসে শুনলেন অ্যানি বিবাহিতা ; এ সংবাদ অ্যানির স্বামীই লেখককে দিল, কেবল তাই নয়, তিনি নিজেদের পুত্রের মৃত্যু সংবাদ-নিয়ে এসেছেন। অ্যানির এমন দুঃসময়ে লেখক দূরে থাকতে পারেন না, অ্যানি নিশ্চয়ই লেখকের দর্শন চায়, লেখকের কাছে সহানুভূতি আশা করে। লেখক অ্যানির পুত্রের সমাধিস্থলে গেলেন : "অ্যানি ফিরে তাকালো লেখকের দিকে। কালোজালের মধ্য দিয়েও অ্যানির কালো চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে ;" অ্যানির চোখের অব্যক্ত ভাষা লেখকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। পাঠকও বুঝতে পারে কাহিনীর সমাপ্তিতে লেখক কিসের ইঙ্গিত করেছেন। অ্যানি লেখককে বলেছিল জার্মানি যেতে, লেখক সেখানেই যাবেন, যদিও বিদেশে আসবার আগে জার্মানীতে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই লেখকের ছিল না।

'সত্যি ভ্রমণকাহিনীতে' যেমন একটি কাহিনীর অংশ আছে, তেমনি এর মধ্যে দেশ-বিদেশের শিল্প-সংস্কৃতির পরিচয়ও আছে। ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান, ইতালীয়দের জাতীয় শিল্প-সভ্যতার জ্ঞানগর্ভ বিবরণ লেখক অতি স্বচ্ছন্দ ভাবে প্রকাশ করেছেন। ভ্রমণকাহিনীর কাছে পাঠকের দাবি অনেক। কাহিনীর সঙ্গে লেখকের নিজের চোখে দেখা এবং না দেখা জগতের সৌন্দর্যেরও পরিচয় পেতে চায়। সতীনাথ প্রথাগত নিথর প্রকৃতি-বর্ণনায় সময় ব্যয় করেননি, পরিবর্তে তিনি জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির বিবরণ দিতে এতটা ব্যস্ত ছিলেন, যার ফলে ভ্রমণকাহিনীর রসহানি ঘটেছে।

"মানুষের অধিকার'-এর দেশ বলেই সাধারণ লোককে শ্রদ্ধা করা এদেশের শিক্ষিত লোকেদের একটা সহজাত প্রবৃত্তির মতো হয়ে গিয়েছে। অ্যাকাডেমির সদস্য নামজাদা সাহিত্যিকরা এইজন্য দৈনিক কাগজে নিয়মিত লেখেন। রবিবাবু, শরৎবাবু দৈনিক আনন্দবাজারে লিখছেন, এটা আমরা ভাবতেই পারি না। এ দেশের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকরা চিরকাল চেষ্টা করে এসেছেন, এমন ভাষায় তাঁদের জটিল বিষয়গুলি লিখতে যাতে সাধারণ লোকে চেষ্টা করলে বুঝতে পারে।" এই তথ্য পরিবেশনের জন্য প্যারিস ভ্রমণের প্রয়োজন ছিল না, তা পুঁথিলব্ধ জ্ঞান থেকেই জানতে পারা যায়। কিংবা, "রাজনীতির দাবার ছকে নিজেদের স্থানের চেয়েও বড় মান আছে পৃথিবীতে, এ কথা ফরাসীরা চিরকাল জানে। মুশকিল হয়েছে যে আজকাল টান পড়েছে সেখানেও। ১৯১৪ সালের পর থেকে ফ্রান্স বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ছয়বার—পোল্যাণ্ডের লোক মাদাম কুরিকে ধরে। ১৯৩৫ সালের পর থেকে ফ্রান্স মোটেই পায়নি। জার্মানী পেয়েছে উনচল্লিশবার আজ পর্যন্ত। গত যুদ্ধের পরের এই দুর্দিনেও ইংলণ্ডের পাঁচজন নোবেল প্রাইজ পেয়েছে বিজ্ঞানে।" এ তথ্যও ঘরে বসে জানতে পারা যায়।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' প্রচলিত অর্থে ভ্রমণকাহিনী নয়। এই গ্রন্থে একদিকে তাঁর যেমন জ্ঞানপিপাসু মনের সন্ধান পাওয়া যায়, অপরদিকে তেমনি তাঁর সাহিত্যিক রসবোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়। জ্ঞানবিজ্ঞান, ইতিহাস-সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ের তথ্যের ভারে ভ্রমণরস গ্রন্থের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ফুটে উঠতে পারেনি, কিন্তু কাহিনী অংশটির সাহিত্য-মূল্য স্বীকার করতেই হয়।

পাদটীকা

১. শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত: 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী' ৪ খণ্ড: পৃ. ২৩২।

২. প্রাগুক্ত: পৃ. ২২৮।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ছোটগল্প

প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক রূপে সম্মানিত বলে সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পগুলিকে অনেকেই গৌণ বলে মনে করে থাকেন ; কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। সতীনাথ অনেকগুলি অসাধারণ ছোটগল্প রচনা করে গেছেন যার যথার্থ মূল্যায়ন আজও হয়নি।

সতীনাথের ছোটগল্পের সংখ্যা মোট উনষাটটি। এই উনষাটটি গল্প সাতখানা গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। প্রকাশ-কালের ক্রমানুযায়ী গ্রন্থ তালিকাটি নিম্নরূপ : ১। গণনায়ক (১৯৪৮)। ২। চিত্রগুপ্তের ফাইল (১৯৪৯)। ৩। অপরিচিতা (১৯৫৪)। ৪। চকাচকী (১৯৫৬)। ৫। পত্রলেখার বাবা (১৯৬১)। ৬। জলভ্রমি (১৯৬২)। ৭। অলোকদৃষ্টি (১৯৬৪)।

সংখ্যার দিক থেকে নিতান্ত কম না হলেও ছোটগল্পকার হিসাবে সতীনাথের পরিচিতি নিতান্তই অল্প। অথচ তাঁর গল্পগুলি প্রচলিত এবং জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। সাময়িক পত্রে গল্পগুলির প্রকাশসূচী এইরকম : 'চকাচকী' [দেশ। ১৫ শ্রাবণ ১৩৬১], 'বৈয়াকরণ' [দেশ। ২৯ পৌষ ১৩৬২], 'ডাকাতের মা' [যুগান্তর। শারদীয় ১৩৬১] 'মুষ্টি যোগ' [দেশ। শারদীয় ১৩৬১], 'তবে কি' [দেশ। ১৬ আষাঢ় ১৩৬৩] 'পত্র লেখার বাবা' [দেশ। ১৪ আষাঢ় ১৩৬৪], 'বাহাত্তুরে' [দেশ। শারদীয় ১৩৬৬]।

প্রায় অধিকাংশ গল্পই প্রচলিত এবং জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও লেখকের পাঠক সংখ্যা কেন এত কম, তা ভাববার বিষয়। বিশেষ করে লেখক যখন অপরিচিত নন। কেননা বাংলা ভাষায় সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক সাহিত্য-পুরস্কার রবীন্দ্র-পুরস্কার নিয়েই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। অথচ তিনি আশানুরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যদি আমরা মনে করি গল্পগুলির মধ্যে সর্বজনীন আবেদন নেই বা সেগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি তাহলে বিচারে ভুল হবে। আসলে তাঁর গল্পগুলির কাল, পাত্র-পাত্রী এবং ভৌগোলিক অবস্থান বাঙালী পাঠকের কাছে বিশেষ পরিচিত নয়। তার ভৌগোলিক অবস্থান বিহার প্রদেশ এবং পাত্র-পাত্রীরা সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের।

বাঙ্গালীর সুপরিচিত পারিবারিক জীবন, কোলাহল মুখরিত কলকাতা মহানগরীর মানসিকতা, যার সঙ্গে সাধারণতঃ বাঙ্গালী পাঠক পরিচিত তা সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পে অনুপস্থিত। বাঙ্গালী পাঠক বিহারের গ্রাম্য-জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র এমন কি রবীন্দ্রোত্তর অধিকাংশ বাংলা সাহিত্যে যে বাঙ্গালা দেশ এবং বাঙ্গালীর জীবন পাওয়া যায়, সতীনাথের গল্পে তার অভাব থেকে গেছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পে বাঙ্গালী থাকলেও তারা প্রবাসী—আর বাংলার জীবন তো নেই-ই। অথচ সতীনাথ বাংলা ছোটগল্পের আঙিনাকে বহুদুর বিস্তৃত করে দিয়েছেন। বৈচিত্র্য এবং স্বাদে নতুনত্ব এনেছেন। পঞ্চাশোত্তর বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা করলে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি যে, বাংলা ছোট-গল্প বৃহত্তর জনমানস থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে এবং সেখানে শহরের মধ্যবিত্ত সমাজ স্থায়ী আসন লাভ করছে। গ্রাম-গঞ্জের ধুলোমাটি ঝেড়ে সাহিত্য-লক্ষ্মী শহরের সৌখীন পোশাক পরে ড্রয়িংরুমে আশ্রয় গ্রহণ করছেন। ব্যতিক্রম অনেক ছিল। কিন্তু সতীনাথ অনন্য ছিলেন। তিনি মাটি আর মানুষের কাছাকাছি থাকতেই ভালবাসতেন। আবার সে মাটি বাংলার উর্বর মাটি নয়, বিহারের শুষ্কমাটি। অনুর্বর শুষ্ক প্রকৃতিতে তিনি সজীব প্রাণের জন্ম দিয়েছেন। সতীনাথ গ্রাম বিহারের সুদক্ষ চিত্রকর ছিলেন। পাত্র-পাত্রীরা, এমন কি তাদের মুখের ভাষাও আমাদের পরিচিত নয়, এই ভাষাও তাঁর জনপ্রিয়তার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। আসলে বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে তিনি নিজস্ব ধারায় গল্পগুলি রচনা করেছেন, ঐতিহ্যবিলাসী বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ তাই তাঁকে জাতীয় করে নিতে দ্বিধা বোধ করেছে।

'গণনায়ক' গল্পটি সতীনাথের প্রথম গল্প। এটি ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত। 'গণনায়কে' কোনো সুনির্দিষ্ট কাহিনী নেই। সতীনাথ তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'তে প্রাক্-স্বাধীনতা সময়ের ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাকার জন্য গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভাবনাকে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'গণ-নায়ক' গল্পটিও তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার ফল এবং 'জাগরী' উপন্যাসের রাজনৈতিক ভাবনার পরিশিষ্ট বলা চলতে পারে। সতীনাথ কংগ্রেসী

রাজনীতির মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থের সম্পর্ক এবং ব্যবসায়ীদের বড় ভূমিকা লক্ষ্য করে কিছুটা বীতশ্রদ্ধ হয়েই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাজনীতির সঙ্গে সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল্য হিসাবে দেশ বিভাগকে তিনি সাধারণ কংগ্রেস কর্মীর মত মেনে নিতে পারেন নি। দেশ বিভাগের ফলে প্রকৃত লাভবান কারা হলেন সে কথাই 'গণনায়ক' গল্পটির মধ্যে তিনি বলতে চেয়েছেন। 'জাগরী' উপন্যাস রচনাকালে তিনি যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাঁর এ-স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। এই কারণে 'গণনায়ক' গল্পটি মুখ্যত ব্যঙ্গাত্মক। কিন্তু সাধারণ ব্যঙ্গাত্মক রচনার সঙ্গে গল্পটির প্রধান পার্থক্য এই যে, ঘটনা এবং চরিত্র-চিত্রণে তিনি গভীর সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন, যা সাধারণ ব্যঙ্গাত্মক রচনায় পাওয়া যায় না। দেশ-বিভাগকে কেন্দ্র করে কারো উল্লাস, কারো বেদনা, এই দুই বিপরীতধর্মী অবস্থার তিনি কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন। পূর্ণিয়া জেলার গোপালপুর থানা এবং দিনাজপুর জেলার শ্রীপুর থানা, তার মাঝে নাগর নদী।

এই নাগর নদীর উপর দীর্ঘকালের পুরাণো নড়বড়ে কাঠের পুল। এই নদীই একদিন ভারত-পাকিস্তানের বিভাগ সীমারেখা হল। উভয় অংশের জনসংখ্যা হিন্দু ও মুসলমান মিশ্রিত। মুনীমজী স্থানীয় বড় ব্যবসাদার। কেবল তিনি ব্যবসাদারই নন, এই অঞ্চলের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁরই নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকে। আসল উদ্দেশ্য তাঁর ব্যবসায় মুনাফা করা, এই অধিক মুনাফার উদ্দেশ্যেই তিনি কালো-বাজারে ব্যবসা করেন। স্থানীয় ইজারাদার মুসলমান। তিনিও চান এই সুযোগে কিছু বেশী লাভ করা। মুনীমজীর সঙ্গে গোপন বৈঠকে চিনির চোরাকারবার নিয়ে দরকষাকষি করেন। উভয়েই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অভিভাবক হিসাবে প্রতিযোগিতায় নামে। উদ্দেশ্য একটাই, রিলিফের টাকা যাতে তাদের হাত দিয়েই খরচ হয়। দেশ বিভাগের জন্য যেখানে বহু মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় পথে ঘাটে অনাহারে মারা যাচ্ছে, সে সময় মুনীমজী তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে দু-পয়সা রোজগার করছেন ; দেশ-বিভাগ তাঁর কাছে ব্যবসায়ের সুদিন ছাড়া আর কিছু নয়। 'গণনায়ক' গল্পটির প্রধান বিশেষত্ব হল যে গল্পটিতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্বরূপ প্রকাশ পেলেও এটি একটি নির্ভেজাল ব্যঙ্গাত্মক রচনা নয়,

মাঝে মাঝে তিনি অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দান করে গল্পটিকে জীবনমুখীকরে তুলেছেন। পীরপুরের দর্পণ সিংকে দেশবিভাগ হওয়াতে পুলের এপার চলে আসতে হয়, আসার সময় বাড়ীর অনেক কিছুই ফেলে অথবা ভেঙ্গে আসতে হয়েছিল। দর্পণ সিং-এর স্ত্রী নিজের মনে মনেই বকছিল: "লক্লকে কুমড়ো গাছটা থেকে প্রাণে ধরে এতদিন একটা ডগা, ডাঁটা খাওয়ার জন্য কাটতে পারিনি। সেটাকে দিয়ে এলাম গোড়া থেকে কেটে বঁটি দিয়ে। বলদ জোড়াও ভয় পেয়েছিল নাকি, কুমড়োর ডগা এগিয়ে দিতে শুঁকে মুখ ফিরিয়ে নিল।" আমাদের দেশে কথায় বলে, বাড়ীর গরু বাড়ীর ঘাস খায় না, তার যে একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণও আছে, এখানে লেখক তাই গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছেন। এত সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ ক্ষমতা সতীনাথ ভাদুড়ীর মধ্যে থাকাটা কিছুটা আশ্চর্যের কথা। উচ্চ বংশোদ্ভূত হয়েও গ্রামের কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়কেও তিনি উপেক্ষা করেন নি, রাজনীতির সূত্রে তিনি বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন সত্য, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে পর্যাপ্ত বাস্তব জ্ঞান সঞ্চয় করার মধ্যে তাঁর জীবন সম্পর্কে অপার কৌতূহল-তৃষ্ণাই প্রকাশ পায়। 'গণনায়ক' গল্পে তিনি কেবল মানুষের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির কথা কিংবা ব্যবসায়ী মানুষের হীন স্বার্থপরতার চিত্রই ফুটিয়ে তোলেন নি, তার সঙ্গে দেশ ছাড়ার ব্যথা-বেদনার ছবিও তুলে ধরেছেন।

প্রথাসিদ্ধ কাহিনী না থাকলেও 'গণনায়ক' গল্পটির মূল্য কম নয়। তিনি গল্পটিতে বহু চরিত্র এনেছেন। অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে তিনি গ্রামের নিরক্ষর মানুষদের মানসিকতার বিশ্লেষণ করেছেন। সংলাপেও আন্তরিকতা অত্যন্ত প্রকট। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বীরভূমের সকল আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর সাহিত্যে উপস্থিত, তেমনি সতীনাথের কাহিনীতে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা তার সকল আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই হাজির হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদানে তারাশঙ্কর অপেক্ষা সতীনাথ ভাদুড়ীর কৃতিত্ব অধিক, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়; কেন না, তারাশঙ্কর বাংলাদেশেরই একটি অঞ্চল যে রাঢ়—সেই অঞ্চলের মানুষের বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়ে তুলেছেন; কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের জীবনের আঞ্চলিক বিশিষ্টতাকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তাদের জীবনের এমন নিখুঁত পরিচয় দান করেছেন যাতে করে মনে হয় তিনি যেন তাদেরই

একজন, এমন কি তাদের নিম্নতম স্তরের যে জীবন, তারও রহস্য তিনি উদ্ধার করেছিলেন।

'গণনায়ক' গল্পের আর একটি প্রধান গুণ, যদিও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক চেতনার উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানের উদ্ভব হয়েছিল এবং এই গল্পটির মধ্যে নিরক্ষর গ্রামবাসীর উপর তার প্রতিক্রিয়ার কথা আছে, তথাপি-এর মধ্যে লেখকের কেনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পায় নি। তিনি দেশ বিভাগে যেমন হিন্দুর অন্তর্বেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন, গ্রাম্য নিরক্ষর মুসলমানেরও অন্তর্বেদনা তেমনই সহানুভূতির সঙ্গেই অনুভব করেছেন, যা লেখকের গান্ধীবাদী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠারই ফল।

'বন্যা' 'গণনায়ক'-এর সমগোত্রীয় রচনা। স্থান, কাল, পাত্র-পাত্রীরা প্রায় 'গণনায়ক' গল্পটির মত। গ্রাম্য মানুষের স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা এবং পরস্পর দলাদলির উপর 'গণনায়ক' গল্পটি রচিত। 'বন্যা' গল্পটির পাত্র-পাত্রীরা কুশী নদীর বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সাময়িক ভাবে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ সোপানে উঠেছিল ; বন্যা-শেষে আবার পূর্বেকার ক্ষুদ্রতার কূপে নিমজ্জিত হল। বিহারের জাতিভেদ প্রথা এবং নীচ স্বার্থ-সিদ্ধির কোন্দলে লিপ্ত মানুষের বাস্তব রূপ গল্পটিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মানুষের চরিত্রের অন্তর্নিহিত আপাতবিরোধের চরিত্রায়ণে লেখক বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। আলোচ্য গল্পদুটির প্রধান বিশেষত্ব হল কোন ব্যক্তি বিশেষের সুখ, দুঃখ, স্বার্থ, দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ এখানে করা হয়নি, সমষ্টিগত ভাবে বিশেষ শ্রেণীর মানুষের চরিত্র বিশ্লেষিত হয়েছে।

রবীন্দ্র-প্রবর্তিত বাংলা ছোটগল্পের ধারা বা ত্রিশ-চল্লিশ দশকের প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ধারার সঙ্গে সতীনাথের গল্পের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নেই। তিনি সক্রিয় ভাবে রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন রাজনৈতিক মতবাদ অথবা নবলব্ধ পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শন অবলম্বন করে কোন তত্ত্বভিত্তিক কাহিনী রচনা করেন নি,—কর্মজীবনে যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, সমষ্টিগত ভাবে তাদের পরিচয় প্রদান করেছেন। প্রকৃতি এবং মানুষ, ভিন্ন প্রদেশের হওয়ার জন্য বাংলা ছোটগল্পের ধারার সঙ্গে তার যোগসূত্র খুব ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।

লেখক 'বন্যা' গল্পটিতে বিহারের অনগ্রসর সমাজের সামাজিক সমস্যার

সঙ্গে মানুষের সুপ্ত বৃত্তিগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ অতি বাস্তবানুগ ভাবে করেছেন। কুশী নদীতে বন্যা হওয়ার ফলে রসিকপুরা গ্রামের মানুষেরা নিরাশ্রয় হয়ে প্রথমেই গ্রামের মধ্যে উচ্চস্থানে সাময়িক ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে রিলিফ পার্টির নৌকাতে করে সরকারী ব্যবস্থাপনায় রিলিফ ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বিহারের অন্যান্য অনগ্রসর গ্রামের মতই রসিকপুরা গ্রামেও নানা জাতের বাস। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, তিয়র ছাড়াও ধাঙড়, মুসহর, বাঁতার, তাৎমা এবং মুসলমান প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষও আছে। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে বড় চাষী নৌখে ঝা, এবং তিয়র সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় চাষী সুমৃৎ তিয়র এরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মাতব্বর শ্রেণীর লোক। কুশীর বন্যায় ঘর-বাড়ী জোত, জমি ভেসে গেলে এরা রিলিফ ক্যাম্পে জাতিগত বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের অনেক কাছে আসে। নৌখে ঝা, সুমৃৎ এবং মনিরুদ্দি অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে, নিজেদের গ্রামের মেয়েদের পাহারা দেয়। নৌখে ঝার পুত্রবধূর প্রসব বেদনা উঠলে সুমৃৎ তিয়রের বৌ আঁতুড়ের ব্যবস্থা করে, সুমৃৎ তিয়র দৌড়ে রিলিফ কমিটিতে খবর দেয়। বিপদের দিনে সমস্ত গ্রামটা একটি পরিবারে পরিণত হয়। কিন্তু এতগুলি জাতি একত্রিত বসবাস করলেও নিজের নিজের জাতের বৈশিষ্ট্য ছাড়তে পারে না। সতীনাথ অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে প্রত্যেকটি জাতের বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে দেখিয়েছেন। গোটা গ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায় একটি জনতায় পরিণত হয়নি, বরং আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যও যথাসম্ভব রক্ষা করেছে। বিহারের গ্রামে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত বৈষম্যের সূক্ষ্ম বিভেদটুকু লেখকের দৃষ্টিবহির্ভূত হয়নি। তারাশঙ্কর রাঢ় অঞ্চলের নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির বাস্তব রূপায়ণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সতীনাথ ভিন্ন প্রদেশের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের বৈশিষ্ট্য এমন সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন যাতে মনে হয় তিনি যেন আজীবন তাদের মধ্যেই বসবাস করেছেন। আসলে সতীনাথের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁর দৃষ্টিতে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল, সামান্য বস্তুও তাঁর কাছে বড় হয়ে ধরা দিত। 'বন্যা' গল্পটিতে একদিকে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষজন সম্পর্কে তাঁর সম্যক্ জ্ঞান এবং অপরদিকে গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাই।

একদিন বন্যার জল সরে যায়, তারপর "এ কয়দিনে বন্যার স্রোতে, গ্রামের

কলহ, মনের পঙ্কিলতা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্লাবনের বিশালতার মধ্যে গ্রামীণ মনের সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। পরের দিন গোবরাহা দিয়ারার কালো মাটি জলের মধ্য হইতে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে কয়দিনের অবচেতন স্বার্থলোলুপ কিষাণ মন আবার চেতন হইয়া উঠে।"

এরপর রিলিফ ক্যাম্প থেকে ঘরে ফেরার পালা। এই সময়ের অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক প্রত্যেকটি শ্রেণীর মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বাস্তবানুগ রূপদান করেছেন: "যে যাহা পারে সঞ্চয় করিতেছে। সাঁওতাল-দের জন্য বীজের কথা, না নৌখে ঝা, না সুমৃতের মনে আসে। বিরসা মাঝি গরুর জন্য ফিনাইল চুরি করিয়া মাটির গেলাসে রাখে। মঙ্গল মুসহর রিলিফের বাবুদের কাছে চুপি চুপি ইহার খবর দিয়া আসে। পাংরুণীর ছাগলটা শুকনো শালপাতা চিবাইতে ছিল। গোকুল তিয়র এদিক ওদিক তাকাইয়া তাহার পেটে সজোরে এক লাথি মারে। তুরিয়া বাঁতারের পুত্রবধূ কাপড়ের আঁচলে আধসেরটাক নুন বাঁধিয়া রাখিয়া ছিল। তাহা ভিজিয়া উঠিয়াছে।"

এই হট্টগোলের মধ্যে সুমৃৎ তিয়রের স্ত্রী লক্ষ্য করলো তার রোদে শুকোতে দেওয়া কাপড়টা আর পাওয়া যাচ্ছে না। সুমৃৎ তিয়রের স্ত্রী ব্রাহ্মণ মহিলাদের শুনিয়ে বললে "যত চোরের আড্ডা", বোধহয় কোন মুসহরনী কাপড়টি চুরি করে নিয়ে গেছে; এই মনে করে সুমৃৎ তিয়রের স্ত্রী শেষবারের মত আঁতুড় ঘরে নৌখে ঝা-র পুত্রবধূকে দেখতে গিয়ে তার চুরি যাওয়া শাড়ীটা সেখানে আবিষ্কার করলো। "তিয়র গিন্নির মাথায় রক্ত চড়িয়া যায়। বৌটির সহিত দেখা করিবার কথা আর মনে থাকে না। বন্যার স্রোতের মতো গালির স্রোত বহিতে থাকে।"

যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সমাজের অন্যান্য জাতির কাছে শ্রদ্ধা প্রত্যাশা করে, নীচবর্ণের মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে, সেই ব্রাহ্মণই প্রয়োজনে কাপড় চুরি করতে দ্বিধা করেনি। বিদেশ বিভূঁয়ে আঁতুড়ে কাপড় সংগ্রহ করা অসম্ভব এ কথা সত্য হতে পারে, তথাপি ব্রাহ্মণ গৃহিণীর মধ্যে নীচুজাতের কাপড় চুরি করবার মনোবৃত্তি কি করে জাগতে পারে? নিতান্ত স্বাভাবিক মানবীয় স্বভাবই সতীনাথ ভাদুড়ী এখানে প্রকাশ করেছেন। গল্পটি বর্ণনাত্মক হলেও এখানে সতীনাথের বিহারের সমাজ-জীবন-নির্ভর একটি সূক্ষ্ম জীবন-দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। তিয়র গিন্নি তার কাপড়টি চুরি যাওয়ার জন্য সমাজের

দরিদ্র এবং নিম্নতম জাতি মুসহরের মেয়েদের সন্দেহ করল। সে কল্পনাও করতে পারেনি বামুন গিন্নি এ কাজ করতে পারে। তিনি সম্পন্ন এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহিণী, কেউ তাকে এ বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে না, কিন্তু সতীনাথ পরিবেশটি এখানে এমনই সৃষ্টি করেছেন যে তাতে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এখানে তাদের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ পরিবারের গৃহিণীকে দিয়ে নিম্নজাতির একটি পুরানো কাপড় চুরি করিয়ে কাহিনীটিকে একটি নাটকীয় পরিণতির সম্মুখীন করেছেন। ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করলেই কেউ মহৎ চরিত্রের অধিকারী হয় না, তার পরিবেশ তাকে মহত্ত্ব কিংবা নীচতার মধ্যে স্থাপন করে। এখানে বামুন গিন্নির আর কোনো উপায় ছিল না, তাই তার মনের মধ্যে আদিম স্বার্থপরতার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল, সেখানে তিনি ব্রাহ্মণ নহেন, নিরুপায়া এক নারী। উচ্চকুলে জন্ম বলেই কেউ মহত্ত্ব দাবী করতে পারে না ; কারণ, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের মহত্ত্ব কিংবা নীচতার জন্য দায়ী। বামুনগিন্নি কুল এবং সম্পদের জন্য সম্মানিত ছিলেন, কিন্তু তিনি অবস্থা বিপর্যয়ে এমন একটি পরিবেশে এসে পড়লেন, যেখানে সব কিছুই তার কাছে অর্থহীন হলো, তাকে বাধ্য হয়ে নিম্নজাতির একখানি পুরোণো কাপড় চুরি করতে হলো। সুতরাং এই কাহিনীর শেষাংশে যাদের চিরদিনই 'ছোটজাত', সুতরাং 'চোরচোট্টা' বলে গালাগালি দেওয়া হতো তারাই যখন 'বড়জাত'-এর মধ্যে চুরি ধরে ফেল্‌ল, তখন তারা তাকে ক্ষমা করতে পারল না। তার অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা না করেই তার উপর বন্যার স্রোতের মত গালাগালি বর্ষণ করতে লাগল। সেখানকার সমবেত সকল 'নিম্নজাতি'র সমাজ তাকে ধিক্কার দিয়ে উঠ্‌ল। সমাজের সকল অপকর্মের জন্য অপবাদের বোঝা যাদের মাথায়, তারাই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। বিহারের জাতিভেদের মর্মমূলে সতীনাথের এই বিশ্বাসটুকু বিশেষ মূল্যবান।

সতীনাথ ভাদুড়ীর রচিত গল্পগুলির মধ্যে 'আণ্টা-বাংলা' সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের রচনা। ১৩৫৪ সালে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকাতে গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পটি মূলতঃ রোমান্টিক। কাহিনীকাল দীর্ঘসময়ব্যাপী বিস্তৃত, প্রায় তিন পুরুষ স্পর্শ করেছে। বহু চরিত্র এবং বহু ঘটনা নিয়ে রচিত 'আণ্টা-বাংলা' গল্পটিতে একদিকে যেমন উপন্যাসের ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়, অপরদিকে তেমনি জীবনের সম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। গল্পটির সূচনা

বিহারের নীলকর সাহেবদের স্বর্ণযুগের সময়ে। বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে যেমন বাংলাদেশের কৃষকদের উপর নীলকর সাহেবদের নির্মম অত্যাচারের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়, 'আণ্টা-বাংলা' গল্পটিতে তেমনি বিহারের নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু 'নীলদর্পণ' নাটকের সময়সীমা অল্প, এই অল্প পরিসরে নাট্যকার নীলকরদের অত্যাচারের রূপটি এবং সেই সঙ্গে অত্যাচারিতের প্রতিবাদের ব্যর্থ চেষ্টার একটি নাটকীয় সংঘাত দেখিয়েছেন, কিন্তু 'আণ্টা-বাংলা' গল্পে সতীনাথ অত্যাচারী নীলকরদের সঙ্গে অত্যাচারিতের সংঘর্ষের মধ্যে যান নি, উপরন্তু নীলকর প্রভুদের নির্দয়তা ও দাপটকে তারা কিভাবে জীবনে সহ্য করে গেছে এবং সেইসঙ্গে নীলকর প্রভুদের ঐশ্বর্য এবং বিলাসের সঙ্গে নিজেরা কেমন করে একাত্ম হয়ে গেছে তারই করুণ এবং বিষাদঘন অবস্থার পরিচয় দিয়েছেন আসলে 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকরসাহেবদের চরিত্রের কেবল একটি দিকই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, কিন্তু 'আণ্টা-বাংলা' গল্পে সতীনাথ নীলকরদের সমগ্র ইতিহাস ঘটনা-পরম্পরায় আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে প্রায় অনাবিষ্কৃত এই ইতিহাসটির পরিচয় বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরার জন্য লেখকের কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সতীনাথ এবং তাঁর পিতা ইন্দুভূষণ পূর্ণিয়া কোর্টের ব্যবহারজীবী ছিলেন,এই সূত্রেই সম্ভবতঃ সতীনাথ নীলকরদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ার কিছু নথিপত্র হাতে পেয়ে থাকবেন। তিনি তাদের পূর্বের অবস্থা থেকে সম্পত্তির বর্তমান অবস্থাকে গবেষকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বিবৃত করে গেছেন, কিন্তু তথ্য ভারাক্রান্ত হয়ে গল্পটি কোথাও সাহিত্যগুণ বিবর্জিত হয় নি।

তরাই অঞ্চলের নীলকর সাহেবদের প্রতিষ্ঠিত একটি ইউরোপীয়ান ক্লাব—প্ল্যাণ্টার্স ক্লাব, জেলার লোকে বলতো 'আণ্টা-বাংলা'। গল্পটির শেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল হলেও, তার সূচনাকাল সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখিত হয়নি—লেখক গল্পটি আরম্ভ করেছেন এই ভাবে: "তরাইয়ের বন্য প্রকৃতিকে ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষদের আয়ত্তে আনিয়া যে সময় নীলকর সাহেবেরা একচ্ছত্র আধিপত্য করিত, সেই সময়ের কথা।"

'প্ল্যাণ্টার্স ক্লাব' বা আণ্টা-বাংলা নীলকরদের ঐশ্বর্য, বিলাস এবং অহমিকার মূর্ত প্রতীক ছিল। ভারতীয়রা এই ক্লাবের ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে পারতো না। আণ্টা-বাংলার ভিতরে নীলকরদের নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড়

চলতো। বিরসা ওরাঁও খ্রীষ্টান পিয়ন এবং তারাই—পিয়ন-বেয়ারারাই কেবল ভিতরে প্রবেশ করতে পারতো। কিন্তু নীলকরদের নির্দয়তার হাত থেকে তারাও নিস্তার পেত না। লেখক সামান্য কয়েকটি কথায় সেই সময়ের নীলচাষীদের অবস্থা এবং নীলকর সাহেবদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন: "সমুদ্রের নীলরঙ দেখিবার সুযোগ তাহাদের হয় নাই, আকাশের নীলের দিকে তাহারা কোনোদিন তাকাইয়া দেখে নাই; কুঠির বড় বড় চৌবাচ্চায় তাহারা দেখিয়াছে গোলা নীলের সমুদ্র, বহু পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের দেহে দেখিয়াছে নীল কালশিরার দাগ।"

এই 'আণ্টা-বাংলা' নাটক নয়, ছোটগল্প, তাই অত্যাচারের রূপটি দেখানোর জন্য বেত্রাঘাতের দৃশ্য পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় নি—কেবল 'নীল কালশিরার দাগ' একটি কথার মধ্যেই অত্যাচারীর আসল স্বরূপটি উদঘাটিত হয়েছে। বিরসা ওরাওঁ এদেরই ক্লাবে কাজ করে। সে নিজে খ্রীষ্টান, এই কারণে খ্রীষ্টান নীলকর প্রভুদের সঙ্গে নিজের কিছুটা মিল খুঁজে পায়। ছোট বেঞ্জামিন সাহেব ক্লাবের বর্তমান সেক্রেটারি। বিরসা বেঞ্জামিন সাহেবদের তিন পুরুষের 'আধিয়াদার'। তিন পুরুষ ধরে তারা বেঞ্জামিন পরিবারের 'তহসিলদারে'র কাছ থেকে দাদন হিসাবে ধান নেয় এবং চার বিঘা 'বটাই' জমির তিন বিঘায় নীলের চাষ করে। বিরসার নাতি বোটরা যখন মার গর্ভে তখন বিরসার ছেলে কোন এক নীলকরের সঙ্গে আসামে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। সেই থেকে বিরসা ওরাওঁ তার পুত্রবধূ এবং নাতি বোটরাকে নিয়ে থাকে। বিরসার পুত্রবধূর বয়স কম, তার উপর খ্রীষ্টান, এই সুবাদে তার অনেক বিবাহের সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু শিশু পুত্র বোটরা এবং বৃদ্ধ শ্বশুরকে ফেলে রেখে সে কোথাও যাওয়া সমীচীন মনে করেনি।

এক রবিবার সকালে ছোট বেঞ্জামিন সাহেব ক্লাবে এসে জানতে পারেন বিরসা সেদিন বেগার দিতে আসেনি। বিরসা পাদ্রী টুডুর কাছ থেকে জেনেছিল রবিবার ছুটির দিন, কাজে যেতে নেই; এই জন্য সে ক্লাবের কাজে যায়নি; কিন্তু কালা পাদ্রীর অনুশাসন সাদা খ্রীষ্টান শুনবে কেন? বেঞ্জামিন সাহেবও শোনেননি, তিনি বিরসাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে মাথার উপর আটখানা ইট চাপিয়ে দিয়েছিলেন। বোটরার মা শ্বশুরের জন্য ব্যস্ত হলেও তার কিছুই করার উপায় ছিল না।

বিরসার উপর সাহেবের অত্যাচারের নমুনা দেখে বোটরার মা ভাবছে : "কি মারই সাহেব বিরসাকে মারিয়াছে। ভুট্টার দানা ছাড়াইবার সময়ও বোধ হয় লোকে এমন করিয়া ভুট্টা পেটায় না।" সতীনাথ ভাদুড়ী অত্যাচারের কোন বর্ণনাকেই অতিরঞ্জিত করেন নি, উপরন্তু পাত্রপাত্রী ভেদে বর্ণনার বাস্তবতা এনে বিষয়টির একটি জীবন্ত রূপ দান করেছেন। বিহারের গ্রাম্য সমাজে ভুট্টা একটা প্রিয় খাদ্যবস্তু, নিরক্ষর বিরসার পুত্রবধূর তাই ভুট্টা ছাড়ানোর দৃশ্যটি অতি স্বাভাবিক ভাবেই মনে এসেছে। আর একটি জায়গায় বিরসার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক লিখেছেন : "ইঁটের বোঝার ভারে, সাদা চুলে ভরা বিরসার মাথা মনে হইতেছে কাঁধের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে।" এরপর বিরসা অজ্ঞান হয়ে যায়, তার জ্ঞান আর ফিরে আসে না।

রেভারেণ্ড টুডু বিরসার কবরের ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই সঙ্গে বোটরাকে তার ঠাকুরদার মৃত্যুর দিনটিতে কবরের উপর ফুল দিতে শেখান। বোটরা যখন বালক তখনই এসব ঘটনা ঘটে গেছে। ছোট বেঞ্জামিন সাহেব বোটরাকে প্ল্যাণ্টার্স ক্লাবের টেনিস বল কুড়ানোর চাকরী দেন। বোটরার মা এতদিন তাদের সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবার কারণে পুনর্বার বিবাহ করেনি ; কিন্তু এবার শ্বশুরের মৃত্যুতে তারও পরিবর্তন ঘটে, বড় হয়ে বোটরা এ সব বুঝতে পারে, যখন সে তার মাকে রঙিন শাড়ী আর মাথায় তেল ব্যবহার করতে দেখে। এরপর নীলকরদের জৌলুস আর দীর্ঘস্থায়ী হয় না, জার্মানীর নীল আবিষ্কারের পরই তাদের অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

সতীনাথ ভাদুড়ী কেবল নীলকরদের নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারের রূপটি দেখান নি, নীলকরদের অবস্থার পরিবর্তনের ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করে নীলকর সমাজের সমগ্র পরিচয়টি দিয়েছেন। 'নীলদর্পণ' নাটকে আমরা নীলকরদের খণ্ড চিত্র পাই, কিন্তু সতীনাথ আণ্টা-বাংলা গল্প থেকে নীলকরদের সমগ্র ইতিহাসটি জানতে পারি। এই দিক দিয়ে বিচার করলে আলোচ্য গল্পটির গুরুত্ব অধিক। লেখক অল্প কথায় একটি বৃহৎ প্রেক্ষাপটের আবরণ উন্মোচন করেন : "নীল চশমা খোলার পরও, চোখে অনেকক্ষণ রঙের রেশ থাকে। মোবার্লি, বেটিস, জনস্টন, কীডের দল গ্রামের কুঠি ছাড়িয়া সদরে আসিয়া বাসা বাঁধে, কিন্তু চোখে তাহাদের তখনও পুরাতনেরই আমেজ। নীলের চাষ গিয়াছে, কিন্তু জমি তো যায় নাই। রাতারাতি

তাহারা পাইতে চায় বনেদী জমিদারের আভিজাত্য।"

চির নবীন আণ্টা-বাংলা ক্লাব আবার নতুন উৎসবে মেতে উঠে। বোটরার মন রঙিন হয়ে উঠে। ঠাকুদার মৃত্যুর তারিখে কবরের উপর ফুল দিতে গিয়ে ফাদার টুডু তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তার ঠাকুরদা একজন সত্যিকারের খ্রীষ্টান ছিলেন; তার নাতি হিসাবে তোমারও মদ পরিত্যাগ করা উচিৎ। আণ্টা-বাংলায় গিয়ে বোটরা ফাদার টুডুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়। নীলকরদের এ অবস্থাও দীর্ঘস্থায়ী হয় না, কিন্তু বোটরা ততদিন আণ্টা-বাংলার মোহজালে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছে। সাহেবরা এক এক করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করে, আণ্টা-বাংলার জৌলুস ক্রমক্ষীয়মাণ হয়ে পড়লেও শতচ্ছিন্ন উর্দির উপর বোটরা 'প্ল্যাণ্টার্স ক্লাব' তকমাটি সব সময় পরিষ্কার করে রাখে। দীর্ঘদিনের প্রাত্যহিক কাজটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। শিশু অবস্থা থেকে ঠাকুর্দার হাত ধরে সে যেখানে আসতো, সে স্থানটি ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না। আণ্টা-বাংলার হতশ্রী রূপটি বোটরাকে পীড়া দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যত এগিয়ে আসে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হতে শুরু করে, সাহেবরা দেশ ছেড়ে চলে যায়, তাদের কুঠির জমিদারি দেশের লোক কিনে নিতে আরম্ভ করে। বাঙ্গালী বাবুরা 'কসমোপলিটান ক্লাব' পত্তন করে। একে একে সব কর্মীই 'কসমোপলিটান ক্লাবে' যোগ দেয়, শত অনুরোধেও বোটরা আণ্টা-বাংলা ছেড়ে যায় না। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর বোটরাকে বাধ্য হয়ে আণ্টা-বাংলা ছেড়ে পি. ডব্লু. ডি.-র ট্রাক চালানোর কাজ নিতে হয়। শেষ বছরটিতে বোটরা ঠাকুর্দার কবরে ফুল দেবার দিনে সেখানে থাকার সুযোগ পায়।

কিন্তু প্রতিবারের মত এবারে ঠাকুর্দার কবরে বোগনভিলির ফুল দিতে পারে না। বোটরার মৃত্যু হয় তার ঠাকুরদা বিরসা ওরাওঁ-এর মৃত্যুর দিনটিতেই। সে আণ্টা-বাংলারই ইট চূণ সুরকি সরানোর সময় পি. ডব্লু. ডি-র আট টনি মোটর রোলার চালাতে চালাতে দুর্ঘটনায় মারা যায়। মৃত্যুকালে প্ল্যাণ্টার্স ক্লাবের মহিমাই বোটরার কাছে বড় হয়ে উঠে। দাসত্বের জয়গান মনুষ্যত্বের পক্ষে চরম অবমানকর। সামাজিক-মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকে বিচার করলে আণ্টা-বাংলার মধ্যে এই ত্রুটিটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সতীনাথ সমগ্রভাবে দাসজীবনের চিত্র তুলে ধরেন নি;

নীলকর সমাজের স্বর্ণযুগ থেকে আরম্ভ করে অন্তিম লগ্নটির কালানুক্রমিক বিবরণের মধ্যে দিয়ে তাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি দেশীয় খ্রীষ্টান পরিবারের ট্রাজিডি অঙ্কন করেছেন। বর্ণনা, ভাষা এবং চরিত্র-চিত্রণের পারিপাট্যে এবং ভাববস্তুর মূল্য ও ঐতিহাসিক সত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সতীনাথ 'আণ্টা-বাংলা' গল্পটিকে শিল্প-সুষমা সমৃদ্ধ একটি অসাধারণ ছোটগল্পে পরিণত করেছেন।

সতীনাথের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিকতা। বিহারের নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতি তাঁর অসীম মমতা ছিল। এ কারণে অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের নিয়ে রচিত কাহিনীগুলি অধিক প্রাণবন্ত হয়েছে। 'ভূত' এমনই একটি রচনা। এ অলৌকিক ভৌতিক কাহিনী মাত্র নয়, বাস্তব জীবনের অন্ধ বিশ্বাস এর অবলম্বন; সেই সমাজের অন্ধ বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত নিবিড় এবং প্রত্যক্ষতার পরিচয় এই গল্পে পাওয়া যায়। সুরজকুঁয়রী হঠাৎ হিষ্টিরিয়া বা মূর্ছা রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার বাবা লালা ইন্দর পরসাদ মেয়ের অসুস্থতায় একটু বিরক্ত হয়, কেননা সে উকিলের মুহুরী হলেও আসলে মোকর্দমার দালালি করে, মেয়ের অসুস্থতার জন্য তার অনেক কাজের ক্ষতি হয়, সেই সঙ্গে অনেক টাকা পয়সাও লোকসান হয়। সকলের ধারণা হল সুরজকুঁয়রীকে ভূতে ধরেছে—শেষ পর্যন্ত ওঝার সর্দার কানোয়া মুসহরকে রহুয়া থেকে আনানো হলো, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। অবশেষে রুস্তম রোঝাকে ডাকা হল। রুস্তম রোজা মুসলমান বলে সকলেরই একটু আপত্তি ছিল, কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সবকিছু আপত্তি ইন্দর পরসাদ ভুলে গেলেন। সুরজকুঁয়রী সাময়িক ভালো হল। অবশেষে ইন্দর পরসাদ আজোকোম্পা গ্রামের গজাধর পরসাদ-এর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

জাতপাত কুসংস্কারে ভরা বিহারের নিম্নবিত্ত গ্রাম্য-সমাজের ঘরের ছবি আশ্চর্য রকম ভাবে সতীনাথ জীবন্ত করে তুলেছেন। এখানেই সতীনাথের ছোটগল্পের চরম সার্থকতা। খুঁটিনাটি বিষয়ের বাস্তব বর্ণনা পড়লে মনে হয়, তিনি যেন ওদের সমাজেরই একজন। শাশুড়ী-ননদীসহ, সুরজকুঁয়রীর পারিবারিক জীবনের নিখুঁত দলিল এই 'ভূত' গল্পটি। একটি গ্রাম্য কুসংস্কারের লৌকিক বিশ্বাসের উপর গল্পটির ভিত্তি স্থাপিত হলেও, এই কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস গল্পটির পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। বরং

কাহিনীটি স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হয়ে একটি সুখকর পরিণতি লাভ করেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হল বিষয় বৈচিত্র্য। তিনি সব রকম মানুষের জীবনের বৈচিত্র্যময় আঙ্গিনায় অতি সহজেই আনাগোনা করতে পারতেন। বিহার প্রবাসী হওয়ার জন্য এবং যৌবনে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত থাকার কারণে তিনি বিহারের বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তাদের জীবনের উপাদানই তাঁর ছোটগল্পের একমাত্র পাথেয় নয়। তিনি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর দাম্পত্য-জীবন নিয়েও কয়েকটি উজ্জ্বল মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য পটভূমি বাংলাদেশ নয়, বিহারেরই কোন মফঃস্বল শহর। এমনই একটি গল্প 'পরিচিতা'। কাহিনীর কাল, উত্তর-স্বাধীনতা।

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু চাঁপা কম মাইনেতে প্রশান্তর বাড়ীতে বাসন মাজার কাজ করতে আসে পুরাতন ঝি হিন্দুস্তানী গুল্‌টনের মার পরিবর্তে। প্রশান্ত এবং তার স্ত্রীর অভাবের সংসার। এই অভাবের সংসারে শৈলর একমাত্র সম্বল স্বামীর ভালোবাসা। এই ভালোবাসা সে কোন মূল্যেই হারাতে চায় না। প্রশান্ত একদিন নিতান্তই কৌতুকবশে রাতের উচ্ছিষ্ট বাসনের উপর কুলকুচি করে জল ছিটিয়ে রাখে। এতে করে পরদিন চাঁপার বাসন মাজা সহজ হয়। চাঁপার মনে হয় গিন্নিমাই তার বাসন মাজার সুবিধার জন্যই জল দিয়ে রেখেছেন। চাঁপা প্রশান্তর স্ত্রীর সম্পর্কে সপ্রশংস উক্তি করে। কিন্তু চাঁপার প্রতি তার স্বামীর সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য শৈলর মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। সে চাঁপাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে আবার গুল্‌টনের মাকেই পুনর্বহাল করে। প্রশান্ত বুঝতে পারে উচ্ছিষ্ট বাসনগুলোর উপর কুলকুচো কুলকুচো খেলা করে কতখানি ছেলে মানুষী করেছে। আপাত-দৃষ্টিতে 'পরিচিতা' গল্পটিকে একটি সাধারণ কৌতুক-গল্প মনে হলেও এর মধ্য দিয়ে নারী মনের অপার দুর্জ্ঞেয়তাকে অতি সহজেই লেখক প্রকাশ করেছেন। ছোট একটি আপাত-আমোদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারীমনের বহুজটিলতন্ত্রীর এমন সহজ উন্মোচন সচরাচর দেখা যায় না।

'অপরিচিতা' গল্পটি নির্দোষ কৌতুকরসাশ্রিত। আত্মকথনের রীতিতে রচিত; গল্পটি লণ্ডনের পটভূমিতে বিধৃত। সতীনাথ ভাদুড়ী একবার ইউরোপ পরিভ্রমণে যান। তিনি তাঁর ইউরোপ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী' নামক একটি ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ-ছাড়া

বিদেশের পটভূমিতে তিনি দু-একটি ছোটগল্পও রচনা করেছেন। 'অপরিচিতা' গল্পটি এই শ্রেণীর। লণ্ডনে দীর্ঘকাল বসবাসকারী লেখকের বন্ধু জনৈক 'দত্ত' মহিলামহলে তাঁর অনায়াস অনুপ্রবেশের কাহিনী লণ্ডনে থাকাকালীন অবস্থায় লেখককে প্রায়ই শোনাতেন। লেখকের থেকে একবছর আগে লণ্ডনে যাওয়ার সুবাদে ইংরাজদের সম্পর্কে তাঁর যে অভিজ্ঞতা অনেক বেশী এবং লেখক এ-ব্যাপারে যে একেবারেই 'নভিস'-এ কথাই লেখকের বন্ধু 'দত্ত' প্রমাণ করতে চাইতেন। বিশেষ করে স্ত্রী-চরিত্র সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান এবং এ-বিষয়ে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী হওয়ার জন্য স্বভাবতই লেখকের বন্ধু দত্তের কিছুটা অহঙ্কারবোধও ছিল।

দত্ত ধনীর পুত্র। বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্য আসে, কিন্তু নানা কারণেই দীর্ঘদিনেও তিনি সবকটি পরীক্ষা পাশ করে উঠতে পারেন নি। লেখক সাধারণ অবস্থার লোক। অনেক কষ্টে বিলাতে আসবার সুযোগ করেছিলেন এবং যে উদ্দেশ্যে আসা সেই ডক্টরেট ডিগ্রিও লাভ করেছেন। এতদিনে তাঁর দেশে ফিরে যাওয়ারই কথা কিন্তু 'করোনেশন' উপলক্ষে কিছু দিন বাড়তি বিলাতে থেকে গেছেন। লেখক বন্ধুর পরামর্শে একটি ইংরাজ রমণীর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলেন এবং কেমন করে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন এই বিষয় নিয়েই 'অপরিচিতা' গল্পটি গড়ে উঠেছে। গল্পটি সাধারণ কৌতুকরসাশ্রিত হলেও লেখক অতি সুদক্ষ ভাবে ইংরাজ জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ করে ইংরাজ রমণীর শিষ্টাচার, ভদ্রতা এবং সৌজন্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। গল্পটি কৌতুকরসাশ্রিত, তবু লেখক কোথাও বিরূপতা দেখান নি। দুই বন্ধুর সরস সংলাপের সাহায্যে ইংরাজের জাতীয় চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার মধ্যে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইংরাজ জাতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক যখন বলেন : "আসল ইংরেজ চরিত্র দেখতে হয় যুদ্ধের সময়, আর করোনেশনের সময়।" লেখকের বন্ধু তাতে সায় দিতে চান না। তাঁর মতে : "জাতীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হয় মেয়েদের মধ্যে। চেহারা আর পোষাকের কথা বাদ দিলে পুরুষ সবদেশে মোটামুটি একই রকম।"

নিতান্তই কৌতুকরসাশ্রিত কাহিনী হলেও বিলাতে বসবাসকারী বাঙ্গালী যুবকদের প্রতি লেখকের সুমধুর করুণা প্রকাশ পেয়েছে। এই সমস্ত বিদেশবাসী যুবকের মধ্যে অনেকেই বাহ্য জৌলুসে নিজেদের হারিয়ে ফেলেন

এবং দিগভ্রান্ত নাবিকের মত লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর অন্যান্য গল্পগুলির সঙ্গে 'ফেরবার পথ' গল্পটির কোন সাদৃশ্য নেই। এটিকে গল্পের পর্যায়ভুক্ত না করে 'ভ্রমণকাহিনী' বলা চলতে পারে। ভ্রমণকাহিনী হওয়ার জন্য কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত পাত্র-পাত্রীদের জীবনের সম্পূর্ণতা পাওয়া যায় না। বিলাত থেকে জাহাজে স্বদেশে ফেরার পথে জাহাজের বিভিন্ন দেশের মানুষজনদের সম্পর্কে এবং জাহাজে থাকা-কালীন অবস্থায় নানা রকমের সরস আলাপ-আলোচনার মধ্যে লেখক নিজেকে জড়িয়ে না ফেলে বাইরে থেকে উপভোগ করতেন। এই জাহাজেই রাজকুমারী নামাঙ্কিতা এক মহিলাও ফিরছিলেন। রাজকুমারীর সম্পর্কে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে কি অপার কৌতূহল, তাই লেখক অত্যন্ত লঘুভাবে বর্ণনা করেছেন। ভ্রমণকাহিনীর রীতিতে রচিত হলেও 'ফেরবার পথ' রচনাটির প্রধান ত্রুটি এই যে লেখক এখানে কোন কাহিনীবৃত্ত তৈরী করতে সক্ষম হন নি। জাহাজী মানুষের একঘেঁয়ে জীবনের মত গল্পটিও মাঝে মাঝেই ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। তবে এরই মধ্যে লেখকের কিছু কিছু সরস মন্তব্য উপভোগ্য। বিশেষ করে ভারতীয়দের ইংরাজ-প্রীতির উপর তিনি কটাক্ষ করেছেন। ভারতীয়েরা কালো বেয়ারাকে কম বকসিস দেন, কিন্তু সাদা চামড়ার বেয়ারাদের বেশী বকসিস দেন, জাহাজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম-চারীদের এই ক্ষোভ লেখক অত্যন্ত সরস ভাবে প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় ছাত্রদের দেশে ফেরার থেকে ইংলণ্ড ছাড়ার দুঃখ বেশী, লেখকের স্বভাব-সিদ্ধ সরস মন্তব্যই কাহিনীটির একমাত্র উপভোগ্য বিষয়। কাহিনীর শেষে দেশে ফেরার পর জাহাজঘাটায় লেখককে নিতে এসে লেখকের দাদার রাজকুমারী সম্পর্কে আসল রহস্য উদ্‌ঘাটন কাহিনীটির সঙ্গত পরিণতি বলে মেনে নেওয়া যায় না।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পগুলির মধ্যে আরও একটি বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি যখন গ্রাম-বিহারের নিম্নবর্ণের নরনারীকে নিয়ে গল্পরচনা করেন তখন তিনি তাদের জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করে গভীর সহানুভূতি এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের জীবন-চিত্র বাস্তবসঙ্গত ভাব তুলে ধরেন। তাদের আচার-আচরণ, অশিক্ষা-কুসংস্কার, ক্ষুদ্রতা-নীচতা এবং উদারতা অর্থাৎ মানবিক সবকটি বৃত্তির এবং সেইসঙ্গে গ্রামজীবনের সমাজ, লোকাচার সমস্ত কিছুকেই সুচিন্তিত ভাবে প্রতিফলিত করে থাকেন। রস-রসিকতা

থাকলেও তা কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পর্যায়ে যায় নি, অবিমিশ্র হিউমারই সৃষ্টি হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তিনি একান্ত ভাবেই দুরদী কথাশিল্পী, কিন্তু অপর ক্ষেত্রে তিনি যখন শহরের মানুষকে তাঁর কাহিনীর পাত্রপাত্রী নির্বাচন করেছেন তখন তিনি অধিকাংশক্ষেত্রে মুক্তমনে রঙ্গরসিকতা করেছেন।

উইট্-হিউমার এবং স্যাটায়ারের বিভিন্নতার প্রাচীর তিনি অবলীলাক্রমে অতিক্রম করেছেন। বাঙলা ভাষার অন্যান্য ব্যঙ্গ লেখকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানেই। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাজশেখর বসু (পরশুরাম) এঁরা হাসির গল্প রচনা করেছেন। এঁদের রচনায় পার্থক্য থাকলেও এক জায়গায় মিল ছিল ; এঁরা সকলেই সমাজ-জীবনের বিচিত্র অসঙ্গতি উন্মোচিত করলেও বাঙ্গালী চরিত্রের বৈঠকী মেজাজের অকৃত্রিম ছবি সেই বিস্তৃত ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হননি। কিন্তু সতীনাথের ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলিতে বাঙ্গালী চরিত্রের সেই বৈঠকী মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায় না।

'ষড়যন্ত্র মামলার রায়' এমনই একটি গল্প। এই গল্পটি প্রথমে 'ট্রাইবিউ-নালের রায়' নামে 'উত্তরা' পত্রিকায় ছাপা হয়। সতীনাথ প্রথমে আইন-জীবীরূপে পূর্ণিয়া কোর্টে ওকালতী শুরু করেন, পরবর্তীকালে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে কংগ্রেসী রাজনীতিতে যোগদান করেন। আইন ও আদালত সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসী রাজনীতি করার জন্য বিপ্লববাদী রাজনীতির প্রতি তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। কিন্তু তিনি বিপ্লববাদীদের প্রতি কোনরূপ তির্যক প্রেক্ষণ নিক্ষেপ করেন নি, পরন্তু রাজশক্তি তাঁদের আচরণে যে কতদূর ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল তারই পরিচয় দিয়েছেন। 'ষড়যন্ত্র মামলার রায়'কে ঠিক প্রচলিত ছোটগল্পের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। কেবল অনুমানের উপর ভিত্তি করে জনৈক মৌলবী নবীবক্স পুলিশকে জানান যে, তিনি যখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পার্কে সান্ধ্যভ্রমণ করেছিলেন এমন সময় পার্কের সামনের টাউন হলে কিছু ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে দেখেন। এতে করে তিনি অনুমান করেন যে, এরা নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত সমিতির সদস্য। তিনি এদের অনুসরণ করে টাউন হলে আসেন। টাইন হলের ভিতরে অন্ধকারে কিছু প্রত্যক্ষ করা না গেলেও তিনি জনৈক সদস্যের ওজস্বিনী ভাষার বক্তৃতা শোনেন। যার থেকে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হয় এরা নিশ্চয়ই গুপ্তদলের সদস্য। তিনি কর্তব্যবোধের তাগিদ অনুভব করেন এবং পুলিশে

সংবাদ দেন। পুলিশ তার বিরাট বাহিনী নিয়ে যখন টাউন হলে প্রবেশ করে, তখন সেখানে কাউকেই পায় না, তবে সামনের পার্কের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের সকলকেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। এরপরই সুরু হয় এক রোমাঞ্চকর মকর্দমা, যা কি না আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা নামে প্রেস ও পাবলিকের নিকট খ্যাতিলাভ করে। মামলার বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য-প্রমাণাদি থেকে জানতে পারা যায় যে, ধৃত ব্যক্তিদের অথবা টাউন হলে বক্তৃতারত যুবকের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই; আসলে বক্তৃতারত যুবক একজন সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তরের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ শাখার সাধারণ কর্মচারী। সে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ছেলেদের সামনে মশক নিধনের উপর বক্তৃতা করছিল, যার ওজস্বিনী ভাষা শুনে নবীবক্স মনে করেছিলেন গুপ্ত সমিতির কোন কার্যসূচীর উপর ভাষণ দেওয়া হচ্ছে। খুবই লঘুচালে গল্পটি বলা হলেও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সতীনাথ দেশ সেবার তাগিদে স্বাভাবিক সচ্ছল জীবন পরিত্যাগ করে অনিশ্চিত বন্ধুর পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং সেই সুবাদে তিনি বহু মানুষের সংস্পর্শে আসেন, এবং অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেন, দেশের বহু মানুষ আজও ইংরাজ রাজশক্তির প্রভুত্ব খুব খুশী মনেই মানতে প্রস্তুত। এই সব মেকী সভ্য মানুষের প্রতি তাঁর যে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল 'ষড়যন্ত্র মামলার রায়'-এ তাঁর সেই বিক্ষুব্ধ মনের তির্যক প্রকাশ ঘটেছে। সাহিত্য-মূল্যের বিচারে গল্পটির বিশেষ কোন স্থান না থাকলেও, ব্যঙ্গরসাত্মক গল্প হিসাবে এটি সুখপাঠ্য।

'অনাবশ্যক' গল্পটি লেখকের আত্মকথনের কৌশলে বিবৃত হয়েছে। আইনজীবী লেখক বাহাত্তর বৎসর বয়সে ছেলেমেয়ে এবং নাতিনাত্নির অনুরোধে অবসরগ্রহণ করেন, কিন্তু বার লাইব্রেরী যাওয়ার দীর্ঘকালের অভ্যাসটি পরিত্যাগ করতে পারেন না। একটি মিউজিয়ামের নামকরণ এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে লেখক স্থানীয় মানুষদের নীচতা এবং ক্ষুদ্রতা তুলে ধরেছেন। জনৈক ইংরেজ পুলিশ কমিশনার 'লী' সাহেবের উৎসাহে মফঃস্বল শহরে একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। তরুণ ইংরেজ এবং তাঁর নব পরিণীতা বধূর তত্ত্বাবধানে মিউজিয়ামটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। স্থানীয় মোক্তার হরলাল সাহেবের চাটুকারিতা করে বেশ দু-

পয়সা কামিয়ে নেন। মিউজিয়ামটি সাহেবের নামানুসারে 'লী মিউজিয়াম' নামে পরিচিতি লাভ করে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে হরলালবাবুই স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং নতুন করে মিউজিয়ামটির নামকরণ এবং উদ্বোধন করতে আসেন। কিন্তু মিউজিয়ামের সর্বত্রই লী সাহেবের অশরীরী আত্মার উপস্থিতি নাতিদীর্ঘ অতীতকে বারে বারে মনে করিয়ে দেয়।

রাজনৈতিক জীবনে সতীনাথ বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং প্রাক্-স্বাধীনতাকালে অনেক ভারতীয়ের ইংরাজ প্রীতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর কালে তাদের অনেকেরই অতিরিক্ত মাত্রায় দেশপ্রেমিক হয়ে যেতে দেখেন। যে হরলাল মোক্তার এক সময় সাহেবের চাটুকারিতা করেছেন, আজ তিনিই এসেছেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়ে সাহেবেরই নামাঙ্কিত মিউজিয়ামের নবনামকরণ অনুষ্ঠানে সভাপতি রূপে। রোমান্সের সঙ্গে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ কাহিনীটিকে অভিনবত্ব দান করেছে। নবপরিণীতা ইংরেজ দম্পতির মধুর প্রণয় তাদের জীবনরঙ্গের নানা উচ্ছ্বাসের রোমান্টিক চিত্র গল্পটিতে স্নিগ্ধ অনাবিল মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। গল্প বলার ঢঙ্‌টিও নতুনত্বের দাবী রাখে।

'ঈর্ষা' গল্পটিকে মনস্তাত্ত্বিক গল্পের পর্যায়ভুক্ত করা চলতে পারে। উত্তম পুরুষে লেখা এই গল্পটি মাত্র তিনটি প্রাণীকে কেন্দ্র করে রচিত। অবিবাহিত লেখক, তাঁর পুরাতন ভৃত্য কালাচাঁদ এবং একটি দেশী কুকুর।

একান্ত আপনজনের উপর যখন অপরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত বলে বোধহয় তখন মানুষ কতদূর ঈর্ষান্বিত হতে পারে তারই নির্মম চিত্র 'ঈর্ষা' গল্পটিতে পাই। এখানে সতীনাথের গল্পবলার ঢঙ্‌টি একেবারে অভিনব। গল্প আরম্ভ হয় খুব হালকাচালে। অবিবাহিত এক ব্যক্তির নিঃসঙ্গ সংসার-জীবনের একমাত্র সঙ্গী তার ভৃত্য কালাচাঁদ। গৃহিণী না থাকার জন্য সে-ই গৃহের একমাত্র কর্তা।

একদিকে মনিবের স্নেহ-ভালোবাসা, অপর দিকে সংসারের সর্বময় কর্তৃত্ব করার স্বাধীনতা এর মধ্যে ভৃত্য কালাচাঁদ বেশ সুখেই ছিল। কিন্তু মনিবের হঠাৎ কুকুর পোষার সখ হওয়াতে প্রথমে সে আপত্তি তুলেছিল, তার অধিকারে অপর কেউ ভাগ বসাবে এটা তার অনভিপ্রেত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন একটা দেশী কুকুর নেওয়া হোল তখন সে কুকুরেরই

সেবা শুশ্রূষা করতে আরম্ভ করলো এবং মনিবকে খুশী করার জন্য কুকুরের নানা গুণ কীর্তন করতে আরম্ভ করলো। কুকুরটি মনিবের অনুগত না হয়ে ভৃত্যেরই অনুগত হয়ে উঠলো। এর ফলে মনিবের রাগ গিয়ে পড়লো ভৃত্য কালাচাঁদের উপর, তার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে তাকে বহিষ্কার করে দিল, কিন্তু কুকুরটিও আর থাকলো না। অবশেষে ভৃত্যই ফিরে এল।

এই গল্পটির প্রধান বিশেষত্ব হল লেখক নিপুণ ভাবে ভৃত্য এবং মনিবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। পারস্পরিক ভিন্ন অধিকারবোধের দ্বন্দ্ব শল্য চিকিৎসকের নিপুণতায় তিনি ব্যবচ্ছেদ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' গল্পটির কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে। কিন্তু সেখানে নারীর চিরন্তন অধিকারবোধের সমস্যাই মুখ্য। তারাশঙ্কর যে সকল মানবিক জীবনবোধের অধিকারী ছিলেন 'নারী ও নাগিনী' গল্পটি তারই পরিচয় বহন করে। অপবাজেয় মানবের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও ভাল-বাসাই তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের মূলমন্ত্র ছিল, বিষয়বস্তুর চমকের আড়ালে সেটাই নীরবে ধ্বনিত হয়েছে। পক্ষান্তরে জীবনকে বিশ্লেষণ ও অন্বেষণের যে বঙ্কিম ভঙ্গিমাটি সতীনাথের সহজাত—'ঈর্ষা' গল্পে তারই নিখুঁত প্রকাশ ঘটেছে।

বিহারের গ্রাম্য পটভূমিকায় রচিত গল্প 'চকাচকী'। সতীনাথ গল্পের অঙ্গ সজ্জার জন্য তাঁর রাজনীতির কর্মজীবনের প্রসঙ্গ এখানে কিছুটা এনেছেন। রাজনীতির কাজের সূত্রে তিনি তাঁর সহকর্মী কানা মুসাফিরলালের সঙ্গে বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। মুসাফিরলালই তাঁকে ধামদাহা হাটের ঢুবে-ঢুবেনীর কুটিরে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই ঢুবে-ঢুবেনিকে লেখক চকাচকী নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু লেখকের সহকর্মী মুসাফিরলালের নামটি পছন্দ হয়নি। কারণ সে বিশ্ব-নিন্দুক। সাধারণ এবং সাদা চোখে পৃথিবীর কোন কিছুই সে দেখ্‌তে পায় না। সব কিছুকেই সে সন্দেহ করে থাকে। লেখক এবং মুসাফিরলাল একই রাজনৈতিক দলের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও লেখক মুসাফিরলালকে কোনদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারতেন না। কিন্তু বাইরের মানুষ আর ভিতরকার মানুষের অনেক পার্থক্য। মুসাফিরলালকেও লেখক প্রথমে চিনতে পারেন নি। যেমন তিনি ঢুবে এবং ঢুবেনীর বিবাহিত জীবন যে অশাস্ত্রীয় এবং অসামাজিক তাও কোনদিন বুঝ্‌তে পারেন নি। মুসাফিরলাল ঢুবে-ঢুবেনীকে চকাচকী না বলে চডুই-চডুইনী বলতো। তার

ভাষায় : "তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বুড়ির ; এখনও কি ঠমক ! ছোঁদো কথার কী বাঁধুনি। দেখেন না নেচে চলে। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াতে চায় চড়ুই পাখির মত। এ-গাঁয়ের বুড়োদের কাছ থেকে শোনা যে লোটা আর ঢুবেনীকে সম্বল করে চল্লিশ বছর আগে, ঢুবেজী যখন এখানে প্রথম এসেছিল রোজগারের ধান্দায়, তখন এই হাটের মালিক বিনা সেলামীতে বাজারের মধ্যে ঘর তুলবার জন্য জমি দিয়েছিল শুধু ঢুবেনীর কোমরের লচক দেখে।" এই কয়েকটি কথার মধ্যেই মুসাফিরলালের চরিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যায়। সব জিনিসেই মুসাফিরলাল খারাপের গন্ধ পায়।

ঢুবেজীর মৃত্যুর প্রাক্কালে ঢুবেনী লেখককে জানায় "আমি ঢুবেজীর নিকট আত্মীয়া। ঢুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল, সব ছিল। তারা আমারও আপনার লোক। ফিরবার পথ জন্মের মত বন্ধ হয়ে গেল জেনেও এসেছিলাম। যাক, সে-সব ছেড়ে এসেছিলাম বলে দুঃখ নেই। আমার কথা বাদ দাও। কিন্তু নিজের ছেলে থাকতে তার হাতের জল না পেয়ে ঢুবেজী চলে যাবে ; তা কি হয় ? মুখে আগুনটুকু পাবে না ? তবে আর লোকের ছেলে হয় কিসের জন্য ?"

ঢুবেজীর বৈধপুত্র আছে এবং তারই পূতাগ্নিতে ঢুবেজীর সব পাপ খণ্ডন হতে পারে, আর ঢুবেনী সব কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সরে যেতে চান, কেন না তিনি উপস্থিত থাকলে ঢুবেজীর ছেলে বাবার মুখাগ্নি করতে আসবে না। ভালোবাসা যে কত গভীরতর হতে পারে সরল গ্রাম্যবৃদ্ধা ঢুবেনীর কাছে লেখক জানতে পারলেন। ঢুবেনীর প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেল।

ঢুবেজীর চিতা যেখানে জ্বলছিল তারই অদূরে সকলের অজ্ঞাতে কাশবনের ঘন অন্ধকারে ঢুবেনী শেষবারের মত ঢুবেজীকে দেখতে এসেছিল। লেখক বুঝতে পেরেছিলেন। বিশ্ব-নিন্দুক মুসাফিরলালও বুঝ্‌তে পেরেছিল। মুসাফিরলাল প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিল শেয়াল-টেয়াল হবে বলে। যাতে অন্য কেউ এ ব্যাপারে মাথা না ঘামায়। পরিচিত অমানুষ মুসাফিরলাল আজ সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠেছে। যদিও লেখক গল্পের আরম্ভে বলেছেন : "এ আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি প্রেমের প্রতি।" কিন্তু ঢুবে-ঢুবেনীর প্রেমের সঙ্গে মুসাফিরলালের চরিত্রটিও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। 'চকাচকী' একটি সার্থক ছোটগল্প। এখানে সতীনাথের সহজাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কৌতুকপ্রবণ মনের

পরিহাস ব্যঙ্গের সঙ্গে মানবমনের অতলান্ত রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। মুসাফিরলাল এমনই একটি চরিত্র যার বাইরের খোলসটা যতই শক্ত হোক না কেন ভেতরটি দরদে ভরা। সতীনাথ ভাদুড়ী প্রচলিত সংস্কারের কতখানি ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন এ গল্পটি তারই প্রমাণ বহন করে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের অন্নদাদিদি চরিত্রটির সঙ্গে ত্রিবেনীর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তবে অন্নদাদিদির প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ নীতিশাস্ত্র সম্মত। কিন্তু ত্রিবেনীর সর্বস্ব ত্যাগ অশাস্ত্রীয় প্রেমের জন্য।

বিষয় যতই সামান্য হোক না কেন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের গুণে তা কত বড় হয়ে উঠতে পারে তারই দৃষ্টান্ত পাই 'বৈয়াকরণ' গল্পটিতে। অগ্নিদগ্ধ যুবতী শালাজের মৃত্যুকালীন একটি উক্তি শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আত্মসমীক্ষা করতে বাধ্য করেছিল। সামান্য একটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জীবনের সায়াহ্নে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন। আপাত কৌতুককর মনে হলেও গল্পটির মর্মার্থ অত্যন্ত ব্যঞ্জনাধর্মী। বিষয় খুবই সামান্য। একটি মাত্র শব্দের ব্যাকরণগত টীকা-টিপ্পনী ও অর্থ-বোধের উপর গল্পের মূল প্রোথিত। কিন্তু চরিত্র-চিত্রণ, পরিবেশ-রচনা, বালিকা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের করুণ অবস্থা, ইংরাজী না জানার জন্য পণ্ডিতের হীনমন্যতাবোধ, কিশোরীদের পরিহাসপ্রিয়তা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে কৌতুকরসের একটি নির্মল প্রলেপ গল্পটিকে অসাধারণ তাৎপর্যময় করে তুলেছে। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মনোবিশ্লেষণ করতে গিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী উর্দুর শিক্ষক মৌলবী সাহেবের চরিত্রটি অত্যন্ত সুকৌশলে অঙ্কন করেছেন। মৌলবী সাহেব বৃদ্ধ বয়সে আরও একবার দার পরিগ্রহ করার জন্য পক্ককেশ এবং শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডলীকে রঞ্জিত করেছেন এবং তার জন্য লোক-নিন্দাকে ভয় করেন নি। তার বাসনা সুপ্ত নয়। কিন্তু শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ তার জীবনাচরণে যে নিষ্ঠা এবং সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা কি প্রকারান্তরে আত্ম-প্রবঞ্চনা নয়? মালবিকা ঘোষ বিদ্যালয়ের সুশ্রী ছাত্রী, তার সঙ্গে তিনি সহজ ভাবে ব্যবহার করতে পারেন না, কিন্তু রূপহীনা ছাত্রী লিলিকে বিনা দোষেও তিরস্কৃত করেন। অগ্নিদগ্ধা যুবতী শালাজের মৃত্যু-কালীন শেষ কথায় বহুবচন ব্যবহৃত হওয়ায়, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন। কেননা এতে করে সমগ্র পুরুষ জাতিকেই ইন্দ্রিয়াসক্ত রূপে দেখতে হয়; অথচ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ নিজেকে সাধারণের উর্দ্ধে বলে মনে করেন।

গল্পটির মধ্যে যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটি আছে তা অত্যন্ত স্থূল হয়ে যেত, যদি না সতীনাথ আশ্চর্য রকমভাবে সংযমের পরিচয় দিতেন। তাঁর ভাষায় নিপুণতা, সুচিন্তিত শব্দ প্রয়োগ গল্পটিকে অন্য এক মাধুর্য দান করেছে। ইন্দ্রিয়াসক্তির উপর আরোপিত নিষ্ঠাচার, জীবনাচরণের পথকে মসৃণ করে না; পরন্তু আত্মবিশ্লেষণে জীবনকে আরও বিষময় করে তোলে—এই নিতান্ত মৌলিক সত্যটি লেখক 'বৈয়াকরণ' গল্পটিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে সতীনাথ সংসারী না হলেও তিনি যে কত জীবনমুখী লেখক ছিলেন 'বৈয়াকরণ' গল্পটি তারই স্বাক্ষর বহন করছে।

'ডাকাতের মা' গল্পটি একটু ভিন্ন স্বাদের এবং অন্যতর প্রকৃতিরও। কৌতুক এবং ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে সতীনাথ জীবনের অসঙ্গতি এবং অসামঞ্জস্যকে সাধারণ ভাবে দেখেছেন, যদিও তিনি শ্লেষ এবং বিদ্রূপের চাবুকে জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলেন নি। মানবতা এবং মমতা তাঁর কৌতুক-প্রিয়তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি যে সমস্ত করুণ রসের গল্প রচনা করেছেন সেখানেও কৌতুকের রস অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবহমান, কিন্তু 'ডাকাতের মা' গল্পটি আগাগোড়াই গম্ভীর চালে বিবৃত। এটি একটি নিটোল বাৎসল্য রসের গল্পের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। 'ডাকাতের মা' একটি সার্থক ছোট গল্প। প্রচলিত রীতি অনুসরণ করেই তিনি গল্পটি রচনা করেছেন। জীবনের সহজ সত্যকে সহজ ভাবেই প্রকাশ করেছেন এখানে। 'বৈয়াকরণ' গল্পটির মত সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনার আশ্রয় এখানে তিনি গ্রহণ করেন নি।

সৌখীর বাবা যখন জীবিত ছিল তখন সৌখীর মার পরিচয় ছিল 'ডাকাতের বৌ' বলে। সৌখীর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তার মার পরিচয় হয়েছে 'ডাকাতের মা' বলে, কেন না সৌখীও তার বাবার পথ অনুসরণ করেছে। এরজন্য সৌখীর মার কোন অনুশোচনা নেই, বরং ছেলের জন্য সে গর্ব অনুভব করে থাকে। সৌখী ঘরে রুগ্না স্ত্রী, নবজাত পুত্র এবং বৃদ্ধা মাকে রেখে দীর্ঘ পাঁচ বছরের জন্য কারাবাস করতে যায়। সৌখীর বাবা যখন জীবিত ছিল তখন সৌখীর মার কোন ভাবনা ছিল না। কেন না তার স্বামীর অবর্তমানে দলের লোকেরা নিয়মিত মাসে মাসে সংসার চালানোর খরচা দিয়ে যেত। এখন দিনকাল পালটেছে, দলের লোকেরা নিয়মিত টাকা-পয়সা দেয় না। সংসার তার চলে না। তাই রুগ্ন ছেলের বৌকে এবং নাতিকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে নিজে কোন—

রকমে মুড়ি বিক্রী করে দিন কাটাতো। এমন সময় এক রাত্রে সৌখী বাড়ীতে এল। তার আসার জন্য সৌখীর মা প্রস্তুত ছিল না, কেন না কারাবাসের মেয়াদ শেষ হতে তার আরও অনেক দিন বাকী। সৌখী বাড়ী আসতে সৌখীর মা যতটা খুশী হল, তার থেকে বেশী হল অপ্রস্তুত। ছেলেকে কি খেতে দেবে। কেমন করে বলবে তার দলের লোকেরা সংসার চালানোর খরচা দেয় না, খেতে দিতে পারতো না বলে রুগ্ন বউকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। এতদিন পর ছেলে বাড়ী ফিরেছে; আসামাত্রই কেমন করে তার কাছ থেকে টাকা চাইবে। অগত্যা ছেলের খাওয়ার সংস্থান করতে গিয়ে সৌখীর মা ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে একটি ঘটি চুরি করে পরদিন সকালে সেটি বিক্রি করে মাত্রচৌদ্দ আনায়। সেই দিয়ে কিছু কিনে এনে সকাল সকাল ছেলের জন্য রান্নায় বসে। তখনও সৌখী ঘুম থেকে উঠেনি, এমন সময় দারোগাবাবু আসে। সৌখীর মাকে ঘটি চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করতে। সৌখী ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তারই জন্য তার মা চুরি করেছে। মায়ের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে সৌখী পুলিশকে জানায় সেই চুরি করেছে। সামান্য ক্রটিতে যে ছেলে মায়ের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করতো না, সেই ছেলেই দীর্ঘকাল কারাবাসের পর মায়ের ভুল নিজের করে নেয়। মা এবং ছেলের পারস্পরিক স্নেহ ও মমতার সম্পর্ক এই অসামাজিক কাহিনীটিতেও পবিত্রতার স্বাদ নিয়ে এসেছে।

প্রথম জীবনে সতীনাথ কিছুদিন ওকালতি করেছিলেন; অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কিছু গল্পে আইন-আদালতের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু সতীনাথ আইনের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে তাঁর দেখা বার লাইব্রেরীর মানুষজনদের চরিত্র অঙ্কনে অধিক উৎসাহ বোধ করেছেন। আসলে সতীনাথ জীবনমুখী লেখক ছিলেন। বিহারের গ্রাম্য মানুষদের স্বার্থপরতা-কূপমণ্ডূকতা, উদারতা এ-সব দিকে তাঁর যেমন প্রখর দৃষ্টি ছিল, তেমনি মধ্যবিত্ত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। 'বিবেকের গণ্ডি' এমনই একটি গল্প। পাড়াগাঁয়ের ছেলে শহরে ওকালতি করতে আসে। অন্যান্য উকিলদের কাছ থেকে সাহায্য পাবে এ-তার প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু নামী এবং অনামী ব্যবহারজীবী সকলের সংস্পর্শে এসেই অযাচিত উপদেশ ছাড়া আর কিছুই সে পেল না। কোথাও উকিল হয়ে বসতে গেলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের সংগে দেখা করতে হয়।

এমনই এক গণ্যমান্য ব্যক্তি মহেশবাবু। তিনি জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে অবসর গ্রহণের পর ধর্মকর্ম নিয়ে দিন যাপন করেন। মহেশবাবু কেবল ধর্মপরায়ণ ছিলেন না, তিনি কারুর উপকার করতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন। তিনি এই উপকারের মনোবাসনা নিয়েই নিজের নাত্‌নিদের ইংরাজী পড়ানোর দায়িত্ব নবাগত তরুণ উকিলের হাতে অর্পণ করলেন। কিন্তু প্রাইভেট ট্যুইশ্যানি ওকালতি ব্যবসার পক্ষে ক্ষতিকর, এই উপদেশবাণী বার লাইব্রেরীর অন্যান্য উকিলদের কাছ থেকে ক্রমাগত পাওয়ার পর, নবীন আইনজীবী মহেশবাবুর নাতি-নাত্‌নির ইংরাজী শিক্ষকতা ত্যাগ করেন, কিন্তু মহেশবাবু কোন ক্রমেই কারো কাছে ঋণী থাকতে চান না, তিনি ক-দিনের ট্যুইশ্যানির প্রাপ্য টাকা আইনজীবীকে দিয়ে দেন। কিন্তু তরুণ উকিল মহেশবাবুর প্রতি অবিচার করা হয়েছে এই বিবেকের দংশনে ঐ কটি টাকা নিতে চান না। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ মহেশবাবু তার কাছে মক্কেল হয়ে আসেন, তখন টাকা গ্রহণ করতে আর কোন বিবেকের বাধা থাকে না,—কেন না এ তার বৃত্তির ন্যায্য পারিশ্রমিক।

আপাতদৃষ্টিতে 'বিবেকের গণ্ডি' গল্পটিকে একটি সাধারণ ছোটগল্প বলেই মনে হতে পারে। সতীনাথের ছোটগল্পের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কৌতুক এবং ব্যঙ্গের মাধ্যমে জীবনের অসংগতি এবং অসামঞ্জস্যের রূপায়ণ কিংবা লোকায়ত উপাদান সম্পৃক্ত বিহারের গ্রাম্য-জীবন-কথা বর্ণনার ইচ্ছা করে থাকেন এ-গল্পটির মধ্যে তা পাওয়া যায় না। 'চকাচকী' কিংবা 'ডাকাতের মা' গল্পের মত গভীর জীবন-সত্যও এখানে প্রকাশ পায় না। কিন্তু ছোট-গল্প রচনায় তিনি যে কতখানি সাবলীল ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় অনায়াস ভঙ্গিমায় সহজভাবে কয়েকটি তুলির টানে মধ্যবিত্ত মানসিকতার চিত্র ফুটিয়ে তোলার মুন্সিয়ানায়। নবীন এবং প্রবীণের বিবেকের লড়াই-এ গল্পটি খুব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

সতীনাথ অনেকগুলি হাসির গল্প রচনা করেছেন। কিন্তু কোথাও সমাজ সংস্কারের ভূমিকা গ্রহণ করেননি। সতীনাথের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য গভীর মানবতাবোধ। তিনি যেখানে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন সেখানে তাঁর গভীর সমবেদনাও লুক্কায়িত ছিল। "ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশু-রামের ট্রাডিশানকে সতীনাথ শুধু জীবিতই রাখেননি, সমৃদ্ধ করেছেন, ব্যাপ্তি দিয়েছেন। হাসির সঙ্গে ব্যঙ্গমিশিয়ে, উপহাসের সঙ্গে সমবেদনা মিলিয়ে

চিরন্তনকে সমসাময়িক সমাজকে তিনি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। যে সুরুচি নিয়ে সহজ সরল ভঙ্গীতে তিনি হাস্যরস পরিবেশন করেছেন সে ষ্টাইল তাঁর একান্ত নিজস্ব।"[১]

সতীনাথের রচনার ভঙ্গী একেবারেই নিজস্ব। ছোটগল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাকে যেমন বিশেষ চিন্তিত হতে হয়নি, তেমনি গল্পের গতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়নি। মার্জিত এবং পরিশীলিত রুচি ও চরিত্র তিনি হাসির গল্প রচনার ক্ষেত্রেও বজায় রেখেছিলেন। তাঁর হাসির গল্প কোন পর্যায়েই ভাড়ামির স্তরে নেমে যায়নি। কোন মানুষের শারীরিক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করতে তাঁকে দেখা যায়নি।

'মুষ্টিযোগ' সতীনাথ ভাদুড়ীর একটি নির্ভেজাল হাসির গল্প। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক এবং অ্যালোপাথ চিকিৎসকের মধ্যে বিবোধ চিরকালের। অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসকেরা তির্যক দৃষ্টিতে হোমিওপ্যাথদের দেখেন আবার হোমিওপ্যাথেরাও অনুরূপ দৃষ্টি দিয়ে অ্যালোপ্যাথদের দেখেন। 'উপেন্দ্র হোমিও ফার্মেসি'র উপীন ডাক্তার অ্যালোপ্যাথ ডঃ চ্যাটার্জিকে সহ্য করতে পারেন না। সতীনাথ ভাদুড়ী দু-একটি কথায় 'উপেন্দ্র হোমিও ফার্মেসি'র চমৎকার ছবি এঁকেছেন : "ডিসপেনসারি ঘরের দেওয়ালে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো দুইটি উপদেশ বাণী। প্রথমটিতে সকলকে মনে করিয়ে দেওয়া যে 'বিশ্বাস না থাকিলে ঔষধে কোন ফল হয় না।' দ্বিতীয়টিতে তর্জনী সংকেত দিয়ে লেখা—'ঔষধ সেবন কালে তামাক খাওয়া এবং সিঁদুর ব্যবহার করা বারণ। মেটে সিঁদুর চলিতে পারে।"

বাড়ীর পরিবেশ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অনুকুল করার জন্য উপীন ডাক্তার স্ত্রীকেও কিছু কিছু হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা শেখান। এহেন উপীন ডাক্তারের বাড়ীতেও একদিন ডঃ চ্যাটার্জির আগমন ঘটে। উপীন ডাক্তারের একমাত্র ছেলে ভন্তু একদিন অনেকগুলি হোমিওপ্যাথি শিশির ঔষধ একসঙ্গে খেয়ে ফেলে। ভন্তু ভয়ে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে। ভন্তুর মা বিচলিত হয়ে স্বামীকে ডাকেন। উপীন ডাক্তার এসে দেখেন ভন্তু অনেকগুলো শিশির ওষুধ এক গ্লাস জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে ফেলেছে। উপীন ডাক্তার চিন্তিত হয়ে ভন্তুর নাড়ী পরীক্ষা করেন। ভন্তুর মা কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। এতগুলো ওষুধের ধক কি করে কাটানো সম্ভব এ সব নিয়ে সকলেই খুব ভাবিত হয়ে

পড়ে। এমন সময় গজালের বউ, সেও কিছুক্ষণ আগে ওষুধ নিতে এসেছিল।"
—তার একটা কথা মনে পড়াতে ঘোমটার আড়াল থেকে ভক্তর মাকে বলে :
"আমাকে যে খানিক আগেই সিঁদুর ব্যবহার করতে বারণ করলেন ওষুধের
ধক কেটে যাবে বলে, তা সেই সিঁদুর খানিকটা খোকাবাবুর কপালে লাগিয়ে
দিলে হয় না? তাহলে তো এইসব জোরালো ওষুধের ধক নষ্ট হয়ে যেতে
পারে। মুখ্যু মানুষ আমরা তো সব বুঝি না।"

ভক্তর যখন এখন যায় তখন যায় অবস্থা, তখন গজালের বউ-এর এমন
সরল কথা যে অনাবিল হাস্যরসের অবতারণা করে, তাকে নির্মল হিউমার
ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। অনেকে তামাকের ধোঁয়া নাকে দেওয়ার
পরামর্শ দেয়। এমন সময় ডঃ চ্যাটার্জি পেট থেকে ওষুধ বার করবার যন্ত্রপাতি
নিয়ে ভক্তদের বাড়ীতে আসেন। ডঃ চ্যাটার্জিকে আসতে শুনে ভক্ত ভয়ে
ভয়ে চোখ খুলে ফেলে। তামাকের ধোঁয়াতেই কাজ হয়েছে অনুমান করে
উপীন ডাক্তার আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। মুহূর্তেই বিমর্ষভাব ঝেড়ে ফেলে
আবার হোমিওপ্যাথি ওষুধের মহিমায় গর্বিত হয়ে উঠেন। চিৎকার করে
বলেন : "অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারকে কে ডেকে আনতে বলেছিল। ডক্টর
চ্যাটার্জিকে ভিতরে আনবার দরকার নেই, পোদ্দারমশাই। আমাদের
ওষুধেই কাজ হয়েছে।...হেঃ।"...

'রাজকবি' ভিন্ন রসের গল্প। জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং এতে
আস্থাশীল রামযশ ভট্টাচার্য প্রধান শিক্ষকতা করা কালে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ
ছাত্রের কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন না। বিদ্যালয়ের যে কোন সাধারণ ব্যাপারে
বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রবণতার জন্য ছাত্ররা তাঁকে নিয়ে নানা ব্যঙ্গ-তামাসাও
করতো। রামযশবাবুর উগ্র স্বভাব, রূঢ় আচরণ খামখেয়ালপনার জন্য
বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অস্থির থাকলেও স্থানীয় ভদ্রলোকেরা তাঁর উপর বিশেষ
বিরূপ ছিলেন না। এর কারণ তিনি হাতের রেখা ভালো দেখতে জানতেন।
কিন্তু তাঁর কোনো কোনো আচরণ স্থানীয় মহলে রহস্যের সৃষ্টি করেছিল।
প্রত্যেক শনিবার তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালা বন্ধ করে রেখে কলকাতা যেতেন।
তাঁর এই কলকাতা যাওয়া নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলতো, কেউ কেউ বলতেন যে
রামযশবাবু প্রত্যেক শনিবার কলকাতায় রেস খেলতে যান, কিন্তু আসলে কি
উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যেক শনিবার কলকাতা আসেন সেটা কারো জানা ছিল না।
লেখকের সহপাঠী নরেশ ছাত্র অবস্থা থেকেই ভালো ছড়া কাটতে পারতো

এবং সেই-ই রামযশবাবুর সঙ্গে তামাসাটা একটু বেশী করতো। তার ছড়ার আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন প্রধান শিক্ষক রামযশবাবু। নরেশের ছড়ার আক্রমণ থেকে রামযশবাবুর স্ত্রীও রেহাই পেত না। লেখকের এ ব্যাপারে একটু আপত্তি ছিল, কেন না রামযশবাবুর স্ত্রীকে এর মধ্যে টানাতে তার বিবেকের সায় ছিল না। পরবর্তীকালে লেখক ডাক্তার হয়ে নিজের শহরেই প্র্যাকটিস করে এবং নরেশও কবিরাজ হয়ে পুরাতন শহরে থেকে যায়,—এই কারণে তাদের বাল্যবন্ধুত্ব অটুট ছিল।

লেখক যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র সে সময় হঠাৎ রামযশবাবু সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার পদে ইস্তফা দিয়ে পূর্ববঙ্গে দেশের বাড়ীতে চলে গেলেন। এর কোন সঠিক কারণ কেউই জানতো না, তিনিও এ ব্যাপারে কিছুই বলেন নি। এর দীর্ঘকাল পর চুয়াত্তর বছর বয়সে সস্ত্রীক লেখকের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। লেখক বাবুরামবাবুর বৃদ্ধা পত্নীর অবস্থা চিন্তা করে কিছুই বলতে পারলেন না। নরেন কবিরাজ কিন্তু সহজে ব্যাপারটা মানতে চায় না, সে তার স্বভাব সুলভ ব্যঙ্গোক্তি করে এবং যার বক্র আক্রমণ থেকে রামযশবাবুর পত্নীও রেহাই পান না। লেখক বৃদ্ধার অবমাননা অন্তরে মেনে নিতে পারেন না, আবার বন্ধুকেও কিছু বলতে পারেন না।

বৃদ্ধ রামযশবাবু শহরের বড় রাস্তায় জ্যোতিষ কার্যালয় খুলে বসেন। রামযশবাবুর অভাবের সংসারে লেখক পত্নী নানাভাবে সাহায্য করেন, অবশ্য সবই বৃদ্ধ রামযশবাবুর অজ্ঞাতে। তাদের উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সম্বন্ধ গড়ে উঠে। একদিন জ্যোতিষ কার্যালয়ে পুলিশের আগমন ঘটে। জ্যোতিষ কার্যালয়টি আগে এক শালওয়ালার ছিল, দেশ বিভাগের সময় সে টাক পয়সা মাটিতে পুঁতে রেখে চলে যায়। সেই পুলিশ নিয়ে এসেছে।

পরে জানতে পারা যায় রামযশবাবুকে কলকাতার কোন গণৎকার তাঁর গুপ্তধন প্রাপ্তি যোগ আছে বলেছিলেন, কিন্তু কোথায় তা পাওয়া যাবে তা সঠিক করে বলেন নি। এই কারণেই তিনি প্রত্যেক শনিবার কলকাতায় গণৎকারের কাছে আসতেন। হঠাৎ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি এই কারণেই পূর্ববঙ্গের দেশের বাড়ীতে চলে গিয়েছিলেন, পুনরায় পুরাতন কর্মস্থলে ফিরে জ্যোতিষ কার্যালয় খোলার কারণও গুপ্তধন প্রাপ্তির আশা। এরপর নরেন কবিরাজ যে ছড়াটি রচনা করলো তাতে রামযশবাবুর পত্নীর কোন উল্লেখ না থাকতে লেখক বিশেষ প্রীত হলেন, এতদিনে বোধ হয় বৃদ্ধার

কষ্টে নরেন কবিরাজেরও প্রাণ কেঁদেছে, এই আত্মতৃপ্তিতে।

'রাজকবি' গল্পটি একটু লঘু চালে রচিত হলেও, 'রাজকবি' গল্পটিকে সরাসরি হাসির গল্পের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। রামযশবাবুর চরিত্রটি যেমনভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে এবং তাঁকে নিয়ে তাঁরই বিদ্যালয়ের ছাত্র নরেশ কবিরাজ যে ধরণের ছড়া তৈরী করেছে তার মধ্যে নির্মল হাস্যরস থাকলেও রামযশবাবুর স্ত্রীর জীবনটি দুঃখে ভরা। তিনি স্বামীর খাম-খেয়ালীপনার জন্য জীবনে কোনদিনই নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। আসলে সতীনাথ মানুষের চরিত্রের অসংগতিগুলিকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর মানবপ্রীতি রূঢ় বাস্তবের প্রলেপে উজ্জ্বল। রামযশ ভট্টাচার্য যিনি চরম অভাবের মধ্যেও মিথ্যা কোষ্ঠী করবার জন্য অনুরুদ্ধ হওয়াতে দশটাকার নোট ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, তিনিই গুপ্তধনের প্রাপ্তির আশায় আজীবন নিষ্ফল ব্যয় করেছেন। মানুষের জীবনের এই অসঙ্গতিই তাঁর অধিকাংশ কাহিনীর উপজীব্য; ঘটনা সেখানে গৌণ হলেও গল্পগুলি তাই পরম উপভোগ্য হয়েছে।

ছোটগল্পকার রূপে সতীনাথের প্রকৃত মূল্যায়ন করার প্রধান অন্তরায় এই যে, তিনি কোন সুনির্দিষ্ট ধারার বা রীতির অনুগমন করেন নি। তাঁর প্রত্যেকটি গল্প স্বধর্মে এত পৃথক যে তাঁর গল্পগুলিকে কোন বিশেষ রীতিতে চিহ্নিত করা শক্ত। তিনি জীবনের অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যকে যেমন ঈষৎ ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখেছেন তেমনি সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর পরিহাসপ্রিয়তা ও কৌতুকরস সৃষ্টির জন্য যেমন আমরা তাঁকে সার্থক হাসির গল্পের লেখক বলতে পারি, তেমনি সংখ্যায় অল্প হলেও রোমান্টিক গল্পগুলির জন্যও তাঁকে তীব্র কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক গল্প-লেখকও বলতে পারি। সতীনাথের সঙ্গে অন্যান্য গল্প লেখকদের পার্থক্য এখানেই। সতীনাথ ভাদুড়ীর হাসির গল্প পড়লে মনে হয় তিনি বুঝি ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের ঐতিহ্যেরই সার্থক উত্তরসাধক, কিন্তু 'আঁন্টা বাংলা', 'পঙ্কতিলক', 'স্বর্গের স্বাদ' প্রভৃতি গল্পগুলি অপ্রত্যাশিত এবং অনাস্বাদিত এক নতুন রসের যোগান দেওয়াতে তাঁকে তীক্ষ্ণ কল্পনাবিলাসী রোমান্টিক গল্প লেখক বলেও মনে হয়। আসলে সতীনাথ মানুষের জীবনের ভিতরে বাইরে, পারিপার্শ্বিকে পরিচিত, অপরিচিত মহলে, ইতিহাসে, রোমান্সে প্রায় সকল জগতেই অনায়াস যাতায়াত করতে পারতেন, এজন্য তাঁকে কোন অবস্থাতেই তাঁর শিল্পমানকে ক্ষুণ্ণ করতে হয়নি। 'তবে কি ?' এমনই একটি ছোটগল্প

যাকে বাংলা শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির সঙ্গে সহজেই আসন দেওয়া যেতে পারে।

'তবে কি ?' গল্পের পাত্র-পাত্রীরা সকলেই ইংরেজ রাজপুরুষ। রবার্টসনের মেয়ে, আর পাঁচজন ইংরেজ রমণীর সঙ্গে তার পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। তার ধারণায় রমণী বীরভোগ্যা, সেই কারণে সে পুরুষের মত পুরুষের পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দিতে চাইতো। এ ব্যাপারে তার কোন সংস্কার বা ভাবাবেগ ছিল না। "বিচিত্ররূপিণী রবার্টসনের মেয়ের ভাবভঙ্গি অন্য রকমের। উড়ে বেড়ায়, নিজের খেয়াল খুশীতে, নাচুনী মেয়েটা। কথা বলার সময় কটা কটা চোখদুটি থেকে হাসির দ্যুতি ঠিকরে পড়ে। নতুন নতুন কাণ্ড করে, এখানকার লোকদের রসের খোরাক জোগায় ত্রিসন্ধ্যা। তার মধ্যে একটা বললেই সে মেয়ের স্বভাবের ধরন খানিকটা বুঝতে পারবেন। ওদের জমিদারির কুলের জঙ্গল বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল একজন লোক, লাক্ষার জন্য। সেই লোকটা এক রাত্রিতে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে একটা চিতাবাঘ মেরেছিল। মরা বাঘটার উপর বসে, লাঠি হাতে সেই লোকটাকে পিছনে দাঁড় করিয়ে রবার্টসনের মেয়ে পরের দিন ফটো তোলায়। তাকে নিয়ে এনে কুঠিতে রাখে। দিনকতক খুব মাখামাখি সে লোকটার সঙ্গে। তারপর একদিন তার সঙ্গে উধাও।"

এহেন প্রকৃতির মেয়ে যে দুর্ধর্ষ শিকারী উদ্ধত অমিতব্যয়ী বড়লোক পেরী সাহেবের প্রতি আকৃষ্ট হবে সেটাই স্বাভাবিক। পেরীর প্রদীপ্ত পৌরুষে রবার্টসনের রহস্যচপলা মেয়ে আকৃষ্ট হয় এবং তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রবার্টসনের মেয়ে লক্ষ্য করে পেরীর মধ্যে সেই প্রদীপ্ত পৌরুষের অভাব ঘটেছে। "বীরভোগ্যা রবার্টসনের-মেয়ে চেয়েছিল পুরুষের মত পুরুষের পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দিতে। কিন্তু বীরপুরুষের ছিবড়েও যে নেই এর মধ্যে। বীরপুরুষ না ছাই। ও জোর গলায় হুকুম করে না কেন ? পান থেকে চুন খসলে চাবকে লাল করে দেব—এই ভাষায় স্বামী কথা বলে না কেন তার সঙ্গে ? সবচেয়ে অসহ্য পেরীর আজকালকার মিনমিনে ভাবটা।" যে পৌরুষ দেখে রবার্টসনের মেয়ে একদিন পেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার সামান্য ঘাটতি মনে হওয়াতে সে পেরীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করলো। এরপর মিলিটারি ফেরৎ সার্জেন্টমেজর ওব্রায়েনের সঙ্গে রবার্টসনের মেয়ের অন্তরঙ্গতা দেখা গেল। কিছুদিনের মধ্যে তারা বিবাহ করল। কিন্তু স্থানীয় সমাজ তারা রবার্টসনের মেয়ের প্রকৃতি ভালো করেই জানতো। তাই

বলাবলি করতো "রবার্টসনের মেয়ে তো। চিতাবাঘ মারলে টেঁকে একমাস, কমিশনার মারলে টেঁকে এক বছর, জোড়া সিংহ মারলে কদিন টিঁকবে?" দীর্ঘকাল অদর্শনের পর পেরী সাহেব আবার দেশে ফিরলো, কিন্তু একা নয় সঙ্গে নতুন স্ত্রী।

এরপর পেরী তার স্বমূর্তি ধারণ করলো। তার অমিতব্যয়িতার কোন শেষ রইল না। নিত্য নতুন ঘোড়া কেনার বাতিক হল। বাঙ্গালোর, পুনা, বোম্বাই, লাহোর সব জায়গায় ঘোড়া রাখে। স্ত্রীর বেশবিন্যাস দেখাশোনা করবার জন্য হাজার টাকা মাইনে দিয়ে বিলাত থেকে মেমসাহেব আনায়। পেরীর এই জৌলুস অবশ্য বেশীদিন থাকলো না। বহু পাওনাদার আসতে লাগলো। মামলা মোকদ্দমায় পেরী সাহেব একেবারে জেরবার হয়ে গেল। "পেরী তখন হুডহীন, গদিহীন'টি' মডেলের ফোর্ড গাড়িখানায় চড়ে প্রত্যহ কোর্টে আসে, স্ত্রীর আদেশানুযায়ী মোকদ্দমার তদবির করতে।"

রবার্টসনের মেয়ের স্বামী সার্জেণ্টমেজর তখন পেরীর বিরোধী দলে যোগ দিয়েছে। একবার একটা মামলায় মিসেস পেরীর সাক্ষ্য দেবার ডাক পড়লো। মিসেস পেরী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেবে, শহরের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে-পুরুষ আদালত কক্ষে এসে ভিড় জমালো। রবার্টসনের মেয়েও কৌতূহল দমন করতে পারলো না, সেও তার প্রাক্তন স্বামীর স্ত্রীকে দেখবার জন্য আদালতে উপস্থিত হলো। মোকদ্দমা যখন জমে উঠেছে সেই সময় সার্জেণ্ট-মেজর পেরীর দ্বিতীয় স্ত্রী বৈধ কিনা এ বিষয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলাতে পেরীর "মুহূর্তের মধ্যে কী যেন ঘটে গেল। সারা পৃথিবী মুছে গিয়েছে তার চোখের সম্মুখ থেকে। শুধু ওই দুশমনটার মুখ ছাড়া।...এজলাস ঘরের শান বাঁধানো মেঝের উপর পেরী সার্জেণ্টমেজরের মাথাটা ঠুকছে ঠক্ ঠক্ করে। কাছে যায় কার সাধ্য।"

পেরীর পৌরুষে আবার নতুন করে মুগ্ধ হল রবার্টসনের মেয়ে। সেইদিন থেকে স্বামীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়া ছেড়ে দিল। এর পরের ঘটনা খুব দ্রুত পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করলো। পেরী মামলা মকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় তার ঘোড়া হাতী আর সঙ্গে নিল আর সখের নানা ধরণের রাইফেলগুলো। পেরীর স্ত্রী তখন খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বাঁচবার কোন আশা নেই। কিন্তু পাওনা-দারেরা তবু পেরীকে নিস্তার দিল না। একজন পাওনাদার কোর্টের আরদালি

সেপাই নিয়ে গিয়েছিল পেরীর হাতীঘোড়া আর বন্দুক-রাইফেলগুলি ক্রোক করাতে। সার্জেণ্টমেজরও সম্পত্তি চিনিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে গিয়েছিল। উত্তেজনায় পেরী ফেটে পড়লো। বেপরোয়া গুলি চালিয়ে হাতী আর ঘোড়াটিকে ধরাশায়ী করলো। বন্দুক রাইফেলগুলো ভেঙ্গে মুচড়ে জলে ফেলে দিল। রবার্টসনের মেয়ে নোটের বাণ্ডিল নিয়ে হাসপাতালে মিসেস পেরীকে সাহায্য করতে গিয়েছিল, পেরীর তখন খুব দীনহীন অবস্থা: "তালিমারা জুতো ·· সুতো-বার-হওয়া ট্রাউজার···জরাজীর্ণ আস্তিন" পেরী একবার মৃত্যুমুখীন নীলনয়না স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো, তারপর নোটের বাণ্ডিল রবার্টসনের মেয়ের হাতে ফেরৎ দিয়ে দিল। মিসেস পেরীর মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই, এমন সময় অকস্মাৎ সার্জেণ্টমেজর মারা গেল। তবে কি রবার্টসনের মেয়ে পেরীর পৌরুষের কাছে আবার ধরা দেবে? এই ইঙ্গিতেই কাহিনী শেষ।

পূর্ণিয়ার প্ল্যাণ্টার জীবনের সত্য কাহিনী অবলম্বনে 'তবে কি?' গল্পটি গড়ে উঠেছে। সতীনাথের ডায়েরীতে এই গল্পের পরিকল্পনার অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। পূর্ণিয়ার প্ল্যাণ্টার জীবন নিয়ে তাঁর আরও একটি গল্প আছে, 'আণ্টা বাংলা' নামে। দুটি গল্পের পাত্র-পাত্রীরাই ইংরেজ রাজপুরুষ। সতীনাথ ভাদুড়ী স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কারাবরণও করেন। কিন্তু কোন ইংরাজ চরিত্র পরিকল্পনায় তিনি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ পোষণ করেন নি। 'তবে কি?' গল্পটিতে একদিকে যেমন সতীনাথ ভাদুড়ীর নিরাসক্ত শিল্পদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়; তেমনি অপরদিকে মানব-সন্ধানী জীবনরসিক মনের সাক্ষাতও লাভ করি।

অসাধু ব্যবসায়ী-পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত 'মুনাফা ঠাকুরণ' গল্পটি সতীনাথ ভাদুড়ীর হাসির গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। সমাজ জীবনের এবং ব্যক্তি জীবনের অসঙ্গতিকে লক্ষ্য করে সতীনাথ কিছু কিছু তির্যক এবং ব্যঙ্গাত্মক গল্প রচনা করেছেন, সেখানে কৌতুক এবং রঙ্গের সঙ্গে তীক্ষ্ম শ্লেষও মিশ্রিত আছে, কিন্তু 'মুনাফা ঠাকুরণ' গল্পে কৌতুক এবং রঙ্গ থাকলেও শ্লেষের তীব্রতা নেই। বাংলা ছোটগল্পে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প বলার সহজাত ক্ষমতার মতো সতীনাথ ভাদুড়ীরও গল্পবলার এক সহজাত ক্ষমতা ছিল, বিশেষ করে হাসির গল্প রচনায় এবং ঘটনা সংস্থানের কৌশলটি তাঁর সহজায়ত্ত ছিল। বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সতীনাথের গল্পগুলি অধিক জনপ্রিয় না

হওয়ার কারণ, তাঁর গল্পগুলিতে বাংলাদেশের অন্দর মহলের অতি পরিচিত চিত্র নেই। আজীবন প্রবাসে বাস করার জন্য তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার অন্তর্গত বিহারের মানুষজন এবং পরিবেশকে চিত্রিত করেছেন, এই কারণেই অনেক সময় সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পের রস উপলব্ধি করতে বাংলা-গল্পের অভ্যস্ত পাঠক-সমাজের অসুবিধা হয়। 'মুনাফা ঠাকুরণ' গল্পটির আরম্ভটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় তিনি কত সহজে সাবলীল ভাষা এবং ভঙ্গিমায় গল্পে গতি আনতে পারতেন। 'ফণী ইংরাজী বাংলা লিখত ভাল। বাসনা ছিল কাগজ চালাবে ভবিষ্যতে। কিন্তু নিতে হয়েছিল কাজ শেঠজীর গদিতে মাসিক সত্তর টাকা মাইনেতে। তবে কাজটা নিজের লাইনের—অর্থাৎ লেখা পড়ার কাজ—ইংরাজী আর বাংলায় চিঠিপত্র লেখার কাজ। কলেজে পড়বার সময় সে পলিটিক্স করত। এখানে এসে দেখে যে গদির পরিবেশ আর মনিব-কর্মচারীর সম্পর্ক ঠিক তার পলিটিক্সের জানা ছকে ফেলা যায় না।"

এই কারণেই একদিন সে শেঠজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, শেঠজীও দুর্বিনীত কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু ইংরাজি, বাংলা, হিন্দি জানা ছেলে ফণী সেও দমবার পাত্র নয়। শেঠজীর নামে নানা রকমের কুৎসা করে একটা বই ছাপালো। শেঠজীর ছেলে বিরিজলাল পিতার কলঙ্ক গাথা বাজারে বিক্রি হতে দেখে খুবই উত্তেজিত হয়ে বাজারের সবকটি কপি কিনে ফেললো যাতে অন্য কারো হাতে বইখানা না গিয়ে পড়ে। এর ফল হল উল্টো। দোকান থেকে হঠাৎ সব বই উঠে যাওয়াতে কালোবাজারে দু-টাকা দামের বই চার টাকা দামে বিক্রি হতে শুরু হল এবং কালোবাজার করলেন স্বয়ং শেঠ্জী। যা ছিল শেঠজীর চরিত্র হননের অপচেষ্টা এবং সমাজে অপদস্ত করার চক্রান্ত, তাই ব্যবসায়ে মুনাফার কারণ হয়ে দাঁড়াল। শেঠ্জীর ছেলে বিরিজলাল প্রেসের ব্যবসা শুরু করবার মনস্থ করলো। শেঠ্জীও ছেলেকে নতুন ব্যবসায়ে উৎসাহী দেখে খুশী হলেন। শেঠ্জীর স্ত্রী 'মুনাফা ঠাকুরণকে' প্রণাম জানাতে জানাতে বললেন, "যাঁর কৃপায় এতবড় লোকসানটা বদ্‌লে লাভের কারবার হয়ে গেল, তাঁর দেবাক্ষরা কলেবর, আজই আমি সেক্‌রা ডেকে রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে দেব।"

শেঠ্জীর কাছে সত্তর টাকা মাইনের চাকরী বেড়ে একশো পঞ্চাশ টাকা হল। কেননা এই ব্যবসায়ে ফণীই একমাত্র উপযুক্ত ছেলে। গল্পটি নিতান্তই হাসির গল্প হলেও গল্পটির বিশেষত্ব হল, সতীনাথ অল্প কথায়

শেঠ্‌জীর পরিবারের অন্দর মহলের চিত্র খুব নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন। পুত্রবধূর প্রতি শাশুড়ীর তির্যক উক্তি, পুত্রকে নিজের বশে রাখার চেষ্টা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবসায়িক সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়গুলি কয়েকটি কথায় অতি নিপুণ বাস্তবতার সঙ্গে রূপায়িত করতে পেরেছেন, কারণ সতীনাথ ছিলেন অত্যন্ত মনযোগী লেখক, অতি সাধারণ বিষয়কেও তিনি সমান গুরুত্ব দিতেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পগুলির মধ্যে কিছু কিছু গল্প পাওয়া যায় যেখানে গল্পরস অপেক্ষা চারিত্রিক অসঙ্গতির সরস বিশ্লেষণ অধিক প্রাধান্য লাভ করে গল্পের মধ্যে ভিন্ন স্বাদ নিয়ে এসেছে। কাহিনীবস্তু সেখানে সামান্যই থাকে। মধ্যবয়স্ক মানুষের বিকৃত মানসিকতা যা কি না প্রায় অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে, সে বিষয়কেও তিনি সামান্য কিছু ইঙ্গিতধর্মী বাক্য-বিন্যাসে উপভোগ্য করে তুলতে পারতেন। 'পত্রলেখার বাবা' এমনই একটি গল্প। এর মধ্যে তিন চারজন অসুস্থ মানসিকতার প্রৌঢ় ভদ্রলোকের চরিত্র তিনি চিত্রিত করেছেন: "দোলগোবিন্দবাবুর বাড়ীর আড্ডায় চেঁচামেচি নেই, হৈ চৈ নেই, কথা কাটাকাটি নেই, কথাবার্তা হয় থেমে থেমে। অতি সংক্ষেপে। একটু একজন বলে, বাকিটা সবাই বুঝে নেয়। সবটা কোন কথার বলতে হয় না। যে রকম গল্পের সবটা করা যায়, সে সব গল্পে এ আসরের লোকের উৎসাহ নেই। রুচির মিলের জন্য তিন চারজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের এই আড্ডাটা টিঁকে আছে।

রাস্তার ওদিককার বাড়িতে সেতার বাজানো আরম্ভ হল।

'শুরু হল।'

'হ্যাঁ—অ্যা।'

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, 'যেতে দাও। কী দরকার ওসব কথায়।'

ওই বাড়ির কর্তা নতুন বিয়ে করেছেন। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলেরা বড় হয়েছে। তাদের বন্ধু বান্ধবেরা ওই বাড়ীতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় গানের আসর বসায়, এ জিনিষ এদের চোখে খারাপ লাগে। সেইটে ওঁরা প্রকাশ করলেন ওই তিনটে বাক্যে।"

এই তিনটে বাক্যে পাঠকদের কাছেও আসরের প্রৌঢ় ভদ্রলোকদের চরিত্রের আসল স্বরূপটি ফুটে উঠলো। এদের মধ্যে দোলগোবিন্দবাবু আর একটু এগিয়ে আছেন, তিনি বেনামীতে চিঠি লিখে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। এ এক বিচিত্র মানসিকতা, "এর মধ্যে তিনি একটা অদ্ভুত আনন্দ পান।

দুর্বার এর আকর্ষণ। পরকুৎসা করবার বা শোনবার রসটা মিষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু এর তুলনায় পান্‌সে। এটাকে শুধু আড়াল থেকে খুনসুড়ি করে, মজা উপভোগ করা ভাবলে ভুল হবে। এ হচ্ছে ক্ষমতা-সচেতন মেঘনাদের, মেঘের আড়াল থেকে নিজের অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শিকারের উপর বেনামী চিঠির প্রতিক্রিয়ার কথাটা কল্পনা করেই সবচেয়ে বেশী আনন্দ ;" এর পেছনে তাঁর নিজের যুক্তি, সমাজের কল্যাণার্থে তাঁকে বেনামীতে চিঠি লিখতে হয়। আসলে তিনি মনোবিকারের রোগী। অপরকে অজান্তে আঘাত করে নিজে তৃপ্তি লাভ করে থাকেন। এই দোলগোবিন্দবাবুই একদিন তাঁর মেয়ের বইপত্র-এর ভেতর থেকে একখানি প্রেমপত্র আবিষ্কার করলেন। প্রেমপত্রটি তাঁর মেয়ে পত্রলেখার, তাঁদের প্রতিবেশী নেপাল নামে এক ছেলেকে উদ্দেশ্য করে লেখা। নিজের মেয়ের এই কাজ দেখে মেয়ের চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে শিক্ষা দিতে চাইলেন। কিন্তু এ সব নিয়ে তিনি হৈচৈ করতে পারলেন না, কেননা নেপালকেই তিনি বেনামী চিঠি টাইপ করার জন্য দিয়েছেন। নেপালের কাছেই তাঁর হস্তলিখিত চিঠিটা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত একদিন পত্রলেখার মার কাছে তিনি বেনামীতে উড়ো চিঠি দিলেন। স্ত্রীর কাছে লেখা এটাই তাঁর জীবনের প্রথম চিঠি। দোলগোবিন্দবাবুর স্ত্রী পাড়ারই মেয়ে হওয়ার জন্য কোনদিন স্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। অথচ, "কলমের উল্‌টো দিকটা কালির মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তিনি লিখছেন। লিখছেন নতুন একখানা চিঠি। বেনামী চিঠি। পত্রলেখার মায়ের কাছে। জীবনে স্ত্রীর কাছে তাঁর এই প্রথম চিঠি লেখা।"

এবারে তাঁর বেনামী চিঠির শিকার নিজের স্ত্রী। এখানেই কাহিনীর শেষ চমক। 'পত্রলেখার বাবা' একটি সাধারণ কৌতুক-কাহিনী। কিন্তু কাহিনী বলার মুন্সীয়ানায় এবং লেখনীর জাদু স্পর্শে তিনি অতি সহজেই মানুষের জীবনের অতি গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন।

'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ' 'পত্রলেখার বাবা'র মত সাধারণ হাসির গল্প নয়, এর সুর ভিন্ন ধরণের। রেল কলোনীর অফিসার গিন্নী মিসেস্‌ মুখার্জি পাড়া প্রতিবেশীর কাছে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ নামে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য মিসেস্‌ মুখার্জি, কোনো সুকৃতির জন্য কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ বিশেষণে ভূষিত হন নি, তাঁর রুক্ষ মেজাজ,চাল-চলনে বেপরোয়া ভাব এবং উদ্ধত আচরণের জন্য প্রতিবেশীর

নিকটে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ নামটি পেয়েছিলেন। বিয়ের পর থেকেই মিঃ মুখার্জির সঙ্গে মিসেস্ মুখার্জির ভাল বনিবনা ছিল না। মিসেস্ মুখার্জির নির্বিচারে অর্থ ব্যয়ই বিবাদের অন্যতম কারণ ছিল। মিঃ মুখার্জি সংসারের খরচ স্ত্রীর হাতে দিয়ে বাকী টাকা পয়সা নিজেই আলমারিতে রেখে আলমারির চাবিটাও নিজের কাছে রাখতেন। তাঁর স্ত্রীর এটাই ছিল প্রধান অভিযোগ। মিঃ মুখার্জি ছিলেন মিতব্যয়ী সংযত এবং দায়িত্বশীল মানুষ। এ-হেন মিঃ মুখার্জি একদিন আত্মহত্যা করলেন। মৃত্যুর আগে চিঠিতে লিখে গেলেন, "আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে। মলি, ডলি, প্রদীপ তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিও।"

মিঃ মুখার্জি পুত্র-কন্যাদের নাম উল্লেখ করলেও স্ত্রীর নাম কোথাও উল্লেখ করলেন না। স্ত্রী-ই যে তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী এ ধারণা কেবল পাড়া প্রতিবেশীরাই নয়, মিসেস্ মুখার্জি নিজেও জানতেন তিনি তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী ; এর জন্যে অনুতপ্ত না হয়ে স্বামীর মৃত্যুর জন্য যে তাঁর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরাই পরোক্ষে দায়ী এ কথাই সোচ্চারে প্রচার করতে লাগলেন। গল্পটি এখানেই শেষ হওয়ার কথা। ছোটগল্পে এ ধরণের সমাপ্তিতে পাঠকেরা অভ্যস্ত, কিন্তু সতীনাথ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে গল্পের মধ্যে কেবল চমক সৃষ্টিই করতেন না, মানুষের চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে সামান্য তুচ্ছ বিষয়কেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তাই এই গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই, আপাত সাধারণ একটি ঘটনা কি অসাধারণ রস সৃষ্টি করেছে। মিসেস্ মুখার্জি স্বামীর জীবদ্দশায় তাঁর লোহার আলমারিটি খোলার অধিকার পাননি। মিঃ মুখার্জি যেদিন আত্মহত্যা করেন সেদিন সকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লোহার আলমারির চাবিটি নিয়েই কলহ হয় ; মিসেস্ মুখার্জি যখন চাবিটির পূর্ণ অধিকার পেলেন তখন চাবিটি দিয়ে আলমারিটি খুলতে পারলেন না ; অনেক চেষ্টার পরও চাবিটি কিছুতেই আলমারিতে লাগলো না। শেষ পর্যন্ত রহস্যভেদ করলো মিসেস্ মুখার্জির বড় মেয়ে মলি। "হাতের চাবিটিকে উল্টে-পাল্টে দেখছে মলি। দেখতে দেখতে কপালে কয়েকটা কুঞ্চন রেখা পড়ল। ড্রেসিং-টেবিলের উপর থেকে একটা মাথার কাঁটা তুলে নিয়ে সে এসে বসলো কম্বলের উপর।...কাঁটা দিয়ে চাবির ফুটোটা খোঁচাচ্ছে।... খুঁচিয়ে বার করে হাতের তেলোর উপর রাখল একটা সুপুরির টুকরো—

খুব মিহি করে কাটা।" মলি খুব মিহি করে সুপুরি কাটতে পারতো, মিঃ মুখার্জি মলির হাতের কাটা সুপুরি ছাড়া আর কারো হাতের কাটা সুপুরি খেতে পারতেন না। 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ' গল্পটিতে মিসেস্ মুখার্জির চরিত্র পরিকল্পনায় লেখক অসাধারণ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আভিজাত্যের অহংকার মানুষকে যে কতখানি কৃত্রিম করে তুলতে পারে, মিসেস্ মুখার্জি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সতীনাথ ভাদুড়ী যেমন আধুনিক মানুষের জটিল মানসিকতাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি তেমন ভাবে আধুনিক জটিল মনোভাবকে ধরবার বিশেষ প্রয়াস করেননি। এই কারণে সতীনাথের এই ছোটগল্পগুলিতে সহজ সরল অকৃত্রিম জীবনরসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর 'বাহাত্তুরে' গল্পটির উল্লেখ করা যায়। এখানে হাসির অন্তরালে এক বেদনা-বোধের ফল্গু ধারা তাঁর অনেকগুলি গল্পের মধ্যে সহজভাবে প্রবাহিত হয়েছে। আপাত হাসির গল্পটির মধ্যে এক বৃদ্ধ দম্পতির পরস্পর বিচ্ছেদের আশঙ্কায় উদ্বেলিত হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

মহাজনী কারবার করে শ্রীদাম সাহা জীবনে অনেক অর্থ এবং সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন। স্ত্রী পুত্র কন্যা নাতি নাতনীকে নিয়ে তাঁর বৃহৎ সংসার। বাহাত্তর বছর বয়সে এসেও তিনি সংসারের কর্তৃত্ব নিজের হাতেই রাখেন। তাঁর ভালমন্দের প্রতি যাতে সকলের সব সময় দৃষ্টি থাকে তিনি এটাই আশা করেন। শ্রীদামবাবুর স্ত্রী বরাবরের হাঁপানি রোগী হলেও স্বামীর সেবায় কোনদিন অযত্ন বা ত্রুটি করেন নি। কৃপণ বলে বাইরে শ্রীদামবাবুর দুর্নাম থাকলেও স্ত্রীর হাঁপানির চিকিৎসায় তিনি কোন কার্পণ্য করতেন না। শ্রীদামবাবুর স্ত্রী এগারটি সন্তানের জননী। তিনি তাঁর স্ত্রীকে সংসারের লক্ষ্মী বলেই জানতেন। সেকেলে মানুষ শ্রীদামবাবু, ভাবতেন স্ত্রী ভাগ্যেই তাঁর এত ধনজন বিষয়সম্পত্তি। এহেন সতীসাধ্বী শ্রীদামবাবুর স্ত্রী বড়ছেলের কথায় শ্রীদামবাবুর পরিচিত নরেন ডাক্তারের পরামর্শে সিঁথিতে সিঁদুর ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে মেটে সিঁদুর ব্যবহার আরম্ভ করলেন, কেন না নরেন ডাক্তারের মত শ্রীদামবাবুর স্ত্রীর হাঁপানি সিঁদুর ব্যবহার করার জন্য, সিঁদুরেই তাঁর এলার্জি এবং এই কারণেই তাঁর হাঁপানি। শ্রীদামবাবুর অভিমানের সূত্রপাত এখান থেকেই। তিনি বিশ্বাস করেন সিঁথিতে সিঁদুর না পরার

অর্থ স্বামীর মৃত্যু ডেকে আনা। তাঁর স্ত্রীর এটা বোঝা উচিত ছিল, "সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে স্বর্গে যাওয়াই তো চিরকাল মেয়েদের কাম্য বলে জানতেন। সৃষ্টিধরের মারও আজকালকার মেয়েদের মেমসাহেবী হাওয়া লাগল নাকি?" অথচ পঞ্চান্ন বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি যা কিছু পেয়েছেন, তার সবটুকুকে মিথ্যা ছলাকলা বলে ভাবতে পারেন না।

শ্রীদামবাবুর স্ত্রীর উপর অভিমান হল। হঠাৎ তিনি করোনারীতে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এ যাত্রা তিনি নিস্তার পেলেন। তিনি আরও তৃপ্তি লাভ করলেন যে তাঁর সন্দেহ অমূলক নয়, তাঁর স্ত্রী সিঁদুর ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিপদ, তাঁর অভিমান আরও বাড়লো তাঁর স্ত্রীর একথা খেয়াল হল না দেখে। শ্রীদামবাবুর স্ত্রী যখন জানতে পারলেন স্বামীর অমঙ্গলের জন্য দায়ী পরোক্ষভাবে তিনিই। নিজের কপাল নিজেই পোড়াতে গিয়েছিলেন। এ যাত্রা তাঁর স্বামীকে বুড়ো শিব রক্ষা করেছেন। তাঁর ভুল শোধরাবার সময় দিয়েছেন। আর এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত না। প্রতি মুহূর্তের দাম অনেক। তিনি ছুটে চলে গেলেন মেটে সিঁদুর মুছে আসল সিঁদুর দেবার জন্য। শ্রীদামবাবুর তখন অন্য চিন্তা।

মেটে সিঁদুর মুছে ফেলে আসল সিঁদুর লাগাবার মধ্যবর্তী সময়টাই চরম মুহূর্ত। শ্রীদামবাবু চীৎকার করে কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু তিনি ততক্ষণে আবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন। আপাত এটি সরস গল্প মনে হলেও, বৃদ্ধের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করায় সতীনাথ এখানে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। বৃহৎ পরিবারের মধ্যে থেকেও বৃদ্ধ অবস্থায় মানুষ নিজেকে কতদূর অসহায় বোধ করে এবং কত সাধারণ ব্যাপারে শিশুর মত অভিমান করতে পারে তার নিখুঁত চিত্র রয়েছে 'বাহাত্তুরে' গল্পটিতে।

সতীনাথের 'কণ্ঠকণ্ডূতি' গল্পটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সতীনাথ যে শিল্পরীতি গ্রহণ করেছিলেন তা মনের জটিল গ্রন্থিগুলি উন্মোচনের পক্ষে সহায়ক ছিল, কিন্তু ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে লেখক অনেক সময় মনের বক্রগতিকে অতি সহজ ভাবে প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তি-জীবনের ট্র্যাজিডির সঙ্গে সরস কৌতুক মিশ্রিত করে তিনি কয়েকটি অসাধারণ গল্প রচনা করেছেন। 'কণ্ঠকণ্ডূতি' এই শ্রেণীর একটি গল্প। লেখকের রাজনীতিক জীবনের এক পরিচিত কর্মী বিরজু। শিক্ষাদীক্ষা

সামান্য হলেও বিরজুর বক্তৃতা করার ক্ষমতা ছিল। তার সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং ভাষণ দেওয়ার নৈপুণ্যের জন্য তাকে 'জিরানিয়া কৌয়ল' বা জিরানিয়া জেলার কোকিল বলা হোত। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে একদিন তারই কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। অনেক চিকিৎসার পরেও তার আগের কণ্ঠস্বর আর ফিরে এল না। তাই সে মাইক আর লাউড স্পীকার ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা শুরু করলো, মাইকের নিচের টিনের চাকৃতির উপর বড় করে লিখে রাখলো 'জিরানিয়া-কোয়ল'। বিরজুর জীবনের এই ট্রাজিডির সঙ্গে লেখক বিরজুর প্রথম যৌবনের এক দুরন্ত কৌতূহলকে মিশ্রিত করে এক অসাধারণ রস সৃষ্টি করেছেন।

রাজনৈতিক কারণে বিরুজুকে একবার জেলে যেতে হয়, জেল থেকে ফিরে এসে শহরের এক বিত্তশালী মহাজনের বাইরের আস্তাবলের পাশের ঘরে তাকে থাকবার জায়গা করতে হয়েছিল। এই আস্তানায় এসে বিরজু এক অপরিচিত জগতের আস্বাদ পেল। অন্তরাল থেকে শাহজীর বাড়ীর অন্দর মহলে শুরু হল তার তরুণ মনের কাল্পনিক বিহার। সতীনাথ ভাদুড়ী খুব বেশী প্রেমের গল্প রচনা করেন নি, কিন্তু তিনি কত অনায়াসে অব্যক্ত মনের ছবি আঁকতে পারতেন তাঁর এখানকার বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। লেখকের ভাষায়, "কত কিছু কল্পনা করে নিতে ভাল লাগে। পুত্রবধূ, কন্যা, আশ্রিতা পালিতা কত আছেন সাওজীর বাড়ীতে। এঁদের মধ্যে কার সেই কণ্ঠস্বর, সে কথা সে ঠিক আন্দাজ করতে পারে না···পাঁচশ গোনা শেষ হয়েছে। বিরজুর বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে এল বুঝি। ওই! খুক! খুক! প্রত্যাশিত সংকেত। কাশির শব্দ। ভিজে-ভিজে গলা। অতি পরিচিত। অত্যন্ত আপন। একবার গলা-খাঁকরি দিয়ে বিরজুও কাশল—খুক্ খুক্। কাশির সংকেতের উত্তরে। বেশী জোরে নয়। ড্রাইভার-কোচম্যানের কাছে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। আবার সে কান পেতে শোনে। পরিচিত কাশির ধ্বনির মধ্যে দিয়ে আবার সাড়া দিলেন তিনি। এমনি করেই উত্তর প্রত্যুত্তর চলে, যতক্ষণ না ড্রাইভার, সহিস, কোচম্যান ঘুম থেকে ওঠে। · কখনো কখনো মনে হয়, কৌতুকময়ী সাড়া না দিয়ে মজা উপভোগ করছেন।···প্রথম প্রথম ছিল খেলা। পরে কিন্তু জিনিসটা বিরজুর কাছে খেলার চেয়েও অনেক বড় হয়ে উঠেছিল। কত স্বপ্নজাল বোনা এ নিয়ে। এ ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগের দিন, সে সারারাত কেশেছিল গলায়

কম্ফর্টার জড়িয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভান করে।"

এরপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে। বিরজু তখন মাইকের ব্যবসা করে। কিন্তু অদেখা নারীকণ্ঠের কাশির শব্দটি সে ভুলতে পারে নি। এক দিন সেই মহাজন শাহজীর বাড়ীতেই রামায়ণ গান উপলক্ষে বিরজু মাইক দিতে এল। বিরজু একদিন এ বাড়ীতেই থেকে গেছে। এখানেই সে অদেখা নারীর কাশির খুক্ খুক্ শব্দ শুনে স্বপ্নের অনেক জাল বুনেছে। লেখক বিরজুর পুরানো রাজনৈতিক দলের কর্মী, তিনিও রামায়ণ গান উপলক্ষ্যে এসেছেন; কিন্তু তাঁর নজর বিরজুর দিকে। রামায়ণ গান যখন জমে উঠেছে এমন সময় মাইক বিভ্রাট। এর আগেও দু-একবার মাইক বিভ্রাট ঘটেছে। বিরজু চিন্তিত না হয়ে মাইক মেরামত করতে লাগলো। "একবার গলা খাঁকরি দিয়ে, সে মাইকের সম্মুখে কাশল—খুক্ খুক্ করে। কর্কশ আওয়াজটা বুলেটের মতো গিয়ে লাগলো অগণিত ধৈর্যচ্যুত শ্রোতাদের কানের পর্দায়। অনেকক্ষণ ধরে তারা এই অকর্মণ্য মাইকওয়ালাটার অত্যাচার সহ্য করেছে।" জনতা মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো কোয়লজীর উপর। লেখকও তার পুরানো সঙ্গীকে বাঁচাতে বিরজুকে জাপটে ধরে রেখেছেন। ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে কোয়লজীকে বাঁচাবার জন্য গৃহকর্তা ঠেলে তাদের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন, যাতে আর কেউ না ঢুকতে পারে। এর পরেই ঘনিয়ে আসে চরম নাটকীয় মুহূর্ত। সুদীর্ঘকাল লালিত এক স্বপ্ন কিভাবে রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হল, তারই চমকপ্রদ বর্ণনা গল্পের একেবারে শেষে পাওয়া যায়। কৌতুক, রঙ্গ এবং বেদনার এমন মর্মান্তিক রূপায়ণ একজন ছোটগল্পকারই করতে পারেন। গল্পের অপ্রত্যাশিত শেষ চমকটি পাঠককে অভিভূত করে দেয়। "আমরা যেখানে ঢুকলাম, সেটা একটা ঘর। অজস্র হুঁকো, কলকে, গড়গড়া আর তামাক খাওয়ার অন্যান্য সব রকমের সরঞ্জাম ঘরময় ছড়ানো। গৃহকর্তার মা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছিলেন।... আমরা ঘরে ঢুকবার মুহূর্তেই বোধ হয় গৃহকর্তার মা হুঁকোয় টান দিয়েছিলেন। নাক দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বার হচ্ছে। কাশি আসছে বুঝি ভদ্রমহিলার। চেষ্টা করেও চাপতে পারলেন না। খুক খুক করে কাশলেন।" এরপর যখন লেখকের সঙ্গে পাঠকের মনেও এক সংশয় উপস্থিত হয় যে, বিরজুর মাইক খারাপ করার আসল উদ্দেশ্য কি ছিল, তখন আড়ষ্ট বিরজু ফিসফিস করা উত্তর "সেই আওয়াজটা তামাক টানার কাশির; এঁরই।"

এই একটি মাত্র শব্দের দ্বারা লেখক এক রুদ্ধশ্বাস নাটকের যবনিকা টেনে দেন। বিদ্যুৎগর্ভ এই একটি পংক্তিতেই আলোকিত হয়ে ওঠে লেখকের অনন্য নাট্যসত্তা।

হাস্যরস, জীবনের প্রতি তির্যক দৃষ্টি, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং চারিত্রিক অসঙ্গতি ইত্যাদি বিষয়ে রচিত অনেকগুলি গল্পের চরিত্রগুলি সাধারণত টাইপ চরিত্রে পরিণত হওয়ার জন্য জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়দানে অসমর্থ হয়ে পড়ে। সতীনাথ ভাদুড়ীকে সাধারণ বিচারে একজন ব্যঙ্গ লেখক বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি কিছু কিছু গল্পে জীবনের নিভৃততম কোণ থেকে এমন কিছু উপকরণ সংগ্রহ করে এনেছেন যার জন্য তাঁকে কোন এক বিশেষ রীতির ছোটগল্পকার বলে চিহ্নিত করা যায় না। সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের স্বাদ-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এতাবৎ আলোচিত গল্পগুলির মধ্যে একদিকে যেমন হাস্যকৌতুক ব্যঙ্গবিদ্রূপ সরসতার গল্প পাওয়া গেছে তেমনি অপরদিকে জীবনের গম্ভীর প্রকৃতি এবং বিষাদঘন পরিণতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে সতীনাথ সৎ-সাহিত্য চর্চার জন্য যতটা আগ্রহী ছিলেন জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য তেমন আগ্রহী ছিলেন না। এই কারণে তাঁর গল্পগুলিকে আপাত শুষ্ক ও নীরস বলে সাধারণ পাঠকের কাছে মনে হলেও অনুসন্ধিৎসু পাঠক কঠিন খোলসের মধ্যে জীবন-রসে সিক্ত সুকুমার বৃত্তিগুলিকে সহজেই আবিষ্কার করতে পারেন। 'সাঁঝের শীতল' এমনই একটি গল্প।

জজ সাহেবের এজলাসে শীতল 'পাংখা-পুলার'। এ-ছাড়া এর ওর বাগানে ঘাস কেটে বাড়তি দু-চার পয়সা রোজগার করে নেশা ভাঙ করে। সে চিরকাল রাত্রে ঘাস কাটে ভাটিখানা থেকে ঘুরে আসার পর। শীতল কুৎসিত দর্শন: "কোমরের থেকে নিচের অংশটা উপরের অংশ থেকে অনেক ছোট। হাঁটুর কাছটা একটু বেরিয়ে এসেছে, ধনুকের মতো। পায়ের ফাঁক ফাঁক আঙুলগুলোও ভিতরের দিকে বাঁকানো।"—

ছেলেবেলায় কুমোরের কাজ করতো, ওর বউ শীতলকে ফেলে চলে যায়, তারপর থেকেই সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে আর বড় একটা দেশে যায় না। শীতলের নোংরা পোষাক এবং বিকৃত চেহারা দেখে স্থানীয় শিশুরা ভয় পায়, ওকে দেখলেই ছোটরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। শীতলের বন্ধু নথুনী জজ-সাহেবের বিনা মাইনের ড্রাইভার, আসলে আদালতের রেকর্ড রুমের পাকিং ক্লার্ক। মাইনে পায় গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ওই কাজের জন্য, যদিও সে

রেকর্ড আপিসে কোনদিন যায়নি। নথুনীর দেশে মেয়ে-বৌ থাকলেও সে তাদের খোঁজ খবর নেয় না। শীতল কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে দেশ থেকে নথুনীর বৌ-মেয়েকে নিয়ে আসে।

নথুনীর মেয়ে কিন্তু শীতলকে দেখে ভয়ে পায় না। শীতল খুব আদর করে নথুনীর ছোট্ট মেয়েকে। এদিকে আদালতে অনেক কিছু পালটে গেছে। নতুন জজসাহেব এসেছেন। খুব কড়া মেজাজের। দুর্নীতি একেবারেই বরদাস্ত করে না। নথুনীর বিনা মাইনের খাতিরের ড্রাইভারের কাজটি আর থাকে না। রেকর্ড রুমের চাকরিটিও চলে যাওয়ার উপক্রম। এদিকে শহরে বিদ্যুৎ আসে, আদালতেও ফ্যান আসবে, শীতলের পাংখা পুলারের কাজটিও চলে যাবে। নথুনীর সঙ্গে শীতলের সারাদিনেও দেখা হল না। ভেবেছিল রাত্রে ভাটিখানায় নিশ্চয় দেখা হবে, কিন্তু সেখানেও হতাশ হতে হল শীতলকে। ভাটিখানায় জজসাহেবের মেথরের সঙ্গে দেখা হল, সে একাই এসেছে তার বৌকে সঙ্গে আনেনি। নথুনীটা দু-পা দূরে গিয়ে বৌ-মেয়ের সঙ্গে দেখা করে না, চাকরী যাওয়ার এতই ভয়। নানা সন্দেহ উঁকি দিল শীতলের মনে।

"শীতল তখন বোতল দাস। কাস্তেটা হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে জজসাহেবের কম্পাউণ্ডে ঘাস কাটতে। রাত নটার সময় জজ-সাহেব নিশ্চয়ই নিজের কামরাতে থাকবে।" অন্ধকারেও শীতল দেখতে পায়। তার দৃষ্টি মেথরের ঘরের দিকে। আজ ঘরের কুপীটাও জ্বলছে না। শীতল জানে রাত দশটার আগে সে ফিরবে না। শীতল হঠাৎ অনুভব করলো, অন্ধকারটা যেন একটু নড়ে উঠলো। "নড়ন্ত কম অন্ধকারটুকু তাড়াতাড়ি এগুচ্ছে মেথরের ঘরের দিকে।" নথুনীর এতটা পতন। শীতল ভাবতে পারে না, 'হতভাগা' বলে উঠে দাঁড়ায়। সে এগিয়ে যায় মেথরের ঘরের দিকে, কিন্তু "তার হাতের এক ঝটকায় যে লোকটা মেথরের ঘর থেকে বাইরে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সে লোকটা নথুনী নয়, জজ সাহেব।"

'একটি কিংবদন্তীর জন্ম' গল্পটি বিহারের এক গ্রামের উচ্চবিত্ত ভূস্বামী নওরঙ্গী চৌবেকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। অর্থশালী এবং দানসাগর বলে জেলায় তার সুখ্যাতি আছে। প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী নওরঙ্গী চৌবে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। সাধারণ স্তরের মানুষ থেকে আরম্ভ করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীরা পর্যন্ত তার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হন না। স্বয়ং

পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে তিনি শিকারে যান। সারাজীবন কেবল অর্থই উপার্জন করেননি—বিলাস এবং ভোগের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু নওরঙ্গী চৌবের প্রাসাদোপম অট্টালিকা থাকা সত্ত্বেও দেড় মাইল দূরের পৈতৃক ভিটেতে থাকেন। "ওই খোলার ঘরে তাঁর বাবাও থাকতেন একসময়। সেই খাপরার বাড়িটাকে সবাই বলে 'ভিটা বাংলা'। বাড়ির লোকের সেখানে যাওয়ার হুকুম নাই।" নওরঙ্গী চৌবের বাপের আমলের বিশ্বস্ত কর্মচারী ম্যানেজার নাটোয়ার চৌধরী কেবল ভিটে বাংলায় যেতে পারে, কেউ বিনা অনুমতিতে সেখানে যেতে পারে না। এই নওরঙ্গী চৌবে অসুস্থ হয়ে ভিটে বাংলায় আছেন। ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ চৌবেজীর অতিথিশালায় দিন রাত ধরে আছে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য। জীবনের আশা খুব কম। নওরঙ্গী চৌবেজীর দানশীলতা সে অঞ্চলে প্রায় প্রবাদ বাক্যের মত হয়ে গেছে। কত রকমের প্রার্থী। একের পর এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। জরাসন্ধের চুল্লীর প্রত্নতত্ত্বীয় খননে আগ্রহশীল ঐতিহাসিক, কনৌজী ব্রাহ্মণ-কুলপঞ্জীর লেখক, কানপুরে অনাথালয়ের সেক্রেটারী, ভারতবাণীর সম্পাদক, ট্রাউজার পরা শার্টের আস্তিন গোটানো রাজনৈতিক কর্মী। সাহায্য প্রার্থীর অভাব নেই। নওরঙ্গী চৌবে কাউকেই নিরাশ করেন না, প্রয়োজনের অতিরিক্তই তিনি দান করেন। কিন্তু নওরঙ্গী চৌবে আজ থেকে সব কিছু বন্ধ করে দিতে বলেছেন। তাঁর মৃত্যুকালীন বাসনাও জানিয়ে দিয়েছেন। মারা যাওয়ার পর চন্দনকাঠে ঠাসা 'ভিটে বাংলা' সমেত যেন তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বলভদ্র উকিলকে দিয়ে : "দান খয়রাতের তহবিলে যত খরচ হয়, সেই আয়ের উপর প্রাপ্য সরকারী ট্যাক্স কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে চায়।" টাকাটা নাম না জানিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বলভদ্র উকিলের উপর অর্পণ করেছেন। কিন্তু এত টাকা কোথা থেকে আসতো এর সঠিক মীমাংসা কেউ-ই করে উঠতে পারতো না। বলভদ্র উকিল "তিনিও সঠিক জানেন না। কোনদিন একথা জিজ্ঞাসা করেন নি বন্ধুকে। শুধু এইটুকু বুঝেছেন যে দানসাগরের স্রোতের উৎসমুখ গোপনে রাখার জিনিষ।"

নওরঙ্গী চৌবের বাবাও ওই ভিটে বাংলায় থাকতেন, তাহলে কি ওই ভিটে বাংলায় গোপন কিছু আছে? বে-আইনী ব্যবসা? আর তাই কি বিবেক পরিষ্কার রাখার জন্য সরকারী ট্যাক্স সব মিটিয়ে দেওয়া। নানা প্রশ্ন

বলভদ্র উকিলের মনে আসে। কিন্তু নওরঙ্গী চৌবের মরদেহের সঙ্গে কুঠি বাংলা যখন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তখন তো আর কোন সত্য প্রকাশ পাবে না। পরিবর্তে এক কিংবদন্তীর জন্ম হবে। সেখানে নওরঙ্গী চৌবের আসল দানশীলতার আসল রহস্য কোনদিনই প্রকাশ পাবে না। সতীনাথ বিহার প্রদেশের দরিদ্র গ্রাম্য মানুষের ছবি আঁকতে যেমন সিদ্ধ হস্ত ছিলেন তেমনি নিখুঁতভাবে ভূস্বামী পরিবারের ধন-ঐশ্বর্য এবং বিলাস ব্যসনের চিত্রও অতি সংযতভাবে এবং সংক্ষেপে এঁকেছেন। মাত্র কয়েকটি কথায় নওরঙ্গী চৌবের বিলাস এবং ব্যাভিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন সতীনাথ ভাদুড়ী নওরঙ্গী চৌবের পরিচর্যার ছবিটি তুলে ধরেন: "চাঁপিয়ার চিমটিই মালিকের সবচেয়ে পছন্দ। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে ছোট ছোট চিমটি বহুকালকার অভ্যস্ত বিলাসের অভিজ্ঞতায়, নওরঙ্গী চৌবে শুধু চিমটির চাপ থেকে চোখ বুঁজে বলতে পারেন, সেবাদাসীটির বয়স আন্দাজ কত। চিমটি থামলেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাই কারো ঢুলবার উপায় নেই।" এমন সহজ এবং সংযত বর্ণনার মাধ্যমে নওরঙ্গী চৌবের চরিত্রটির নির্মোক মোচনে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই মানুষটিই কয়েক-দিনে কিংবদন্তীর দানসাগর হয়ে উঠবেন, তখন তাঁকে কেউ নওরঙ্গী চৌবে বলে মনে রাখবে না। মাত্র একটি ইঙ্গিতেই গল্পের আসল রহস্য পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়।

সতীনাথ ভাদুড়ীর অধিকাংশ ছোটগল্প বাঙ্গালী পাঠকের পরিচিত সংসার সীমানার বাইরে হওয়ার জন্য অনেক সময়ই চরিত্রগুলিকে দূরের মানুষ বলে মনে হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং সরস ভঙ্গী গ্রহণ করার জন্য অনেক চরিত্র টাইপ চরিত্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়। কিন্তু ছোটগল্প রচনায় সতীনাথের সহজাত প্রতিভা ছিল। তাই সংখ্যায় সামান্য হলেও কিছু কিছু গল্পে একদিকে যেমন মানুষের জীবনের বাস্তব ছবি এঁকেছেন অপরদিকে তেমনি তীব্র উৎকণ্ঠার সঙ্গে পাঠককে গল্পের পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন। 'পূতিগন্ধ' সতীনাথের এমনই একটি গল্প। এর গল্পবস্তু আমাদের পরিচিত সংসার সীমানায় বিস্তৃত।

নাজিরবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মৃণালিনী। অধিক বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েরা বাবা-মার সঙ্গে আলাদা হয়ে থাকে। মৃণালিনীরও অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। সতীনের ছেলে মেয়েরা

কোন সম্পর্ক রাখে না। মাসান্তে সংসার খরচের জন্য কিছু টাকা দেওয়া ছাড়া মৃণালিনীর স্বামী সংসারের সঙ্গে আর বিশেষ কোন যোগাযোগ রাখেন না। মৃণালিনীকেই সংসারের সব রকমের ঝড়-ঝাপটা সামাল দিতে হয়। মৃণালিনী বিধবা মায়ের সন্তান, কোনরকমে দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে দিয়ে তার মা নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলেও যে মানুষটির সঙ্গে মৃণালিনীর বিয়ে হয়েছিল তাকে কোনদিনই সঠিক চিনতে পারে নি। কালেক্টারের আপিসে তার স্বামী কাজ করেন, নাজিরের কাজে দু-পয়সা উপরি পাওয়া যায়, কিন্তু সে টাকা স্বামী কি করেন মৃণালিনী কোনদিনই বুঝতে পারে না। "মৃণালিনী যখন এখানে এসেছিলেন, তখন বুঝতে পারতেন না স্বামীর মুখের ওই টিঞ্চার আইডিনের মত গন্ধটা কিসের।" প্রতিদিন তার স্বামী যখন রাত্রে বাড়ী ফিরতেন তখন ঝাল নেড়ে বিস্কুট চিবানোর অভ্যাসটা লক্ষ্য করেছেন। "পরে আন্দাজে বুঝেছিলেন যে, ঝাল বিস্কুট চিবুলে জিভের সাড় ফিরে আসে, আর বোধহয় মুখের গন্ধটাও একটু কমে।" সতীনাথ ভাদুড়ী মাত্র অল্প কটি কথায় নাজিরবাবুর হতশ্রী সংসারের ছবিটি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। "জামার পকেটের উদ্বৃত্ত ঝাল বিস্কুটগুলো ছিল উপরি পাওনা মৃণালিনীর সংসারের দিক থেকে। এরই লোভে ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যারাত্রে না ঘুমিয়ে, উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করত বাবার বাড়ী ফেরবার। এই সময়-টুকুতেই তাদের মনে পড়তো বাবার কথা। বাবার কিন্তু এ সময় কারও কথা মনে রাখবার মতো অবস্থা থাকত না।"

এরকম ভাবেই মৃণালিনীর সংসার চলে আসছিল। এরপর মৃণালিনীর জীবনে চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে এল। আপিসের হিসাবপত্রে গোলমাল করায় অনেক টাকা চুরির অভিযোগে নাজিরবাবুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। এর ক-দিন আগেই মৃণালিনী গানের মাষ্টার নিতাই-এর সঙ্গে তার মেয়ে রিণির বিয়ে দিয়েছিলেন। চাকরী পাবার আশায় নিতাই নাজির-বাবুর কাছে ঘুর ঘুর করতো। বাড়ীতে পুরুষ মানুষ বলতে জামাই নিতাই। মামলা মোকদ্দমা চালানোর লোকেরও যেমন অভাব টাকা পয়সারও তেমনই অভাব। এই সময় নিতাইও তার বৌকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। মৃণালিনী চারিদিকে অন্ধকার দেখছেন। এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি কোথায় যাবেন, কিভাবেই বা মোকদ্দমা চালাবেন। সতীনাথ ভাদুড়ী সর্বত্রই ছোটগল্পের সংযমটি রক্ষা করেছেন। কোথাও বিস্তৃতভাবে চরিত্র-

বিশ্লেষণ করেন নি। অধিকাংশ ছোটগল্পে মাত্র কয়েকটি আঁচড়ে একটি চরিত্রকে সম্পূর্ণ করে তুলেছেন। গল্পের শেষের চমকটি অনেক কিছু আভাস দিয়েও তৃপ্ত করে না। ছোটগল্পের আস্বাদটুকু রেখে যায়। 'পূতিগন্ধ' তাঁর একটি সার্থক ছোটগল্প। এখানে তিনি গল্পের শেষে মাত্র একটি কথায় মৃণালিনীর স্বামীর চরিত্রটির পরিচয় দিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের অনেক পার্থক্য থাকার জন্য মৃণালিনী বারবরই স্বামীকে ভয় করে এসেছিলেন, কোনদিন কোন অভিযোগ করেন নি। কিন্তু এবার তিনি স্বামীকে দশকথা শুনিয়ে দেবেন বলেই মনস্থির করেছেন। যার জন্য তার এই দুর্গতি তাকে কোন মতেই ক্ষমা করা চলতে পারে না। এক সহৃদয় উকিলবাবু জেলখানায় মৃণালিনীর সঙ্গে তার স্বামীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু মৃণালিনী স্বামীর কাছে গিয়ে পূর্বের সংকল্পের কথা ভুলে গেলেন, কেবল অভিমান করে জানালেন তাকে বিয়ে না করলেই আজ নাজিরবাবুর এ অবস্থা হত না। সংমার উপর বিরক্ত বলেই এমন বিপদেও নিজের ছেলেও খোঁজ নিতে আসছে না। চোখ ফেটে জল আসছিল তার এই কটি কথা জানাতে কিন্তু যাকে বলা: "মৃণালিনী চোখের জলের মধ্যে দিয়ে আবছাভাবে দেখলেন, দুটি ঠোঁট নড়ল পাথরের বুড়ো শিবের।

'নিতাইকে সেদিন বলেছিলাম না, কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে যেতে।' মৃণালিনীর গা ঘিনঘিন করে উঠলো। গল্পটি এখানেই শেষ।

থানার দারোগা রামভরোসা প্রসাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে একটি শিশুহত্যার তদন্তে কিভাবে কাজে লাগালেন তাই নিয়ে রচিত 'অভিজ্ঞতা' গল্পটি। বিহারের গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে রামভরোসা প্রসাদ দারোগা হয়ে আছেন। রামভরোসা প্রসাদ সামান্য আরামপ্রিয় হলেও সৎ প্রকৃতির লোক। কখনও উৎকোচ গ্রহণ করেন না। এই খ্যাতি তার পুলিশ মহলে অনেকদিন ধরে চলে আসছিল। একুশ বছর ধরে তিনি তাঁর সততার কথা এবং সারা গ্রামে তাঁর খাতিরের কথা স্ত্রীকে শুনিয়ে আসছেন, কিন্তু এতোদিনেও দারোগা থেকে ইন্সপেক্টার কেন হতে পারলেন না স্ত্রীর এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারতেন না। সেদিনের সামান্য ঘটনায় রামভরোসার একুশ বছরের চাকুরী জীবনে কালো দাগ পড়ে গেল।

ভোখরাহা গ্রাম থেকে রাত্রে পূরণসিং-এর ছেলে থানায় এসে খবর দিল

তার বাবা জখম হয়েছে। পূরণসিং এক সময়ের কুখ্যাত দাগী আসামী, এখন চাষবাস করে।

পূরণসিং-এর নাম সব দারোগারই জানা। এখনও পূরণসিং-এর আলাপ পরিচয় চোর ডাকাতদেরই সঙ্গে। নানা গুজব তার সম্বন্ধে শোনা গেলেও খোলাখুলি কিছু বলতে লোকে ভয় পায়। এই পূরণসিং আহত হয়েছে, তারই কোন দলের লোক এ-কাজ করে থাকবে। সেই দাগী চোর বদমাসের জন্য রাতের ঘুম নষ্ট করে অন্ধকারে এগার মাইল সাইকেলে যাওয়ার কোন অর্থই রামভরোসা দারোগা খুঁজে পেলেন না। কিন্তু পরদিন সকালে গিয়ে শুনলেন পুলিশ সুপার রাত্রে খবর পেয়েই নিজেই চলে এসেছেন। তাকে দেখে সাহেব গ্রামের লোকজনদের সামনেই অপমান করলেন, আর নিজের গাড়ীতে করে সংজ্ঞাহীন পূরণসিংকে সদর হাঁস-পাতালে ভরতি করার জন্য নিয়ে গেলেন।

পূরণসিং যে পুলিশ সুপারেরই বহাল করা গুপ্তচর এ-সংবাদ তিনি পরে জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভোখরাহা গ্রামের মানুষের কাছে তার উঁচু মাথা নীচু হয়ে গিয়েছিল। সেই ভোখরাহা গ্রাম থেকেই খুনের খবর এসেছে; তাকে যেতে হবে, এবং যেতে হবে পূরণসিং-এর বাড়ীর সামনে দিয়েই। সেদিনের অপমানটা রামভরোসা প্রসাদ আজও ভুলে উঠতে পারেন নি।

এবার কাহিনী অন্যদিকে বাঁক নিল। তদন্ত করতে এসে জানতে পারলেন, সাঁওতালটুলির বিরসা মাঝি তার ঠাকুরদার আমলের কুড়ুল দিয়ে তারই তিন মাসের ছেলেকে খুন করেছেন। এই অভিযোগ বিরসার বউ-এর। বিরসার বক্তব্য তার কুড়ুলের আঘাতেই তার ছেলেটা মরেছে এটা সত্যি, কিন্তু সে ইচ্ছে করে মারে নি, হাত ফস্‌কে কুড়ুল ছিটকে গিয়ে বারান্দায় শুয়ে থাকা তিন মাসের ছেলের মাথায় লেগেছে। তাতেই ছেলেটা মরেছে। দারোগা রামভরোসা প্রসাদ জিজ্ঞাসাবাদের পর আরো জানতে পারলেন সোনাই সা নামে এক দোকানদারের সঙ্গে বিরসার স্ত্রীর অবৈধ ঘনিষ্ঠতা ছিল, সুতরাং বিরসার ছেলেটিকে খুন করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু বিরসার এক কথা, সে ইচ্ছে করে খুন করেনি। ময়নাগাছ কাটতে কাটতে হাতের কুড়ুল ছিটকে গিয়ে ছেলের মাথায় লেগেছে। সে আরও স্বীকার করলো যে, সে উত্তেজিত হয়েই গাছটা কাটছিল, গাছটার উপর তার

খুবই রাগ, কেননা সে প্রমাণ পেয়েছে, যে দিনই তার বউ এই গাছটার উপর কাপড় শুকোতে দিয়েছে সেদিনই সোনাই সা তার বাড়ী এসেছে, গাছটা তার অভিসারের গোপন ইশারা ছিল। বিরসা মাঝি একথাও স্বীকার করলো যে মাঝে মাঝে বাচ্চাটাকে খুন করার কথা তার মাথায় এসেছে, কিন্তু পরে ভেবে দেখেছে বাচ্চাটার কোন দোষ নেই। তবে এটি যে তার বংশের কলঙ্ক এ ধারণা তার আছে।

রামভরোসা দারোগা এই কেসটিকে আকস্মিক দুর্ঘটনার রিপোর্ট দেবেন কি না কিছুই ভেবে স্থির করতে পারছিলেন না, বিরসা মাঝির মনের ইচ্ছেটা আকস্মিকভাবে কি করে বাস্তবে ফলে যেতে পারে? এই চিন্তা মাথায় নিয়েই তিনি অন্ধকারের মধ্যে সাইকেল চালিয়ে থানায় ফিরছিলেন, কিন্তু রাজপুত টোলায়, যেখানে পূরণসিং-এর জন্য তাকে গ্রামের সব লোকের সামনে চরম অপমান হজম করতে হয়েছিল, ঠিক সে জায়গাতেই অন্ধকারের মধ্যে তিনি সাইকেল সমেত যার শরীরের উপর এসে পড়লেন তিনি আর কেউ নন পূরণসিং। 'বাপরে বাপ! মেরে ফেলল রে!' পূরণসিং পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠলো।

শেষ কটি লাইনে লেখক গল্পের আসল চমকটি দিয়েছেন: "কী করে এ জিনিস সম্ভব হল? সেই কুড়ুলখানার মতো তাঁর সাইকেলখানাও কি মনিবের মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করল নাকি? কে জানে। ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।"

অনেক রাত্রিতে যখন রামভরোসা দারোগা বাড়ি ফিরলেন, তখন তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে, বিরসা মাঝির কেসটিতে আকস্মিক দুর্ঘটনার রিপোর্ট দেবেন। এই গল্পটিতে রয়েছে আগাগোড়া নাটকীয় চমক, যার অসাধারণত্ব আমাদের সাহিত্য-রসতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করে। অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে পাঠক সচকিত হয়ে উঠে। সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পগুলি কখনই পাঠককে ঝিমিয়ে পড়তে দেয় না, পাঠকের বুদ্ধির দরজায় এসে অনবরত আঘাত করে। হৃদয়াবেগের সঙ্গে মননশীলতার এমন মিশ্রণ বাংলা ছোটগল্পে খুব সুলভ নয়।

'অভিজ্ঞতা' গল্পটিতে লেখক দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণীর এক দম্পতির রিরংসা, হিংসা এবং সন্দেহের বন্য আদিমতার ছবি তদন্তকারী দারোগার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিবৃত করেছেন। আকস্মিকভাবে পিতার হাতে তিন মাসের শিশু-

পুত্রের খুন হওয়াটাও সেখানে ট্রাজিডির বিষয় হয়ে উঠেনি ; কেননা, সন্তানই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহের বীজ উপ্ত করে ছিল। সতীনাথ ভাদুড়ী সুকৌশলে বীভৎস ঘটনাটি থেকে পাঠকের মনকে অন্যত্র সরিয়ে রেখেছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং ছোটগল্পের আঙ্গিক রচনায় সতীনাথ ভাদুড়ী বাংলা ছোটগল্পের প্রচলিত আধুনিক রীতিটি গ্রহণ করেননি। তিনি বিশ্লেষণধর্মিতা অপেক্ষা বিবরণধর্মিতার উপরই অধিক নির্ভর করেছেন। তিনি বক্তব্য পরিস্ফুটনের জন্য কোথাও রূপক বা প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেননি ; কিন্তু আশ্চর্য শিল্প-সুষমায় কতকগুলি গল্পের এমন ইঙ্গিতধর্মী নামকরণ করেছেন যাতে তাঁর সাহিত্য-রসবোধের সঙ্গে চিন্তাশক্তির অনন্যতা সংযুক্ত হয়ে সতীনাথের প্রতিভা-বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করেছে। 'ধস' গল্পটি সতীনাথ ভাদুড়ীর এমনই একটি রচনা। এমন সার্থকনামা ছোটগল্প সচরাচর চোখে পড়ে না।

এই গল্পটিতেও সতীনাথ বিহারের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ভুক্ত এক দম্পতির চরম বিপর্যয়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পরসাদীর স্ত্রী মনচনিয়া কোনদিন মাতৃত্বের স্বাদ পাবে না এ-ধারণাই এতদিন সকলের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। সে নিজেও তার দেহের বেঢপ গড়নের জন্য সব সময়ই কুণ্ঠিত থাকতো। মন-চনিয়ার চার বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, বিয়ের পনের বছর পর তার দ্বিরাগমন হয়, তারপর থেকে সে পরসাদীর সঙ্গেই আছে। বাপের বাড়ী থেকে শেষবারে আসবার সময় একটা কুকুর তার সঙ্গে আপনা থেকেই চলে আসে, কুকুরটার রঙ কালো বলে আদর করে কুকুরটার নাম কারিয়া রেখেছিল। পরসাদী, কারিয়া আর সে নিজে এই নিয়েই মনচনিয়ার সংসার। অনেক তুকতাক মাদুলি মানত ওষুধ-বিষুধ করেও মনচনিয়ার দীর্ঘকাল কোন সন্তান হল না। মনচনিয়া নিজেও যখন আশা ছেড়ে দিয়েছিল এমন সময় তাদের দুঃখের সংসারে আনন্দ সংবাদ এল—মনচনিয়া মা হতে চলেছে। পরসাদীও খুব খুশী হয়েছিল। "কী করবে ভেবে পায়না মনচনিয়াকে নিয়ে। কত জিজ্ঞাসা। কী খেতে ভালো লাগে? ছেলে হবে না মেয়ে হবে? কার মতো দেখতে হবে" ইত্যাদি নানা জল্পনা-কল্পনা চামারণীর সঙ্গে করতেন। কিন্তু পরসাদীর এ আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না, মাত্র সতের দিনের মাথায় নবজাত শিশুটি মায়ের দুগ্ধাধারের নীচে চাপা পড়ে দমবন্ধ হয়ে মারা গেল। মনচনিয়ার কেবল সন্তান হারানোর দুঃখই নয়, এ এমন এক দুঃখ যা কারো কাছে প্রকাশ করেও মনটাকে একটু হালকা করা যায় না, এখানে

তার কলঙ্ক আর লজ্জা মিশে আছে। মনচনিয়ার স্বামী পরসাদী এটা বুঝতে পারে, প্রতিবেশীর সকৌতুক দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখার জন্য মনচনিয়াকে কিছুদিন বাড়ীর বাইরে যেতে নিষেধ করে। মনচনিয়ার ঘরে একা একা সময় কাটে না, তাই পরসাদী একদিন একটা বাচ্চা কুকুর নিয়ে এসে মনচনিয়াকে দেয়। তাদের আগের কুকুর কারিয়ার অনেক বার বাচ্চা হয়েছিল কিন্তু তখন মনচনিয়ার একাকীত্বের অভাবটুকু পরসাদী বুঝতে পারতো না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে মনচনিয়া কারিয়ার মধ্যে একটা অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। বুড়ী কারিয়া বাচ্চা কুকুরটিকে পেয়ে যেন আবার নতুন করে মা হয়ে উঠেছে। বাচ্চা কুকুরটা পরম নিশ্চিন্তে কারিয়ার বুকের দুধ খাবার চেষ্টা করে।

একদিন মনচনিয়া কুকুরের বাচ্চাটাকে খাওয়াবার জন্য কারিয়ার কোল থেকে তাকে আনতে গেলে "ক্ষেপে বেরিয়ে এল কারিয়া। চেনা কারিয়া নয়; এ একেবারে অন্য মূর্তি। ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝবার আগেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে। আঁচড়ে, কামড়ে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায় মনচনিয়াকে।"

"ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর উপর রুখে…আড়াল করে দাঁড়িয়েছে বাচ্চাটাকে বুক দিয়ে পৃথিবীর বিপদ থেকে—শিশু হত্যার হাত থেকে।"[২]

মূলতঃ ব্যঙ্গ গল্প লেখক হিসাবে সতীনাথ ভাদুড়ী অধিক পরিচিত হলেও তিনি যে গম্ভীর রসাত্মক গল্প রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁর 'ধস' গল্পটি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। 'মহিলা-ইনচার্জ' গল্পটি 'ধস' জাতীয় গল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী রচনা। আজীবন প্রবাসে বাসের জন্য কাহিনীর পাত্রপাত্রী নির্বাচনে তাঁর দৃষ্টি যেমন সুদূর প্রসারিত ছিল তেমনি কাহিনীবস্তু নির্বাচনে তাঁর প্রতিভাও বহুমুখী ছিল। ব্যক্তি চরিত্রের ভ্রান্তি এবং গরমিলের উপর ভিত্তি করে তিনি সরস কাহিনী রচনা করতে পারতেন। কিন্তু এই শ্রেণীর গল্পগুলির একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, আপাত লঘু বলে প্রতীয়মান হলেও গল্পের চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। এই কারণেই ব্যঙ্গরসাত্মক গল্পগুলির জন্য তাঁকে কেবল ব্যঙ্গ শিল্পী বলে চিহ্নিত করা যায় না।

'মহিলা-ইন-চার্জ' গল্পটিতে এমন একটি মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় যার মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে এক সহজাত প্রতিভা ছিল, অথচ

নিজের স্ত্রীর মন সে পায়নি কোনদিন। লেখকের সঙ্গে নাটোয়ারলালের পরিচয় রাজনীতি করার সুবাদে। উভয়েই একই রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিল। গ্রামের সাধারণ স্তরের যে কোন মহিলার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা করার এক অসাধারণ ক্ষমতা নাটোয়ারলালের ছিল। তার এমন একটি গুণ ছিল যার জন্য স্ত্রীলোকেরা তাকে ভালোবাসতো এবং তার সঙ্গে নিঃসংকোচ ব্যবহার করতো। নাটোয়ারলাল নিজে লেখাপড়া শেখেনি, গরিব চাষীমজুর পরিবারের মধ্যেই তার গতিবিধি ছিল। কিন্তু এই সমস্ত গরিব সাধারণ স্তরের মেয়েরা বিনা পয়সায় কেবল নাটোয়ারলালের সঙ্গে কথা বলার লোভে আপিসের নানা টুকিটাকি কাজ করে দিত। সে সময় রাজনীতিতে মহিলাকর্মী বিশেষ পাওয়া যেত না, কিন্তু গরীব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নানা ধরণের স্ত্রীলোকঘটিত বিরোধ সমাধানের জন্য পার্টি অপিসে আসতো। নাটোয়ারলালের সঙ্গে বহু লোকের পরিচয় থাকার জন্য এই বিরোধগুলি সালিসীর জন্য তার কাছেই সবাই আসতো। এই কারণেই একদিন সবাই মিলে নাটোয়ারলালকে স্থানীয় পার্টির মহিলা বিভাগেব ইন-চার্জ করে দেওয়া হোলো। কোন অসামাজিক কার্যকলাপ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ ইত্যাদি বিষয়গুলি মীমাংসার জন্য নাটোয়ারলালের ডাক পড়তো। কিন্তু নাটোয়ারলাল নিজে যেত না, তাদের আপিসে ডেকে আনানো হত। মহিলা-ইন-চার্জ নাটোয়ারলাল নিজের পদ্ধতিতে এগুলির মীমাংসা করে দিত। দ্বারভাঙ্গা থেকে নতুন আসা এক মিস্ত্রী এবং তার বিয়ে না করা এক বৌকে এই কারণেই একদিন তার আপিসে নিয়ে আসা হল। তার অপরাধ সে মেয়েমানুষ নিয়ে থাকে, "সামাজিক নিয়ম মানে না, পাড়ার আদব কায়দা জানে না, বললেও গায়ে মাখে না।" এদের তো নাটোয়ারলালের আপিসে আসতেই হবে। কিন্তু ফল হল উলটো, মেয়েটির কথা থেকে জানতে পারা গেল ; নাটোয়ারলালই তার স্বামী এবং নাটোয়ারলাল তার বিয়ে করা বৌ-এর কাছে সাত বছরের মধ্যে একদিনও যায়নি। এর পর নাটোয়ারলাল সেখানে থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, দীর্ঘ একুশ বছর পর লেখকের সঙ্গে আবার দেখা, চা বাগানের সাঁওতাল রমণী পরিবৃতা নাটোয়ারলাল ট্রেনে করে কোথায় চলেছে। সাঁওতাল কামিনদের মাঝে বসে আছে। তারাও সহজভাবে নাটোয়ারলালের সঙ্গে রসিকতা করছে, একুশ বছর পরে কোনো পরিবর্তনই দেখা যাচ্ছে না। একথা সে কথা জিজ্ঞেস

করার পর তার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করাতেই নাটোয়ারলাল সেখানে থেকে সরে পড়লো। "জন কয়েক সাঁওতালনী কাঁদছে। পৃথিবী সুদ্ধ মেয়েরা যার জন্য কাঁদে, সে নিজের স্ত্রীর মন পেল না কেন জানিনা। সাঁওতাল পুরুষরা আশ্বাস দিচ্ছে ক্রন্দনরতা মেয়েদের।" পাঠকের কল্পনার জন্য আসল কারণটা লেখক অস্পষ্ট করে রাখেন। নাটোয়ারলালের জীবনের ট্রাজিডিটা কোথায় এই অদম্য কৌতূহল নিয়ে গল্পটি শেষ হয়।

সতীনাথ ভাদুড়ী বাংলা দেশের প্রেক্ষাপটে খুব বেশী ছোটগল্প রচনা করেন নি। তাঁর অধিকাংশ গল্পই বিহার প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীদের নিয়ে অথবা সেই প্রদেশেরই মানুষজনকে নিয়ে রচিত। 'কৃষ্ণকলি' তার ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের এবং বাঙ্গালী জীবন নিয়ে গল্পটির আখ্যানবস্তু গড়ে উঠেছে। বাঙ্গালী জীবনের একটি গুরুতর সমস্যাকে কেন্দ্র করে তিনি লঘু চালে গল্পটি রচনা করলেও লেখকের দরদী মনটি কিন্তু আচ্ছাদিত থাকেনি। সুরথবাবু এবং তাঁর অবিবাহিত যুবতী মেয়ে কেয়াকে নিয়ে এই গল্পটি গড়ে উঠেছে। সুরথবাবু কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে নৈহাটিতে বসবাস করেন। পেশায় তিনি ব্যবহারজীবী। কয়েকবছর পূর্বে সুরথবাবুর স্ত্রী মারা যান। তারপর থেকে রেখাই সংসারের সব দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছে। সুরথবাবু জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁর মনে একটি দুঃখ আছে। তিনি তাঁর মেয়ে রেখার বিবাহ দিতে পারেন নি। অর্থনৈতিক কারণে যে রেখার বিবাহ হয়নি তা নয়, আসলে তার কন্যা শিক্ষিতা এবং স্বাস্থ্যবতী হলেও যথেষ্ট সুন্দরী নয়, এই কারণেই পাত্র পক্ষের অপছন্দে তাঁর মেয়ের বিবাহ আটকে গেছে। সুরথবাবুর স্ত্রী যখন জীবিত ছিলেন সে সময় এক পাত্রপক্ষ রেখাকে পছন্দ করেছিল, কিন্তু দান সামগ্রী এবং যৌতুক-এর পরিমাণ নিয়ে তারা এমন ব্যবহার করলো যার জন্য সুরথবাবুর স্ত্রী বেঁকে বসলেন। তাঁর ধারণা এ বাড়ীতে রেখার বিয়ে হলে সুখী হবে না। রেখার বিয়ে ভেঙ্গে গেল। সুরথবাবুর স্ত্রী মারা গেলেন। এরপর থেকে সুরথবাবু তাঁর মেয়েকে নিয়েই থাকেন। পিতাপুত্রীর সংসার সুখেরই ছিল, কিন্তু মেয়েকে বিয়ে দিতে না পারার জন্য সুরথবাবু নিজেকে অপরাধী মনে করতেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্য ছদ্মনামে একটি পুস্তক রচনা করলেন। পুস্তকের নাম কুরূপা মেয়ে ও সমাজ। মেয়েকে বইটির কথা জানতে দিলেন না, কিন্তু রেখা সবই খোঁজ নিয়ে জানলো। সুরথবাবু পত্রিকাতে তাঁর গ্রন্থ সমালোচনা

অংশটি রেখার কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চাইছিলেন। সুরথবাবু বন্ধুর সঙ্গে এরোড্রামে গিয়েছিলেন কোন একটি কাজে, সেখানে দেখলেন দানসামগ্রী এবং যৌতুকের অন্যায় দাবীর জন্য তিনি যার সঙ্গে রেখার বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন সেই ছেলেটিই উচ্চ শিক্ষার্থে আমেরিকা যাচ্ছে, রেখার থেকেও কালো একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। মেয়েটিকে দেখে খুব সুখী বলেই মনে হল। সুরথবাবুর খুব অনুশোচনা হল। এই ছেলেটিই রেখার স্বামী হতে পারতো। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী একদিন রেখার ভালোমন্দের থেকে নিজেদের আত্মসম্মানকে বড় করে দেখেছিলেন। এই ছেলেটির আমেরিকা যাওয়ার সংবাদটি দৈনিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। রেখার নজরে সংবাদটি আসে। রেখা পত্রিকাটি তার বাবার থেকে আড়াল করতে চায়। পিতা-পুত্রীর এক অভিনব মনস্তত্ত্ব সতীনাথ ভাদুড়ী অত্যন্ত সহজভাবে গল্পটিতে বিশ্লেষণ করেছেন। কন্যার ভবিষ্যতের জন্য পিতার উদ্বেগ এবং পিতার ভালোমন্দের জন্য কন্যার উৎকণ্ঠা এই সুপরিচিত পারিবারিক রসটি সতীনাথ ভিন্ন আধারে পরিবেশন করেছেন। সতীনাথের সমকালীন অন্যান্য অধিকাংশ ছোটগল্পকার যখন নগর জীবনের পূতিগন্ধময় পরিবেশ এবং যুগযন্ত্রণা বিশ্লেষণে মত্ত সেই সময়ে সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পগুলি এক অনালোচিত জীবনের রহস্যের সন্ধান নিয়ে আসে।

বাংলা আধুনিক ছোটগল্পের একটি বিশেষত্ব হল, বাইরের ঘটনাকে অনেকাংশে পরিত্যাগ করে থাকা। আধুনিক লেখকেরা সহজ বিবৃতির পথে না গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তির্যক ভাষণে এবং সঙ্কেত ও ইঙ্গিতের সাহায্যে গল্পের বিষয়বস্তুকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন ; এই বিশেষ প্রবণতা আধুনিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সতীনাথ উপন্যাস রচনার সময় আধুনিক এই রীতিটি গ্রহণ করলেও ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে প্রচলিত বিবৃতি-ধর্মী পথটিই অনুসরণ করেছেন। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর এবং গল্পকার তারাশঙ্করের মধ্যে এই ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না। তারাশঙ্করের ছোটগল্প-গুলো প্রধানত দীর্ঘ এবং বিবরণধর্মী। তারাশঙ্করের গল্প এবং উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। গল্পগুলোর মধ্যে ঘটনা বিন্যাসের এত অবকাশ থাকে যার থেকে সহজেই গল্পগুলো উপন্যাসের পর্যায়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু সতীনাথ ঠিক এর বিপরীতধর্মী লেখক ছিলেন, তিনি ছোটগল্প এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নরীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'জলভ্রমি' গল্পটি

আধুনিকতা গুণ-সম্পন্ন একটি বিশিষ্ট রচনা। এখানে সতীনাথ এক অসহায় বৃদ্ধ মুসলমানের বার্ধক্যকালীন মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন।

হাসান্থ 'শীর্ষাবাদিয়া' নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর হাবসী সৈন্যের বংশধর। নবাবী যাওয়ার পর লাঙল ধরে, আর পান্তাভাত খেলেও রক্তের গরম তাই থেকেই গেছে। "কথায় কথায় হেঁসো দা দিয়ে লোকের গলা কাটতে চায়। গঙ্গার বুকে চড়া পড়লেই এরা হানা দেয়।" পঞ্চাশ বছর আগে হাসান্থ গঙ্গার চর ছেড়ে ছোট নদীর ধারে চলে এসেছে।

কিন্তু হাসান্থ এখানকার পরিবেশকে মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। এখানকার মানুষ গঙ্গা দেখেনি সামান্য নালাকেই নদী বলে। এখন ভাদর মাসে নালাটা অন্যবারের চেয়ে একটু বেশী ভরে উঠেছে, তাইতেই এখানকার লোকের কি তড়পানি। ভরা দুপুরেও ব্যাঙ ডাকছে নালার ধারে। এই নালার ধারের লোকের কলেজা আর কতটুকু হবে। বড় জল আর ছোট জল। বড় জলের লোকেরা সামনা সামনি লড়াই করে, ছোট জলের ছিচকেরা চিমটি কাটে পিছন থেকে। হাসান্থ বড় জলের লোক, কিন্তু ছেলে রহিম ছোট জলের লোক হয়েছে। বাপের আপত্তি সত্ত্বেও সে এখানকার মেয়ে বিয়ে করেছে। হাসান্থর সে তেজও নেই সে বয়সও নেই। পুত্র-পুত্রবধূর বেয়াদবি তাকে সহ্য করতে হয়। তাদেরই অনুগ্রহে সে আজ বেঁচে আছে। কিন্তু একদিন এই নালাতেই বান ডাকলো। আস্তে আস্তে নীচুজমি সব জলে ডুবে গেল। গ্রামের মধ্যে উঁচু জায়গা বলতে দুটো টিলা। এক টিলার উপর মসজিদ আর এক টিলার উপর টিথরিয়া পীরের নেকড়া বাঁধার গাছ। গ্রামের সকলে ওই উঁচু জায়গা দুটোয় আশ্রয় নিয়েছে। হাসান্থ মসজিদে আশ্রয় নেবার সময় হেঁসো আর লাঠিটা সঙ্গে নিয়ে নেয়। ছেলের বউকে সে বিশ্বাস করে না। আর মনে নানা সন্দেহ উঁকি দেয়। বড় হালকা স্বভাব রহিমের বউটার। যত ভাবে তত মাথা গরম হয়ে উঠে। পরিবারের ইজ্জতের প্রশ্ন। চারদিকে বন্যার জল দেখে, তার গঙ্গার বানের কথা মনে পড়ে। হারিয়ে যাওয়া শান্তি আবার ফিরে পায়। ঝিমিয়ে পড়া হাবসীর রক্ত আবার চঞ্চল হয়ে উঠে। পরিবারের ইজ্জত বাঁচাতেই হবে। ছেলের বউ-এর ব্যভিচার সহ্য করবে না। প্রকৃতির আদিম ভয়ংকর রূপান্তরের সঙ্গে হাসান্থও আদিম হয়ে উঠে।

"মসজিদের সিঁড়িতে নতুন করে ধার দিয়ে হেঁসোর ফালাটার উপর একবার

বুড়ো আঙুল বুলিয়ে নিল হাসামু।" প্রকৃতির এই দুর্যোগের সুযোগে সে তার বিপথগামী পুত্রবধূকে শিক্ষা দিয়ে পারিবারিক মানসম্ভ্রমকে বাঁচাবে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের বিশেষত্ব হল কাহিনীর চরম মুহূর্তে পাঠক যখন ভয়ংকর পরিণতির সম্মুখীন হয় সেই মুহূর্তেই কাহিনীর ঘটনা অদ্ভুতভাবে শিল্পসম্মত হয়ে যায়। এই গল্পটিতেও পাঠক যখন অধীর আগ্রহে হাসামুর বিপথগামী পুত্রবধূর করুণ পরিণতির জন্য অপেক্ষমান ঠিক তখনই জানা যায় হাসামুর পুত্রবধূর উপর সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। "ছেলে-বউয়ের জেরার উত্তরে, এই রাত্রিতে 'চিথরিয়া পীরে' আসিবার একটা কারণ হাসামুকে খুঁজে বার করতেই হল।" মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হাসামুকে বলতে হল তাদেরই কল্যাণের জন্য সে পীরের গাছে নেকড়া বাঁধতে এসেছে। সংখ্যায় অল্প হলেও সতীনাথের গল্পের পরিধি বহু বিস্তৃত। একটি নিম্নবিত্তের মুসলমান পরিবারের জীবন বাস্তবানুগ ভাবে বর্ণনা করেছেন।

সতীনাথ ভাদুড়ী গল্পের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য সন্ধানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ছবি এঁকেছেন, সমাজের অসঙ্গতি বিশেষ করে, রাজনীতিবিদ্‌দের দেশসেবার নামে ভণ্ডামিকে তিনি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। 'চরণদাস এম. এল. এ.' এমনই একটি গল্প। অবশ্য 'চরণদাস এম. এল. এ.'কে ছোটগল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নক্‌সা বলাই অধিকতর সঙ্গত।

'চরণদাস এম. এল. এ.' পার্টির নির্দেশে দীর্ঘকাল পর তার পুরোনো কর্মকেন্দ্র নিজের গ্রামে ফিরে এসেছেন। এম. এল. এ., হওয়ার পর থেকে তিনি বড় একটা গ্রামে আসতে পারেন না। দেশের বাড়ী ভাড়া দিয়ে রাজধানীতেই পরিবারকে নিয়ে গেছেন। কিন্তু এবার পার্টির হাইকমাণ্ডের নির্দেশানুযায়ী ভোটারদের সঙ্গে জনসংযোগ রাখবার জন্য তাঁকে পুরোনো গ্রামে আসতে হয়েছে। তিনি সাধারণভাবে এসেছেন। কোনো সরকারী অতিথিশালায় না উঠে পার্টির অপিসেই উঠেছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে গেলে এবং তাদের ভোট পেতে গেলে তাদেরই একজন হতে হয়। দীর্ঘকাল রাজনীতি করা চরণদাসের এ ধারণা আছে। কিন্তু এবারে নিজ গ্রামে এসে একটু হতাশ হলেন। আগের যারা চেনা পরিচিত লোক, তারা তাঁকে কেউ চিনতেই চাইছে না; পার্টির কর্মচারীরাও ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে। তিনি যে এখানকারই একজন একথা যেন কোন লোক বুঝতে চাইছে না।

সরকারী লোক গণনার কাজে নিযুক্ত কর্মচারী মৌলভী সাহেব তো এমন ব্যবহার করলেন যাতে এম. এল. এ. নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে আস্তিন গুটিয়ে প্রায় মারামারি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু,সহকর্মীদের সময়মত হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা চাপা পড়ে।

জনসাধারণের.[ভোটার ?] সঙ্গে তার সম্পর্ক যে প্রায় ছিন্ন হয়ে গেছে এ-ধারণা চরণদাস এম. এল. এ.-র হয়েছে। কি করে পুরোণো জনপ্রিয়তাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায়, এই নিয়ে সহকর্মীদের মধ্যে আলোচনা চলে এবং শেষ পর্যন্ত একটা সূত্র আবিষ্কৃত হয়।

শ্রীসহস্রানন্দ স্বামীজি বছর তিনেক আগে এখানে এসে আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁর কথা চরণদাস এম. এল এ. জানতেন না। স্বামীজিই এই অঞ্চলের সব থেকে প্রভাবশালী ব্যক্তি। সকলেই স্বামীজি বলতে অজ্ঞান। তিনি মানুষ নন, তিনি দেবতা। অতএব স্থির হয় স্বামীজিরই শরণাপন্ন হতে হবে। সহকর্মী নিয়ে চরণদাস গুরুজীর আশ্রমে উপস্থিত হয়ে গুরুজীর জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেন। চরণদাস যেন অনুভব করেন সাধারণ লোক এখন আর তাঁকে ততটা উপেক্ষা করছে না। চরণদাস এম. এল. এ. কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। ভক্তমণ্ডলী তাঁকে যেন কিছু বলতে চাইছে। তিনিই যেন তাদের কোন বড় বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। পরে ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারলেন। মৌলভী সাহেব সরকারী লোক গণনার কাজে আশ্রমেও লোক গণনা করতে এসে স্বামীজির নামটাও সাধারণ মানুষের তালিকায় ঢুকে নিয়েছেন। স্বামীজি সাক্ষাৎ দেবতা, তিনি কি মানুষদের সঙ্গে এক তালিকায় থাকতে পারেন। চরণদাস এম. এল. এ. তাঁর হৃত জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের একটা সুযোগ পান। তিনি ভক্তদের প্রতিশ্রুতি দেন, লোক গণনার তালিকা থেকে স্বামীজির নাম বাতিল করিয়ে, তিনি স্বামীজিকে আবার দেবতার পৃথক আসনে বসাইবেন।

'চরণদাস এম. এল. এ.'-কে ছোটগল্প বলা চলে না, একথা আগেই আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী স্বভাবসিদ্ধ ভাবে সামাজিক অসঙ্গতিগুলোকে সরসতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সাধারণ ভক্ত সমাজ তাদের গুরুদেবকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু লোক গণনার তালিকায় গুরুজীর নাম থাকলে তো তাঁর দেবত্ব থাকে না। তাই মৌলভী সাহেবের তালিকা থেকে গুরুজীর নামটা বাদ দিতেই গুরুজী দেবত্ব

ফিরে পান। এই ধরণের অদ্ভুত পরিবেশে মধ্যে এক রাজনীতিবিদ তাঁর হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পাবার সুযোগ পান। সতীনাথের কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই ধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন।

ছোটগল্প হিসাবে 'চরণদাস এম. এল. এ.' সার্থক না হলেও ব্যঙ্গাত্মক রচনা রূপে গল্পটি উপভোগ্য।

সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর ছোটগল্পে কিছু কিছু অপরাধী চরিত্রের পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু অপরাধমূলক কাহিনী রচনা করেন নি। 'দাম্পত্য সীমান্তে' এমনই একটি ছোটগল্প। পোষ্টমাষ্টার নিবারণের সঙ্গে অসীমার বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু মানুষ হিসাবে নিবারণ যে এত হীন, এ-ধারণা অসীমার প্রথমে ছিল না। ছোটবেলায় অসীমাকে তাঁর ঠাকুমা ঠাট্টা করে বলতেন তোর সঙ্গে এমন বরের বিয়ে দেব যে, সে রাতে মদ খেয়ে এসে তাকে লাঠি পেটা করবে। অসীমা তার উত্তরে বলতো ইস্ ঝাঁটা মেরে তাকে বাড়ী থেকে বার করে দেব না। কিন্তু ঠাকুমার ছোট্ট বেলার ঠাট্টা এমন নিষ্ঠুর ভাবে তার জীবনে যে ফিরে আসবে, এ-ধারণা অসীমা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। বিয়ের পরই অসীমা তার স্বামীর নেশা করার কথা জানতে পেরেছিল।

বিয়ের পর সাত বছর কেটে গেছে অসীমা এরই মধ্যে তার স্বামীর আরও অনেক দুষ্কর্মের কথা জানতে পেরেছে। কেবল নেশাই করে না—তার স্বামী নিবারণ গাঁজা-আফিঙের চোরাই কারবারও করেন। এই কারণেই নিবারণ অনেক চেষ্টা-তদ্বির করে আজবপুর পোষ্টাফিসে বদলি হয়েছিল। আজবপুর এমন জায়গা যার অর্ধেক অংশ নেপালে। সীমান্তের এই ছোট্ট শহরে অসীমা তার ছেলেকে নিয়ে থাকে। স্বামী তাকে ভালোবাসে না, নারী হিসাবে এ তার পক্ষে চরম অপমানকর, কিন্তু এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কোন উপায়ও তার জানা নেই। তার মা-বাবা যেমন লোকের হাতে সঁপে দিয়েছেন—ভাগ্য বলে তাকে মেনে নিতে হয়েছে। নিবারণ স্থানীয় উপরওয়ালাদের নানা রকম উৎকোচ দিয়ে হাত করে রেখেছিল, তার স্ত্রী অসীমাকে দিয়েও সরকারী বড় অফিসারদের আদর আপ্যায়ন করিয়েছে। স্বামীর চরিত্র সম্পর্কে তার জানার আর কিছুই বাকী নেই। দুশ্চরিত্র স্বামীর জন্য অসীমার মনে যত না দুঃখ, তার থেকেও বেশী দুঃখ স্ত্রী হিসাবে সে

স্বামীর মনে কোন স্থান করে নিতে পারেনি, মেয়ে হিসাবে এর থেকে লজ্জার কি আর থাক্‌তে পারে? অসীমা তার দুঃখের কথা জানাতো স্থানীয় মালবাবুর ভাই সমীরের কাছে। সমীর অসীমাকে বৌদি বলে সম্বোধন করতো। অসীমার স্বামী যখন নেশায় বুঁদ হয়ে অনেক রাতেও বাড়ী ফিরতো না তখন অসীমা সমীরের কাছে তার দুঃখের কথা বলে মনের ভাব কিছুটা লাঘব করতো।

এক রাত্রে একটা গোপন পার্শেল দিতে এসে নেপালী পিয়ন বীরবাহাদুর তার মাষ্টার সাহেবের স্ত্রীকে পোষ্টাফিসের ঘরে বসে সমীরের সঙ্গে গল্প করতে দেখে, তাতে সে পার্শেলটা তখন না দিয়েই ফিরে যায়।

পরদিন ভোরবেলায় পার্শেলটা দিতে এসে পিয়নটা গতকাল রাত্রের কথা অসীমাকে বলে যে, মাষ্টারবাবু অত্যন্ত রেগে গিয়ে ভোজালী দিয়ে মালবাবুর ভাইকে খুন করবে বলছিল। নেপালী পিয়ন বীরবাহাদুরের মুখে এ কথা শুনে "শিহরণ খেলে গেল অসীমার সারা দেহে। বহু আকাঙ্ক্ষিত অথচ অনাস্বাদিত একটা স্বাদ সে পাচ্ছে। খুব ভাল লাগছে শুনতে। ও থামল কেন। আরও বলুক।" স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার জীবন্ত ভালাবাসাই প্রমাণ করে এ বিশ্বাস নারী হিসাবে অসীমার আছে। তাই সে তাদের এতদিনের নিরুত্তাপ সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা অনুভব করে পুলকিত হয়। সতীনাথ ভাদুড়ী এই অপরাধ কাহিনীর মধ্যেও নারী চরিত্রের একটি বিশেষ স্বরূপ প্রকাশ করেছে। কিন্তু কাহিনীর চরম মুহূর্তে যখন পুলিশ সমীর সহ তার স্বামীকেও গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় তখন সে বুঝতে পারে এতক্ষণ যে আকাঙ্ক্ষিত এবং অনাস্বাদিত বিষয়ের স্বাদ সে পেয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এটা তার নবতম কৌশলমাত্র। সমীরকে দোষী সাব্যস্ত করে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় তার স্বামী স্ত্রীকেই কলঙ্কের অপবাদ দিতে চাইছে। ছোটগল্প হিসাবে 'দাম্পত্য সীমান্তে' খুব সার্থক না হলেও নারী মনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে সার্থক হয়েছে।

'পূতিগন্ধ' নামে অপর একটি গল্পেও স্বামী-স্ত্রীর অনুরূপ সম্পর্ক দেখানো হয়েছিল। গল্পদুটিতেই প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলি সম্পূর্ণতা লাভ করে নি, কিন্তু নারী চরিত্রগুলি বাস্তবনিষ্ট হয়েছে।

ছোটগল্প হিসাবে 'দুই অপরাধী' গল্পটি সতীনাথ ভাদুড়ীর অন্যতম

অসার্থক গল্প। গল্পটির প্রধান ত্রুটি, অবিন্যস্ত কাহিনী, যার থেকে গল্পের পাত্রপাত্রীদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা করে নেওয়া যায় না। তিনটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে লেখক একসূত্রে বাঁধতে গিয়ে কাহিনীর মূলই হারিয়ে ফেলেছেন। ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে একমুখীনতা, এই গল্পটিতে তারই অভাব পরিলক্ষিত হয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার মান-অভিমানকে কেন্দ্র করে কাহিনীটির আরম্ভ। শনিবার রাত্রে অমলেশ তাসের আড্ডা থেকে রাত্রি করে বাড়ী ফেরাতে স্ত্রী গীতা ক্ষুব্ধ হয় হয়। ছুটির আগের দিন অমলেশ বন্ধুদের সঙ্গে একটু বেশীক্ষণ গল্প করার মধ্যে কি অপরাধ থাকতে পারে তা সে বুঝে উঠতে পারে না। স্ত্রীর এ-ধরণের আচরণে তার মনের অভিমান জাগে। পরের দিন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অমলেশ উদ্দেশ্যহীন ভাবে দক্ষিণেশ্বরে চলে যায়। নানা লোকজনের আসা-যাওয়া লক্ষ্য করে মনের গ্লানি কাটাতে চেষ্টা করে। হঠাৎ তার মনে হয় অনেক সময় পার হয়ে গেছে; তাই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার চিন্তা মাথায় নিয়ে আগুয়ান একটা ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে যায়।

ট্যাক্সি থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের এক সুবেশা সুশ্রী সধবা মহিলা নেমে আসেন। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ থাকলেও চোখে মুখে কেমন করুণ ভাব অমলেশ লক্ষ্য করে। মহিলা কোনদিকে না তাকিয়ে হাতের মুঠোয় ভাঁজ করা নোটখানা ট্যাক্সির ড্রাইভারকে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, ড্রাইভার তার ভাড়া কেটে নিয়ে বাকী টাকা মহিলাটিকে ফেরৎ দেয়। অমলেশ লক্ষ্য করে মিটারে যত ভাড়া উঠেছে, ড্রাইভার ভুল করে মহিলার কাছ থেকে তার চেয়ে কম ভাড়া নিয়েছে।

ট্যাক্সিতে বসে ট্যাক্সিচালকের কাছ থেকে অমলেশ জানতে পারে, কোন এক হাসপাতালের গেটের সামনে থেকে মহিলা ট্যাক্সি ভাড়া করে শ্যামবাজারের ঠিকানায় এক প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে গেলেন, কিন্তু সদর দরজা দিয়ে আর ভেতরে যেতে পারলেন না, সামান্য কথাবার্তায় ট্যাক্সি চালকের ধারণা হল বাড়ীর লোক মহিলাটিকে ঘরে যেতে দিতে চান না, মহিলা 'রাণী' আর 'খোকা'কে একবার দেখবেন বলে ঘরে যেতে চাইলেন, কিন্তু বাড়ীর লোক তাতেও রাজী হল না। এরপর মহিলা বরাহনগরে আর একটি বড় বাড়ীতে এলেন, সেখানে দরজার কাছেই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন; তিনিও মহিলার আগমনে অসন্তুষ্টই হলেন। সেখান থেকে সোজা দক্ষিণেশ্বরের

মন্দিরে। মহিলাটির কাছ থেকে ট্যাক্সি চালক জানতে পারেন যে তাঁকে তার স্বামী এবং ভাই পরিত্যাগ করেছে।

কাহিনী হিসাবে 'দুই অপরাধী' অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট থেকে গেছে। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া দুটি ভিন্ন মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন। অমলেশ এবং ট্যাক্সিচালক উভয়েই নিজেদের অপরাধী মনে করেছে। মহিলাটির বিড়ম্বিত জীবনের পরিণতি কি হতে পারে? এই চিন্তায় তারা উভয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যদিও ব্যক্তিগত ভাবে মহিলাটির বিড়ম্বিত জীবনের ক্ষেত্রে তাদের কিছুই করার ছিল না এবং এরজন্য তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই দায়ী নয়। কিন্তু পরদিন সকালে খবরের কাগজ খোলার সময় অমলেশ মৃদু মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। মহিলাটির যদি কিছু অঘটন ঘটে থাকে তার জন্য কি তারা দায়ী। এই ভাবনাটা সহজে মন থেকে অমলেশ বাদ দিতে পারে না।

যোগসূত্রহীন ঘটনাও যে মানুষকে মাঝে মাঝে বিব্রত করে ফেলতে পারে, তারই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সতীনাথ ভাদুড়ী এই গল্পটির মধ্যে করতে চেয়েছেন। কিন্তু অবিন্যস্ত কাহিনীর জন্য তিনি এখানে সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারেন নি।

'পদাঙ্ক' একটি ভিন্ন ধরণের গল্প। সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি এই গল্পটিতে বিশেষ না পাওয়া গেলেও, কাহিনীবস্তুর মধ্যে কিছুটা অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়।

একটি সরকারী গবেষণা কেন্দ্রের সর্বসময় কর্তা ডঃ বোস। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী, এই কারণেই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও ইংলণ্ড যাবার সুযোগ পান এবং সেখানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর দেশে ফিরে বড় চাকুরীতে যোগদান করেন। ইংলণ্ডে থাকাকালীন তিনি এক ইংরেজ রমণীকে বিবাহ কারন, এই কারণে ডঃ বোসের আত্মীয় পরিজন তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি। ডঃ বোস মেমসাহেবকে নিয়েই থাকতেন।

সরকারী গবেগণা কেন্দ্রের অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে বাঙালী বড় সাহেব এবং তাঁর মেমসাহেবে স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের নানা বিষয় নিয়ে সব সময়ই আলোচনা চলতো। সাহেব-মেমসাহেব লোক ভালো হলেও, আপিসের অন্যান্য কর্মচারী এবং তাদের পরিবার-পরিজনেরা তাদের ভয় করেই চলতো।

বড়সাহেব এবং মেমসাহেবের ধরণ-ধারণ দূর থেকে লক্ষ্য করে নিজেরা কৌতুক অনুভব করতো।

রেবার বাবা ডঃ বোসের অধস্তন কর্মচারী। সরকারী কলোনীর এ-টাইপ কোয়াটার্সে রেবারা থাকে। সরকারী নিয়মানুসারে চাকুরীর পদমর্যাদানুযায়ী কর্মচারীরা 'সি. বি. এ.' কোয়াটার্স পেয়ে থাকে। রেবার বাবা বরাবরই বড়সাহেবের সঙ্গে মাখামাখি করার বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু রেবার ছিল অপার কৌতূহল বড়সাহেব এবং মেমসাহেবের প্রতি। একবার মেয়ে স্কুলের স্পোর্টসে-এ রেবা মিসেস ডঃ বোস-এর দৃষ্টিতে পড়ে। রেবা দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী ছিল, মেমসাহেবের রেবাকে খুব ভালো লাগে। তিনি রেবাকে তাদের বাড়ীতে আসতে বলেন। এর কিছুদিন পর মিসেস বোস মারা যান। পত্নী বিয়োগে ডঃ বোস খুব বিমনা হয়ে পড়েন। অফিসে যাওয়া কমিয়ে দেন, মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। তবু তিনি কিছুতেই শান্তি পান না। বাবুর্চি বেয়ারাদের সাহেব বলেন, মেমসাহেব তাকে রাত্রে বিছানা থেকে ঠেলে ফেলে দেন। এরপর রসুলপুরের রুস্তম ওঝাকে ভূত তাড়াবার জন্য ডাকা হয়। এতবড় একজন বৈজ্ঞানিকের এমন নিকৃষ্ট শ্রেণীর কুসংস্কারে আস্থা দেখে সকলেই বিস্মিত হল। কিন্তু সাহেব তখন আর আগের মত নেই—পত্নীর বিয়োগে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছেন। ডঃ বোস শেষ পর্যন্ত একদিন বিকেল বেলায় রেবাদের বাড়ী যাবেন বলে স্থির করলেন। তাঁর স্ত্রী রেবাকে খুব ভালোবাসতেন।

রেবার বাবার মত একজন অধস্তন কর্মচারীর বাড়ীতে বড় সাহেবের যাওয়া রীতি-বিরুদ্ধ হলেও রেবার বাবা কিছুই মুখে বলতে পারতেন না। ডঃ বোসও সাহেবিয়ানা ভুলে গিয়ে রেবার মার হাতের সুক্তানি আর মোচার ঘণ্ট পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতেন। সরকারী কলোনীতে এ ধরণের ঘনিষ্ঠতা এর আগে কখনও হতে দেখা যায়নি। এই নিয়ে নানা কথা উঠলো। শেষ পর্যন্ত ডঃ বোস রেবাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। ডঃ বোস প্রায় মাঝ বয়সী, সে তুলনায় রেবা একেবারেই ছেলে মানুষ। রেবার মা এ বিয়েতে কিছুতেই মত দিতে চাইলেন না, কিন্তু সকলকে অবাক করে রেবাই বিয়েতে উৎসাহ দেখালো। স্ত্রী হয়ে রেবা ডঃ বোসের বাড়ীতে আসার পর থেকেই সে প্রতিপদে নিজেকে মেমসাহেবে সঙ্গে তুলনা করে চলতো। সে চায় সাহেব তাকে মেমসাহেবের মত করে ভালোবাসুক। সাহেবদের ভালোবাসার

ধরণটা জানার তার বরাবরের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ডঃ বোস রেবার সঙ্গে তার বয়েসের পার্থক্যটা অনুমান করেই একটু সংকোচ থাকতেন। তিনি স্ত্রীর মন পাবার জন্য সাহেবিয়ানা ছেড়ে এদেশী গেরস্থ বাঙালীর মতো ব্যবহার করতে চাইতেন। রেবা মনে করতো সে হয়তো ঠিক মেমসাহেব বৌ-এর মত করে সাহেবের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝিতে দুজনের মধ্যকার ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়তেই লাগলো।

রেবা সাহেবী ব্যবহারের উদ্দীপনা উপভোগ করতে চায়, অনাস্বাদিত এবং আকাঙ্ক্ষিত যা তার দিদিরা বা বন্ধুরা কেউ পায় নি। কিন্তু রেবার প্রৌঢ় স্বামী তা বুঝতে পারেন না, তিনি আরও বাঙালীয়ানা ধরেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। শেষ পর্যন্ত ডঃ বোস আবার মদ্যপান শুরু করেন। রেবা অনেক আগে থাকতেই জানতো, অতিরিক্ত নেশা করে বিছানায় শুলে সাহেবের আগের মেম-স্ত্রী বিছানা থেকে ঠেলে ফেলে দিত, রেবাও একদিন তাই করলো।

গল্পটির মধ্যে অনেক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। ডঃ বোস এবং রেবা কারো চরিত্রই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি। মেমসাহেব স্ত্রী যেমন মর্যাদা পেত, তা পাওয়ার জন্য মধ্যবয়সী ডঃ বোসকে বিবাহ করার মধ্যে রেবার বিশেষ এক ধরণের মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ডঃ বোস রেবাকে বিবাহ করে যে মানসিক শান্তি খুঁজেছিলেন এবং মনের যে অনাস্বাদিত আকাঙ্ক্ষা উভয়ে চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন, সে মনস্কামনা পরিপূর্ণ না হওয়ার ব্যঞ্জনাটুকু লেখক অতি সূক্ষ্মভাবে গল্পের শেষে ডঃ বোসের একটি মাত্র কথায় পরিস্ফুট করেছেন: "এমিলি তোমার গায়ে নারকোল-তেলের গন্ধ কেন?" এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সান্নিধ্যে আসার ব্যর্থতাটুকু চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

ডঃ বোসের প্রথম স্ত্রী ইংরেজ রমণী এমিলির চরিত্রটি ডঃ বোস এবং রেবার তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবানুগ হয়েছে। সতীনাথ তাঁর অনেকগুলি ছোটগল্পে কিছু ইংরেজ মহিলা-চরিত্রের পরিকল্পনা করেছেন। সে সব ক্ষেত্রে ইংরেজের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই ইংরেজ নারী চরিত্রগুলি চিত্রিত করেছেন। দুর্বল কাহিনীটির মধ্যে এমিলির চরিত্রটিই সংক্ষিপ্ত হলেও জীবন্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'হিসাব নিকাশ' সতীনাথ ভাদুড়ীর একটি লঘু রচনা। সতীনাথ ভাদুড়ী

অনেকগুলি ব্যঙ্গাত্মক গল্প রচনা করেছেন। সেই সমস্ত গল্পে, মানুষের জীবনের অসঙ্গতি, সমাজ-জীবনের অসামঞ্জস্য, রাজনীতিবিদ্‌দের দেশসেবার নামে ভণ্ডামি, ব্যবসায়ীদের ব্যবসাবুদ্ধি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখক পরিহাসচ্ছলে যে কাহিনী রচনা করেছেন তার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন তাঁর গভীর সমাজ জ্ঞান এবং মানবচরিত্র বিশ্লেষণে অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যায়, তেমনি অপরদিকে কাহিনীর রসসৃষ্টিতে সমান পারদর্শিতা লক্ষ্য করি। কিন্তু 'হিসাব নিকাশ' গল্পটি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। এখানে লেখক জীবন বা সমাজের গভীরে প্রবেশ করে নি। অত্যন্ত হালকাচালে এক প্রায় অর্ধোন্মাদ মানুষের চরিত্রের একটি দিককে নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

এককড়ি দাস এমন একজন মানুষ যার কোন আচরণেই বাড়ির লোকেরা বিস্মিত হয় না। দু-এক পয়সা লাভের জন্য সে এমন কাজ করতে পারে যা আর কারো বুদ্ধিতে আসে না। পরোপকার করাও এককড়ি দাসের চরিত্রের আরও একটি দিক ; কিন্তু বিনা স্বার্থে সে কারো কোন কাজ করে না। বেয়ানের শ্রাদ্ধের কাজটি সামলে দেওয়ার অজুহাতে এককড়ি স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের শ্রাদ্ধ বাড়িতে পাঠিয়েছিল দিন কয়েকের জন্য। এদিকে পাড়াতেই সিংহি বাড়ীতে বিয়ে, এখানের কাজের জন্য স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের নিয়ে আসতে হয়, কিন্তু তাদের আনতে যাওয়ার অর্থ ট্রেন ভাড়া বাবদ কিছু টাকা খরচ। টাকা-পয়সার হিসাব নিকাশ যখন করছিল, তখনই তিনকড়ি দাসের কিছু অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ এসে গেল। সিংহিদের বাড়ীতে একটা কালো বেড়াল সারারাত চিৎকার করে সকলকে বিরক্ত করছিল, একে কালো বিড়াল, তার উপর বিয়ের মত শুভ অনুষ্ঠানে কালো বিড়াল থাকা মানেই কিছু অমঙ্গল হওয়া। তাই সিংহি মশাই বললেন কালো বিড়ালটাকে ধরে যদি কেউ ছেড়ে দিয়ে আসতে পারে তাহলে তিনি তাকে দশটাকা বকসিস্ দেবেন। বিড়াল ধরা সহজ কাজ নয়, এককড়ি সিংহি বাড়ীর নেপালী দারোয়ানের সঙ্গে অনেক দর কষাকষির পর স্থির করলো বেড়ালটা ধরে দেওয়ার জন্য সে তাকে চারটাকা দেবে আর ফেলে আসার জন্য সে নিজে নেবে রাহাখরচ বাদে বাকী টাকা। এই টাকায় তার জামাই বাড়ী থেকে স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের আনবার খরচ উঠে যাবে, আর শ্রাদ্ধ বাড়িতেও একবার হাজিরা দেওয়া হবে। এককড়ি দাস রাত সাড়ে দশটার সময় একটা খালি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তা নিয়ে যখন জামাই-এর বাড়ীতে গেল তখন

কেউই আশ্চর্য হয় নি কেননা তার কোন আচরণেই বাড়ীর লোকেরা অবাক হয় না। কিন্তু আসবার সময় এই বস্তাটা করে যে বেড়াল নিয়ে গিয়েছিল সে ধারণা তার স্ত্রীর করতে পারেনি। সতীনাথের এই শ্রেণীর হাসির গল্পের আসল চমকটা থাকে একেবারে শেষে।

জামাইয়ের বাড়ীতে যাওয়ার পথে ষ্টেশনের প্লাটফর্মের কালো বিড়ালটা ছেড়ে দেওয়ার সময় ট্রেনের সাহেব গার্ড এবং তার মেমসাহেব কালো বিড়ালটা দেখে খুব খুশী হয়ে তারাই পুষবে বলে তাদের সঙ্গে নিয়ে নেয়। পরদিন স্ত্রীকন্যাদের নিয়ে এককড়ি যখন নিজের বাড়ী ফিরে আসে ; সেই ট্রেনের সাহেব গার্ড তার মেমসাহেবকে নিয়ে ফিরেছিল। গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীতে ফিরে এককড়ি বিশ্রাম করারও সময় পায়নি। এমন সময় নেপালী দারোয়ানের হুংকার শোনা গেল। বিয়ে বাড়ীতে এই মাত্র কালো বিড়ালটা ফিরে এসে আবার হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়েছে। বেইমান এককড়িকে সে একবার দেখে নিতে চায়, টাকা নিয়েও মনিবের কাজ না করার জন্য। গল্প হিসাবে 'হিসাব নিকাশ' অতি সাধারণ স্তরের হলেও রঙ্গরস তৈরীতে লেখক যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন তা বিশেষ প্রসংশনীয়। সংখ্যায় অল্প হলেও ছোটগল্পে রস সৃষ্টিতে সতীনাথ বহুমুখীতার পরিচয় দিয়েছেন।

সতীনাথের ছোটগল্পগুলির মধ্যে 'অলোকদৃষ্টি' গল্পটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘায়ু কাশীবাসিনী এক বৃদ্ধার মনস্তত্বের বিশ্লেষণের লেখক অসাধারণ বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। সতীনাথ চিরকাল বাংলাদেশের বাইরে বসবাস করেছেন। সব সময় তিনি বাঙ্গালীর মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেন নি, 'অলোকদৃষ্টি' গল্পটির মধ্যে তাই কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। বাঙালী এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে প্রবাসী বাঙ্গালীরা সাধারণত পরিপুষ্ট করতো, কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের জীবন-চিত্র চিত্রণে তিনি কোথাও ভিন প্রদেশের মানসিকতা আরোপিত করেন নি। সতীনাথ অত্যন্ত সচেতন শিল্পী ছিলেন। এই প্রদেশের ভিন্ন জাতি এবং পরিবারের রূপ কল্পনায় তিনি সূক্ষ্মভাবে পার্থক্যগুলি দেখতে পারতেন। 'অলোকদৃষ্টি' এক প্রবাসী বাঙ্গালীর যৌথ পরিবারের কাহিনী। কাশীবাসিনী অতি বৃদ্ধার অকারণ দীর্ঘজীবন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে যেমন বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে তাই নিয়ে তিনি সহস্য-করুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। বৃদ্ধার এই দীর্ঘজীবন তাঁর নিজের কাছে দুর্বিসহ বোঝার মত মনে হয়েছে। দীর্ঘ

ত্রিশ বৎসর কাশীতে বসবাস করে স্বাভাবিভাবে জীবনের পরিণতি যে মৃত্যু তাকে তিনি লাভ করতে পারেন নি। এই বৃদ্ধার চরিত্রে একদিকে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা ও অপরদিকে সংসারাভিজ্ঞ বাস্তবজ্ঞানের সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। সংসার জীবনের খুঁটিনাটি কর্মদক্ষতা যেমন তাঁর পরিবারের অন্যান্য সকলের কাছে বোঝা হয়েছে, তেমনি আবার পরিবারের এই সকল চরিত্রের তাঁর প্রতি কিছুটা অবহেলা ও উপেক্ষা তাঁকে বেঁচে থাকার পরিবর্তে মৃত্যুর কথাই বার বার স্মরণ করিয়েছে। এমনকি এই যন্ত্রণা তাঁকে পাপ-পুণ্যের বোধটুকু থেকেও দূরে সরিয়ে এনেছে। বড়খোকার মাকে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যাওয়ার কথায় তিনি নিরুত্তর থেকেছেন। বৃদ্ধা মায়ের প্রতি সন্তানদের ভক্তি-ভালোবাসার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই ভাইয়ের অর্থ রোজগারের বাস্তবতা, দুটো সংসার চালানোর পক্ষে তাদের রোজগারের স্বল্পতা সেই সঙ্গে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে চুক্তি, বৃদ্ধা মাকে কাশীবাস ছাড়ানোর পরিকল্পনা, গল্পের শেষে মর্মান্তিক ট্রাজিক রসসৃষ্টি করেছে। মাকে খাবারের সঙ্গে গোপনে ঘুমের ওষুধ পরিবেশন করে ঘুমন্ত মাকে স্থানান্তরিত করার পরি-কল্পনার মাঝখানে বৃদ্ধার অতি সচেতন দৃষ্টির কাছে তাদের সমস্ত কৃত্রিম আন্তরিকতাটুকু যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি নিজেদের কাছে তাদের ভালবাসা প্রদানের এই ব্যর্থতার বেদনাটুকু সুন্দরভাবে লেখক প্রকাশ করেছেন। তবে গল্পের উপসংহারে বৃদ্ধাকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনায় লেখকের চিন্তাধারার সুষ্ঠু পরিণতি ঘটেনি বলেই মনে হয়। গল্পের আদ্যপান্ত সুনিপুণ বাস্তবতার যে চিত্র লেখক এঁকেছেন, উপসংহারে বৃদ্ধাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে স্থানান্তরণের মধ্যে সেই সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। কারণ যে বৃদ্ধা জীবন ও সংসার সম্পর্কে এত সচেতন, যার সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলার অবকাশ থাকে ন', তাঁর ছেলেরা তাঁকে এভাবে স্থানান্তরিত করার পরবর্তী ছবিটুকু আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়েই থেকে যায়।

সংকটকালে মানুষ যে কেমন করে কুসংস্কারের উপর আস্থাশীল হয়ে পড়ে সতীনাথ সে কথা একটি পারিবারিক কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বিবৃত করেছেন। সতীনাথ তাঁর ছোটগল্পগুলিতে যেমন বিহারের ভদ্রেতর সমাজের বাস্তব ছবি অঙ্কন করেছেন, তেমনি কিছু কিছু গল্পে প্রবাসী বাঙালীর পরিবার নিয়েও কাহিনী রচনা করেছেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের দিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, এই কারণে তাঁর কোন গল্পে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি

লক্ষ্য করা যায় না। 'জাদু-গণ্ডি' গল্পটিও অতি সাধারণ স্তরের হলেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে একটি সার্থক হাস্যরসাত্মক গল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর অধিকাংশ ছোটগল্পের মত এই গল্পটিতেও তাঁর সুমধুর পরিহাস-প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এক কয়লাখনির দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ভদ্রলোক, তাঁর বৃদ্ধ পিতা ও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করেন। তাঁর পিতাও একসময় দোর্দণ্ড প্রতাপে এখানে রাজত্ব করতেন, তিনিও সাহেবী কয়লা কোম্পানির বড়বাবু ছিলেন। তাঁর ভয়ে চাপরাশী, কেরানী ঠিকাদারের দল এককালে সন্ত্রস্ত থাকতো। বয়েসের ভারে আজ তিনি এতটাই অক্ষম, অসহায় এবং অবহেলার পাত্র যে তাঁর চিরকাল পাথরের থালা-বাটিতে খাওয়া অভ্যাস থাকলেও তাঁকে ইনামেলের থালায় ভাত খেতে দেওয়া হয়েছে। অথচ এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না তাঁর পুত্রবধূ নন্দরাণীর। তাকেই সংসারের সবকিছু দেখতে হয়। এর আগে অনেকবার কাঁসার বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু প্রতিবারই চুরি হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ঝি-চাকরদের কিছু বলারও উপায় নেই, তাহলেই সবাই এক জোট হয়ে কাজ ছেড়ে দেবে। তখন আবার নতুন সমস্যা। তার মধ্যে 'খ্যাঁদার মা' জানিয়ে দিয়েছে যে সে আর পাথরের বাসন মাজবে না; কেন না, যদি হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে যায় তাহলে তার অকল্যাণ হবে—ছেলে পিলে নিয়ে তাকেও তো ঘর করতে হয়। শ্বশুর মশায় চিরকাল পাথরের থালায় খেয়ে এলেও নন্দরাণী বাধ্য হয়েই ইনামেলের থালায় খেতে দেন। এতে করে বৃদ্ধ শ্বশুর মশায় অপমানিত বোধ করেছেন এবং তিনদিন ধরে নন্দরাণীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। এদিকে তার স্বামীও কয়লাখনির দুর্ঘটনা নিয়ে বিপদের মধ্যে আছেন। ঠাকুর চাকরেরা যে ষড়যন্ত্র করছে এ-ধারণা করতে পারলেও স্বামীর বিপদের কথা চিন্তা করে নন্দরাণীকেও কুসংস্কার মেনে নিতে হচ্ছে, কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারছেন না। 'জাদু-গণ্ডি' সতীনাথের একটি সরস গল্প। কেবল হাস্যরস সৃষ্টিই লেখকের উদ্দেশ্য থাকায় গল্পে কিছু কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রঙ্গরসিকতার মধ্যেও লেখক বৃদ্ধ শ্বশুর মশায়ের মানসিকতা অতি বাস্তবতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। সতীনাথ কয়েকটি ছোটগল্পে বয়স্ক নরনারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পগুলির অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব বিষয়বৈচিত্র্য, একথা পূর্বের আলোচিত গল্পগুলো থেকে সহজেই ধরা পড়েছে। তিনি অনেক গল্পে তাঁর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু তিনি কখনই সাধারণ ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন নি। এই শ্রেণীর গল্পগুলির মধ্যে বিচিত্রতর চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। কেবল তাই নয়, তিনি বাংলা ছোটগল্পের সীমানাকে বহুদূর বিস্তৃত করেছেন। 'ব্যর্থ তপস্যা' এই শ্রেণীর গল্প। গল্পটি জীবনের বাস্তবভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। দেশ-ভ্রমণ এবং তীর্থ দর্শনের সূত্রে লেখক একবার অযোধ্যার এক ধর্মশালায় উপস্থিত হন। এই ধর্মশালায় পাঞ্জাব প্রদেশের এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসীর অনুগামিনী নাতিপ্রৌঢ়া গেরুয়া পরা এক মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। পাঞ্জাবের ধর্মান্ধ বৃদ্ধের কাছ থেকে লেখক জানতে পারেন যে তাঁরা একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও, তাঁদের মধ্যেই কল্কি অবতারের আবির্ভাব ঘটবে। একথা শাস্ত্রে লেখা আছে এবং সেই মত তিনি গত পঞ্চাশ বৎসর তপস্যা করে এসেছেন। কলিকালের শেষে এই দেবতার আবির্ভাবের কথা এবং তিনিই জগৎকে উদ্ধার করবেন। দেশ বিভাগের সময় যখন ভারত-পাকিস্তান দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছিল সেই সময়ে তাদের সম্প্রদায়ে সেই অবতারের আবির্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু তাদের সকলকে হতাশ করে তাদের বহু প্রত্যাশিত অবতারের অপমৃত্যু ঘটে। তাঁদের তপস্যা ব্যর্থ হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 'ব্যর্থ তপস্যা' সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী। এই কারণে এই কাহিনীর চরিত্রগুলোকে আমাদের পরিচিত মহলে দেখতে পাওয়া যায় না। গল্পটিতে লেখকের প্রখর কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সতীনাথ ভাদুড়ীর হাসির গল্পগুলির মধ্যে এক ধরণের গল্প আছে যেখানে তিনি স্বাধীনতা-উত্তর কিছু রাজনীতিবিদ্‌দের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে পরিহাস করেছেন। কিন্তু তাঁর বিদ্রূপ কোথাও তিক্ত হয়ে ওঠেনি। কেবল রঙ্গরস সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। শব্দের উচ্চারণ ভেঙ্গে হাস্যরস সৃষ্টি করাতেও সতীনাথ সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। বিষয়বস্তুর মধ্যে কোথাও কোথাও সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও পরিবেশনার অভিনবত্বে তাঁর প্রতিটি গল্প স্বতন্ত্রতায় চিহ্নিত। 'পরকীয় সন-ইন-ল' এমনই একটি হাস্যরসাত্মক গল্প। শ্রীসাহেবরাম এম. এল. এ.-র ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়া ছিল, কিন্তু ভাগ্য

অনুকূল থাকার জন্য তিনি কো-অর্ডিনেশন বিভাগের উপমন্ত্রীর পদলাভ করেন। দলের তত্ত্ববিৎ উপমন্ত্রীকে তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে বোঝাতে গিয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের পথের প্রধান দুটি বাধার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে দুটি ইংরাজি শব্দের উপর জোর দেন; প্রথমটি 'বটলনেক' দ্বিতীয়টি 'পারকিনসন্স্'-ল'।

সাহেবরামজী ভাল ইংরেজি জানেন না। দলের অন্যান্য লোকেরা তত্ত্ববিদ্‌কে বিষয়টি হিন্দীতে বোঝাতে অনুরোধ করেন। এতে করে সাহেব-রামজীর স্পর্শাতুর স্থানে আঘাত লাগে। এটুকু বোঝার মত তাঁর যে ইংরেজী জ্ঞান আছে তাই জানাবার জন্য তিনি বলে ওঠেন: "পরের (পরকী) সন-ইন ল কেন, নিজের জামাইকেও আমি চাকরি দেব না।" এরপর থেকে শ্রীসাহেব এম. এল.এ.-র নতুন নাম হল 'পরকী দামাদ' (পরকীয় জামাই)। এরপর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কাজের জন্য প্রদত্ত ভাষণের মাঝে মাঝে 'পারকিনসন্স্'-ল'এবং 'বটলনেক' শব্দ দুটির মধ্য দিয়ে একদিকে লেখক যেমন হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন, অপরদিকে তেমনি সরকারী শাসন ব্যবস্থার অসঙ্গতি-গুলিকেও আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছেন। সতীনাথ কেবল নিরলস জ্ঞান পিপাসু ছিলেন তাই নয়, তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি সমাজের সর্বত্রগামী হয়েছে। সামাজিক অসামঞ্জস্য এবং মানব চরিত্রের অসঙ্গতি একদিকে যেমন তাঁকে কৌতুকপ্রিয় করে তুলেছে, অপরদিকে তেমনি তাঁকে মানবদরদীও করে তুলেছে। 'পরকীয় সন-ইন-ল' গল্পটিতে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার দিকটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

ছোটগল্প রচনায় সতীনাথের একেবারে নিজস্ব জগৎটি হল ব্যঙ্গ-চরিত্রের জগৎ। এই জাতীয় গল্প বলার ক্ষেত্রে একদিকে তিনি যেমন ভাষার উপর কর্তৃত্ব দেখিয়েছেন অপরদিকে তেমনি হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সর্বত্র নিজস্বতা বজায় রেখে চলেছেন। যদিও সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভণ্ডামিকেই তিনি আক্রমণের ক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচিত করেছেন সবচেয়ে বেশী, তবুও কোথাও তাঁর রচনা অতিরিক্ত শ্লেষাত্মক হয়নি, পরন্তু মৃদু কৌতুকের একটি স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তাঁর রচিত ব্যঙ্গ-গল্পগুলি কোথাও অতিরঞ্জিত হয়ে পড়ে না। 'তিলোত্তমা-সংস্কৃতি সংঘ' তাঁর এই শ্রেণীর একটি গল্প; প্রচলিত ব্যঙ্গগল্পের ধারার সঙ্গে তাঁর এই গল্পের পার্থক্যটি তাই সহজেই চোখে পড়ে যায়।

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কালে কোন অঞ্চল বিপন্ন হয়ে পড়লে তখন সাধারণের মধ্যে সর্বত্র ত্রাণ-যজ্ঞের মহাসমারোহ দেখা যায়। দেশের লোক বিপন্নদের সাহায্যার্থে নানা উপায়ে চাঁদা তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সভাসমিতির মাধ্যমে এই চাঁদা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু চাঁদা সংগ্রহে যত উৎসাহ দেখা যায়, যথাস্থানে চাঁদা পৌছানোর ব্যাপারে তত উৎসাহ দেখা যায় না। নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যথাস্থানে সংগৃহীত অর্থ পৌছুতে বছর ঘুরে যায়। 'তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ' গল্পটিতে এই বিষয়টিকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ব্যক্তি বিশেষকে লেখক কোথাও তাঁর ব্যঙ্গবাণের শিকার করেন নি। একটি প্রচলিত রীতির অন্তঃসারশূন্যতাকে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

'ভীষণা' নদীতে বাঁধ ভেঙ্গে বন্যা এলে সাহায্যের জন্য সুপরিচিত সব পন্থাই অবলম্বিত হয়। 'তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘে'র কর্তা ব্যক্তিরাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে বন্যায় ত্রাণ কার্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেন, কিন্তু সংঘের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে সরকার পক্ষ মামলা শুরু করেন। 'তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘে'র পক্ষের উকিল কিভাবে তাঁর মক্কেলদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে সরাসরি অস্বীকার করে সরকার বাহাদুরের আনীত অভিযোগ যে কেবল বোঝার ভুল ছাড়া আর কিছু না একথা প্রমাণ করলো ;—তাই নিয়েই গল্পের ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক রচনা। অভিযুক্ত পক্ষের উকিল তার আইনী বুদ্ধির মারপ্যাচে একথা প্রমাণ করলেন যে 'তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ' সংস্কৃতি জগতে একটি বিশিষ্ট নাম। এই প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে বিদেশে প্রচারের জন্য ডেলিগেশন নিয়ে গেছে। নিরলস ঐতিহাসিক গবেষণার পর এই তথ্য পাওয়া গেছে যে দানযজ্ঞের আদিগুরু ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র মূল পাণ্ডুলিপি দেন ও পরে সেই দান অনুষ্ঠানের ছবি তুলে রাখেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের রচনার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে এই দৃশ্যের পুনরানুষ্ঠান হয়। আসলে সরকার বাহাদুর বিভিন্ন ফটোগ্রাফের সাহায্যে যে কথা প্রমাণ করতে চাইছেন অর্থাৎ সংঘ বন্যাত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছে তা ঠিক নয়। সামান্য বোঝার ভুল মাত্র। আমাদের দেশের চাঁদা তোলার রীতিটিই অদ্ভুত। জেলা

সরকারী হাসপাতালের রুগীদের কাছ থেকে ড্রেসার এবং কম্পাউণ্ডাররা অর্থ সংগ্রহ করে। তারা সে অর্থ দেয় সিভিল সার্জেনকে, সিভিল সার্জেন দেন আবার ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসকে, তিনি আবার দেন স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে। এতে নানা অনুষ্ঠান হয়, মাইক, প্লাকার্ড, দাতা-গ্রহিতারা হাসি হাসি মুখ নিয়ে ছবি তোলে, কোন কিছুর ত্রুটি থাকে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকাটা কোথায় যায় তা ঠিক জানা যায় না। গ্রামের স্তর থেকে অনেক ধাপ পেরিয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে টাকা যেতে দীর্ঘ সময় লাগে। কমিশনার সাহেবের জেলা সফরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তারপর বহু হাত ঘুরে মন্ত্রী মহোদয়ের হাতে যেতে এক বছরের বেশী সময় লাগে। দেরী হওয়ার কারণকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। "গ্রামাঞ্চলে সব চেয়ে বেশি দেরি হয় ফটোগ্রাফার যোগাড় করতে, শহরে অপেক্ষা করতে হয় উপরওয়ালার ট্যুর প্রোগ্রামের; রাজধানীতে পছন্দমতো মন্ত্রী ছাড়াও কোনো কোনো সম্পাদকের খেয়ালখুশীর উপর নির্ভর করতে হয়।"

সরকার বাহাদুর সংঘের চাঁদা গ্রহণের ছবিগুলো দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন, সংঘ বন্যাত্রাণের জন্য সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার করেনি। আসলে ছবিগুলি শতবর্ষ পূর্বেকার একটি দৃশ্যের পুনরাভিনয় অনুষ্ঠানের ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। একথা অভিযুক্ত সংঘের কর্তাব্যক্তিদের উকিল প্রমাণ করেছেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র শতবার্ষিকীর মত একটি মহৎ অনুষ্ঠানের সঙ্গে বন্যাত্রাণের জন্য সংগৃহীত অর্থকে কাহিনীর সংঙ্গে জুড়ে দিয়ে লেখক একদিকে যেমন প্রহসন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি অন্যদিকে আইন ব্যবস্থার ফাঁকগুলোকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। সতীনাথ আইনজীবী ছিলেন, আইন আদালতের ফাঁক-ফোকরগুলি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি পথের বাইরে থাকেনি। এই গল্পটি পাঠককে কেবল হাসায় না ভাবিয়েও তুলতে সাহায্য করে। সতীনাথের বিশেষ কৃতিত্ব এইখানেই।

'জোড়-কমল' সতীনাথের আরও একটি রঙ্গ-রচনা। সরকারী রিপোর্টের দু-একটি শব্দের হেরফেরে কত অপরাধী আইনের অনুশাসন এড়িয়ে যেতে পারে তাই লেখক গল্পটির মধ্যে দেখিয়েছেন। ভির্বকধর্মিতা গল্পটির প্রধান বিশেষত্ব। একটি মফঃস্বল শহরের এক্সাইজ-সাবইন্সপেক্টর হারাণচন্দ্র এবং ক্রিমিন্যাল কোর্টের নাজির কৃষ্ণপদ দু-জনে অভিন্নহৃদয় বন্ধু। চাকুরী জীবনে বিশেষ উন্নতি করতে পারেন নি। সাধারণ ছাপোষা মানুষ।

উপরি রোজগার কিছু থাকার জন্য কোনো রকমে সংসার চালিয়ে এসেছেন। নাজারতের সিন্দুকে একটি সোনার গহনা দীর্ঘকাল দাবিদারের অপেক্ষায় পড়েছিল। কোন মামলার সূত্রে গহনাটা এসে থাকলেও পরবর্তী কালে কেউ দাবী জানাতে আসেনি। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী তিন বছরের মধ্যে দাবিদার না এলে নাজিরের কাছে রক্ষিত বাজে জিনিষগুলি পুড়িয়ে ফেলতে হয়। অবশ্য সোনা বাজে জিনিসের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু অভাবী নাজিরবাবু, কন্যার বিবাহের সময় গহনার সোনাটুকু কাজে লাগিয়ে ছিলেন। বিষয়টি চাপা পড়ে গেছে, ভবিষ্যতে এ-ব্যাপারে আর কোন তদন্ত হবে না, এই ধারণাই নাজিরবাবুর ছিল।

নাজিরবাবুর বন্ধু হারাণচন্দ্রও সরকারি মদের দোকানে বে-আইনী ভাবে গাঁজা বিক্রি করতে দিয়ে দু-পয়সা উপরি রোজগার করতেন। হারাণবাবুর বড়সাহেব, এক্সাইজ কমিশনার একবার এই শহরে ট্যুরে এলেন। ইন্স-পেকশনের অছিলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও সেখানে এসে উপস্থিত। সে সময় উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীরা অধিকাংশই ইংরেজ। কমিশনার সাহেব এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আবার বাল্যবন্ধু, ইংলণ্ডে একই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। দু-দিন ডাক বাংলায় থেকে একত্রে আনন্দ-ফূর্তি করবেন, এই তাঁদের উদ্দেশ্য।

হারাণবাবুর উপরওয়ালা অতিমাত্রায় কর্মতৎপর ব্যক্তি হওয়ার জন্য এক্সাইজ ইন্সপেক্টর ট্যুরে আসার মাত্র দুদিন আগে হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, মদের দোকানে মদ ছাড়াও চোরাই গাঁজা বিক্রি হয়। হারাণবাবু এবং নাজিরবাবু উভয়ের মাথাতেই আকাশ ভেঙে পড়ে। এতে করে তাদের যে চাকরী যাওয়ারই ভয় আছে তাই নয়, এমন কি জেল পর্যন্তও হতে পারে। তারা সাহেবদের সন্তুষ্ট করার জন্য ডাক-বাংলোতে বিবিধ পানীয়ের সঙ্গে প্রচুর খানাপিনার আয়োজন করেন। শেষ পর্যন্ত সাহেবদের তদন্তে উভয়েই ধরা পড়ে যায়, কিন্তু সাহেব সামান্য ধমক দিয়ে এক্সাইজ ইন্সপেক্টরকে তার রিপোর্টে 'সাব ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে খবর পাইয়া' কথাটি ঢুকিয়ে দিতে বলেন, আর নাজিরবাবুকে 'গোল্ড ব্যাঙ্গল' এর পূর্বে 'রোলগু' কথা জুড়ে দিতে বলেন। সোনার গহনা বাজে জিনিসের তালিকায় না পড়লেও, রোল্ডগোল্ড বাজে জিনিসের তালিকাতেই পড়ে। এর ফলে হারানচন্দ্র এবং কৃষ্ণপদ উভয়েই সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে যান। এখানে সরকারী শাসন ব্যবস্থার

অসঙ্গতিগুলিকে নিয়ে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন।

সতীনাথের গল্পগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি একদিকে সমাজ-জীবনের, রাজনীতি জগতের এবং ব্যবসায়ী মহলের দুর্নীতি এবং ভণ্ডামি নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক গল্প রচনা করেছেন, অপরদিকে তেমনি ব্যক্তি চরিত্রের কোন কোন অসঙ্গতি নিয়েও হাস্যকরুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। "শেষ সংখ্যান" গল্পে পরিসংখ্যানশাস্ত্র বিশারদ মিঃ বান্টিওয়ালার চরিত্রের এই জাতীয় অসঙ্গতি নিয়ে রঙ্গরস সৃষ্টি করেছেন। সতীনাথের এই জাতীয় গল্পের একটি ত্রুটি এই যে, তিনি সব ক্ষেত্রেই জীবনের খুব গভীরে প্রবেশ না করে, উপরের স্তরে বিচরণ করেছেন।

পরিসংখ্যানশাস্ত্রে মিঃ বান্টিওয়ালার পাণ্ডিত্য সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু তিনি এই পাণ্ডিত্য প্রকাশে সব সময় স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করেন না। একটি মফঃস্বল শহরে 'বীণাপাণি ক্লাব' প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজোর পরদিন সারস্বত সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ-গান-আবৃত্তি এবং রঙ্গ-তামাশা করাই ক্লাবের চিরাচরিত রীতি। কোন কার্যসূত্রে একবার মিঃ বান্টিওয়ালা এই শহরে এলে ক্লাব উদ্যোক্তারা তাঁকেই সারস্বত সভার সভাপতি করেন। ক্লাবের উদ্যোক্তারা শ্রীবান্টিওয়ালার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণের সঙ্গে অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য রক্ষা করার জন্য সভাতে কোন উদ্‌বোধন সঙ্গীতেরও ব্যবস্থা রাখেন নি, কিন্তু লঘু অনুষ্ঠান দেখতে যারা অভ্যস্ত তারা এই জাতীয় পাণ্ডিত্যের কি মর্ম বুঝতে পারবে, তাই সভাতে লোক সমাগম খুব কম হয়েছিল। অফুরন্ত কার্ড বিলি করা সত্ত্বেও বিশ ত্রিশজনের বেশী সভাতে লোক সমাগম ঘটেনি। মেয়েরা তো একজনও আসেনি। বাল-খিল্যের দলই সংখ্যায় বেশী এসেছিল। কিন্তু বান্টিওয়ালার এ-ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি শহরে কটি গাধা আছে তাই থেকে আরম্ভ করে শহরে কটি গাছ আছে সবেরই পরিসংখ্যান দিতে আরম্ভ করেন। শতকরা কজন লোক ক-ছটাক করে মাছ খান তাও তাঁর পরিসংখ্যান থেকে বাদ পড়ে নি।

সতীনাথের অধিকাংশ গল্পের শেষেই একটি অসাধারণ চমক থাকে। এই-জন্য তাঁর গল্পগুলো সাধারণ গল্পের পর্যায়ে পড়ে নি। পাঠক যখন কাহিনীর নাটকীয় চরম মুহূর্তে এসে অধীর হয়ে অপেক্ষা করেন, ঠিক সেই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটনার অবরোহণে কখনও তাঁরা হতাশ হন, কখনও

বা চমকিত হন। এই বৈশিষ্ট্যটি সতীনাথের এই জাতীয় গল্পের 'প্রাণ-ভোমরা'র মতো। শ্রীবাল্টিওয়ালার মত মেধাবী পরিসংখ্যান বিশারদের পক্ষে নয়া-পয়সার হিসাবে ভুল করার মধ্যেও এই জাতীয় চমক পাওয়া যায়।

'গোঁজ' একটি সাধারণ হাসির গল্প হলেও এই গল্পটির মধ্যে দাম্পত্য জীবনের কিছু ছবি পাওয়া যায়। সতীনাথের গল্প সম্ভারে আধুনিক কালের জটিল মানসিকতা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যকার ব্যবধানটুকু বিশ্লেষণ বিশেষ কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁর গল্পের বিশ্লেষণধর্মিতা অপেক্ষা বর্ণনা গুণই সমধিক। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি যতটা আধুনিক মনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, অধিকাংশ ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি জীবনের তত গভীরে প্রবেশ করেননি। 'গোঁজ' গল্পে তিনি স্ত্রী-পাগল এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির চারিত্রিক একটি অসঙ্গতিকে নিয়ে হাস্যরসাত্মক কাহিনী রচনা করেছেন। আপাত লঘু মনে হলেও লেখকের সংবেদনশীল মনের পরিচয় কাহিনীটির মধ্যে পাওয়া যায়।

ভূপতিবাবু স্ত্রী-পাগল। তাঁর আরো একটা দোষ বন্ধু মহলে সকলের সঙ্গে একত্রিত ভাবে কোন আলোচনায় যোগ দিতে পারেন না। সর্বত্র স্ত্রীর গুণ কীর্তন করেন আর নিজের অক্ষমতার কথা বলে লোকের কিছু সহানুভূতির প্রত্যাশা করে থাকেন। এইজন্য সকলেই ভূপতিবাবুকে এড়িয়ে চলেন। শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী রত্নমালাও তাঁর চর্বিতচর্বণে বিরক্ত হন, এতে ভূপতিবাবু কেঁদে ফেলে বলেন; "তুমিও যদি আমার দুঃখের কথা শুনতে রাজী না থাক, তবে আমি কার কাছে বলি?" ভূপতিবাবুর হাসির আড়ালে মূলতঃ একটি ট্রাজিক চরিত্র লুকিয়ে আছে। চরিত্রটি সম্পূর্ণ বিশ্লেষিত না হওয়ার জন্য, ভূপতিবাবুর এ-জাতীয় আচরণের কোন যথার্থ ব্যাখ্যা না দেওয়ার জন্য, তার চরিত্রের এই ট্রাজিক দিকটি প্রকাশিত হয়নি। গল্পটির মধ্যে হাস্যরসের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যই কাহিনীর শেষে একটি চমক আনা হয়েছে।

ভূপতিবাবু কিন্তু তাঁর দোষ কোথায় তা বুঝতে পারেন না। ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার জন্য স্বামীর ব্যবহারে স্ত্রী রত্নমালাও সংকোচবোধ করেন। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী রত্নমালা ভূপতিবাবুকে কুলগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে বলেন। ভূপতিবাবু গুরুদেবের উপদেশ সম্বলিত একটি চিঠি পান এবং সেই উপদেশানুযায়ী কাজ করে কিছুটা মানসিক শান্তি লাভ করেন।

হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করেন যে গুরুদেবের হস্তলিপি আর বাড়ীর ধোপার খাতার হস্তলিপি এক। তিনি অবশ্য সঠিক জানতেন না যে, এই ধোপার খাতার হিসাব তাঁর স্ত্রী না তাঁর কন্যা রাখেন। নির্দোষ হাসির গল্প হিসাবে 'গোঁজ' গল্পটির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

সতীনাথ ভাদুড়ীর অধিকাংশ গল্পের মধ্যে রঙ্গ-ব্যঙ্গের সঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি এবং কৌতুকপ্রবণ মনের পরিহাসপ্রিয়তা প্রকাশ পেলেও কিছু কিছু গল্পে তিনি অসাধারণ কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'পঙ্কতিলক', 'স্বর্গের স্বাদ' 'ব্যর্থ তপস্যা' প্রভৃতি এই শ্রেণীর গল্প। বাস্তবজগৎ ছাড়াও কল্পরাজ্যেও তিনি অবাধ বিচরণ করতে পারতেন। কিন্তু সতীনাথ মূলতঃ বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক ছিলেন। তিনি জীবনের অভিজ্ঞতার বাহিরে সম্পদ আহরণে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। এই কারণে তিনি ছোটগল্প-রচনাতেও চেনা-জানা পরিবেশের মানুষজনকেই বারে বারে নিয়ে এসেছেন। তাদের সুখদুঃখ, ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। সমাজ-জীবনে, রাজনীতিতে, সরকারী শাসন ব্যবস্থার অসঙ্গতিগুলিকেও সঠিক ভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি আধুনিক মানুষের জটিল মানসিকতা ধরার চেষ্টা না করলেও জীবনের অতি তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে গল্পের উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছোটগল্প রচনার বিভিন্ন রূপরীতির সার্থক রূপায়ণেরও একজন দক্ষ শিল্পী ছিলেন।

পাদটীকা

১. ভগবানপ্রসাদ মজুমদার : 'ব্যঙ্গশিল্পী সতীনাথ' [সতীনাথ স্মরণে] : পৃ -১৪১।

২. 'ডায়েরী' : ২৭শে জুলাই ১৯৫৮।

সপ্তম অধ্যায়

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ সাহিত্য বলতে যা বোঝায় সতীনাথ ভাদুড়ী সেই ধরণের প্রবন্ধ রচনা করেননি। তাঁর প্রবন্ধের কোন স্বতন্ত্র সংকলনও পাওয়া যায় না। সাময়িক পত্রে তিনি নামমাত্র কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। ঐ প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে তাঁর কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বা মতবাদও প্রকাশিত হয়নি। কয়েকটি প্রবন্ধকে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পরিপূরক বলা যায়। প্রচলিত রীতিতে প্রবন্ধগুলি রচিত না হলেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে লেখকের গভীর প্রজ্ঞা এবং দীর্ঘ অধ্যয়নের ছাপ সুপরিস্ফুট। গল্প বলার ঢঙে সতীনাথ তাঁর প্রবন্ধগুলি রচনা করে গেছেন।

অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান বা ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশের জন্য লেখক তাঁর উপন্যাস বা ছোটগল্পগুলিকে বাহন করতে পারেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে নিজস্বভাব বা জ্ঞান প্রকাশের জন্য প্রবন্ধই উপযুক্ত মাধ্যম রূপে বিবেচিত হয়। সতীনাথ উপন্যাস কিংবা ছোটগল্প রচনা কালে যথেষ্ট পরিমাণে নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করে চলেছেন, উপন্যাস কিংবা ছোটগল্প বা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পার্থক্য, প্রবন্ধের মধ্যে লেখক প্রত্যক্ষ এবং অন্তরঙ্গভাবে পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা ভাষার যোগাযোগ স্থাপন হওয়ার পর বাংলাভাষায় প্রথম যে শাখাটির আবির্ভাব ঘটলো সেটি প্রবন্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ধর্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের মনীষীদের চিন্তাভাবনা প্রবন্ধের মধ্য দিয়েই প্রকাশ লাভ করে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় যেমন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বর্তমানরূপটি ধারণ করেছে, প্রবন্ধ সাহিত্যও তেমনি একস্থানে স্থির না থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। এই কারণেই প্রবন্ধের সুনির্দিষ্ট রূপ নেই।

সাধারণভাবে প্রবন্ধকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, একটি বিষয়নিষ্ঠ; অপরটি আত্মভাবনানিষ্ঠ বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। সতীনাথের প্রবন্ধগুলিকে আত্মভাবনানিষ্ঠ, ইংরেজীতে যাকে Personal Essay বা Familiar Essay বলে, সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলতে পারে। আত্মভাবনানিষ্ঠ প্রবন্ধ হলেও এখানে সতীনাথের কিছুটা স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্য করা যায়।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনায় কোন সুনির্দিষ্ট রীতি প্রবন্ধকারেরা অবলম্বন করেন না। লেখকেরা তাঁদের ব্যক্তিমনের অনুভূতি এক শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। সাধারণতঃ আত্মচরিত, স্মৃতিচিত্র ও পত্ররচনার মধ্য দিয়ে এই জাতীয় রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। সতীনাথ প্রবন্ধ রচনা করার জন্য দীর্ঘসময় ব্যয় করেন নি। তিনি গ্রন্থপাঠে যতটা আনন্দ লাভ করতেন, গ্রন্থ সমালোচনায় ততটা আনন্দলাভ করতেন না। কেবল প্রবন্ধই নয় কবিতা এবং নাটক রচনাতেও তিনি মনোনিবেশ করেন নি। তাঁর গুটিকয়েক কবিতা এবং একখানি নাটিকা পাওয়া যায়, যা তাঁর একটি গল্পেরই নাট্যরূপ।

সার্থক প্রবন্ধ রচনা করতে গেলে যে যে গুণ থাকা প্রয়োজন সতীনাথের মধ্যে সেইসব গুণগুলি বর্তমান ছিল। অথচ এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার যে তিনি সামান্য কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এই কটি প্রবন্ধে সতীনাথের গভীর মননশীলতা, পরিশীলিত কৌতুকবোধ,প্রখর অন্তর্দৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণ বিচার-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল প্রবন্ধ পাঠে এই ধারণা জন্মায় যে, সতীনাথ একজন বিদগ্ধ প্রবন্ধকার এবং সাহিত্য-সমালোচক হতে পারতেন। তিনি তাঁর রচনার সংখ্যাধিক্যের জন্য বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না, উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও তিনি সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি, অথচ জীবনের শেষদিন পর্যন্তও যে তিনি নতুন নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন তা তাঁর একটি অসমাপ্ত উপন্যাসের খসড়া থেকেই প্রমাণিত হয়। তিনি আরও একটি উপন্যাসের বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন, এ তথ্য তাঁর ১৯৫৮ সালের ডায়েরি থেকে জানতে পারা যায়। তিনি গ্রন্থটির নামও স্থির করেছিলেন 'জারজ' কিন্তু তিনি এই গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত আর রচনা করেন নি।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সমগ্র সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন মূলতঃ ঔপন্যাসিক। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক বিশেষ অবহিত নন। কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। তিনি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যেমন মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর অনুরূপ কুশলতা লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর প্রবন্ধ এবং রম্য রচনাগুলির মধ্যে বৈদগ্ধ্যের

সঙ্গে পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত রুচিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

বিষয়-বৈচিত্র্য সতীনাথের সাহিত্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব। তাঁর উপন্যাস এবং অধিকাংশ ছোটগল্পের মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্য এবং চিন্তার গভীরতা আমাদের বিস্মিত করে। তাঁর অল্প কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যেও তিনি এই বিশিষ্টতাকে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি সতীনাথ কতদূর কৌতূহলী ছিলেন, তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলির শিরোনাম থেকেই সে কথা প্রমাণ হয়। রচনাগুলির প্রথম প্রকাশের ক্রমানুযায়ী একটি তালিকা উদ্ধৃত করা হলো: 'ইংলণ্ডে গান্ধীজী' [নবশক্তি। ৪ ভাদ্র ১৩৩৮], 'প্যারিস ও লণ্ডন' [দেশ। শারদীয় ১৩৫৭], 'ম্যাকারোনির স্মৃতি' [দেশ। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ সাল], 'পড়ুয়ার নোট থেকে' [দেশ। ৩০ আষাঢ় ১৩৬২], 'হায় রবীন্দ্রনাথ' [সাহিত্যের খবর./তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা], 'উপন্যাস ও ভূগোল' [সাহিত্যের খবর। বৈশাখ ১৩৬৬], 'অনুসন্ধানী' [দেশ। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৬], 'আমি ও কালিদাস' [দেশ। ৩ বৈশাখ ১৩৬৭], 'মধুসূদন ও লা ফতেঁন' [দেশ। ৩০ পৌষ ১৩৬৮] 'সসংকোচ' [দেশ। ১ আষাঢ় ১৩৬৯]। এছাড়া সতীনাথের লেখা ডায়েরিটির একটি বিশেষ মূল্য আছে, যদিও তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়নে এই ডায়েরিটি আমরা আলোচনার বাইরে রেখেছি।

উক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'মধুসূদন ও লা ফঁতেন' ও 'পড়ুয়ার নোট থেকে' এই দুটি রচনার ক্ষেত্রে সতীনাথ প্রকৃত গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে বিদেশী সাহিত্য-আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিকের যা প্রধান গুণ, অর্থাৎ মননশীলতা—এই প্রবন্ধদুটির মধ্যে আমরা তার পরিচয় পাই। তিনি দেশ বিদেশের সাহিত্যকে কি পরিমাণ নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন এবং এ ব্যাপারে তিনি কতটা ভাবিত থাকতেন তা এই প্রবন্ধ দুটি থেকে জানতে পারা যায়। দেশী-বিদেশী সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকলেও, রচনার ভাষা কিংবা ভাবে পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁর লেখাকে কোথাও স্পর্শ করেনি। তিনি সাহিত্যিকের মন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন। সতীনাথের প্রবন্ধের আরও একটি বিশেষত্ব হলো—তাঁর রচনা বহু গ্রন্থপাঠের নিদর্শন স্বরূপ হলেও দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ সমালোচকদের গুরুগম্ভীর উক্তির দ্বারা তা ভারাক্রান্ত নয়। সাধারণত বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও সতীনাথ এই ব্যাপারে একজন বিরল ব্যতিক্রম।

ঋজু বক্তব্য এবং বাচনভঙ্গির সরলতায় তাঁর প্রবন্ধগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। নিজস্ব অভিমত প্রকাশে তিনি কোথাও দ্বিধান্বিত থাকেন নি। গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং মননশীল হওয়া সত্ত্বেও কেবল বাচনভঙ্গীর অভিনবত্বে লঘু পাঠকের কাছেও তাঁর প্রবন্ধগুলি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পেরেছে।

সতীনাথের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধটির নাম 'ইংলণ্ডে গান্ধীজী'। প্রবন্ধটি সম্পর্কে তিনি তাঁর বন্ধু বিভূবিলাস ভৌমিককে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন: "নবশক্তি পড় না বোধহয়—ওতে আমার গোটা কয়েক satire বেরিয়েছে। এখন দ্বিগুণ উৎসাহে লিখছি।"[১] রচনাটি যথার্থ অর্থেই satire; কাল্পনিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সতীনাথ গান্ধীজী সম্পর্কে বিলাতের সাধারণ মানুষের যে অজ্ঞতা সেই বিষয়টিকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর ভাষায়: "বিলাতে সকলে খবরের কাগজ পড়ে বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই কেবল একবার চোখ বুলিয়ে নেয়, যে জায়গাটায় থাকে, টেবিল ক্লথ থেকে কী করে মদের দাগ তুলতে হয় বা latest fashion-এর পৃষ্ঠায়।" তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারূপে গান্ধীজীর নাম তারা শুনেছে। ইংরেজের মত এতবড় একটি শক্তিশালী জাতির বিরুদ্ধে সামান্য একজন 'Naked Fakir কি করে মাথা তুলে দাঁড়ালো, সেই সম্বন্ধেই তাদের কৌতূহল বেশী।

শ্রমিক দলের কয়েকজন সদস্য গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ষ্টেশনে এসেছেন। মিঃ চার্চিলও ভদ্রতার খাতিরে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মতে ঠাণ্ডা লাগিয়ে প্লুরিসি করে আলোচনা বানচাল করার উদ্দেশ্যেই গান্ধীজী সামান্য পোষাক পরে বিলাতের মত ঠাণ্ডা দেশে এসেছেন। এটা নিছক নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কৌতূহলী জনতার নানা ধরণের মন্তব্যে রচনাটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। সতীনাথের এই রচনাটি তীব্র ব্যঙ্গাত্মক হলেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে সাধারণ বিদেশীদের অজ্ঞতার চিত্রটি বাস্তবতার সংগে পরিস্ফুট করেছেন। রচনাটিকে প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত এবং তির্যক মন্তব্যে রচনাটি অত্যন্ত সরস হয়ে উঠেছে।

'প্যারিস ও লণ্ডন' প্রবন্ধাকারে রচিত হলেও এটিকে তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্যের পরিপূরক বলা যেতে পারে। তবে 'লণ্ডনে গান্ধীজী' রচনাটির মত এই

রচনাটি তত হালকা ধরণের নয়। প্রবন্ধের ধর্ম রচনাটির মধ্যে কিছুটা রক্ষিত হয়েছে। 'লণ্ডন' এবং 'প্যারিস' এই উভয় শহর পরিভ্রমণ করে লেখক তাঁর নিজের ভাললাগা, মন্দলাগা বিষয়গুলি সুচারুরূপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। দুটি শহরের বাইরের বৈশাদৃশ্য থেকে শহরবাসীর চরিত্রেরও মূলে প্রবেশ করে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। লেখকের এই প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। প্রাঞ্জল ভাষা এবং সরস মন্তব্যে রচনাটি রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

লণ্ডন এবং প্যারিস পশ্চিম ইউরোপের এই দুটি শহরই প্রাচীন। প্রত্যেক শহরেরই নিজস্ব একটা চরিত্র থাকে। লেখক এই দুটি শহরের মৌল পার্থক্যগুলি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন : "তরুণী নাগরীর মতো প্যারিস চায় পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাকে ভালবাসুক।" "লণ্ডন চায় লোকে তাকে করুক ভয়, খদ্দেরে তাকে করুক সম্ভ্রম। করুণা চায় না সে কারও।"

এই মৌলিক পার্থক্যটাই প্যারিস আর লণ্ডনকে ভিন্ন করে রাখে। সতীনাথ লণ্ডন এবং প্যারিসের বাহ্য পার্থক্যটুকু দেখালেও ফরাসী এবং ইংরেজ দুটি জাতির মৌল পার্থক্যগুলি সহজভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। ইংরেজ জাতির সাধারণ পরিচয় তারা ব্যবসাদার। তাই লণ্ডন দিনের শহর, কিন্তু প্যারিস জীবনের দেনা-পাওনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে না, আনন্দ স্ফূর্তিকেই তুলনায় বেশী গুরুত্ব দেয়, তাই প্যারিস দিনের শহর নয় রাতের শহর। প্যারিসের লোকের সঙ্গে লণ্ডনের লোকের কোনো সাদৃশ্য নেই বললেই চলে। লণ্ডন কাজের শহর। প্যারিসের লোকের মত লণ্ডনের লোক অযথা সময় ব্যয় করে না। প্যারিসের লোকের ধারণায় লণ্ডন একটা দ্বীপের রাজধানী হওয়ার জন্য তার মনটা বড় হতে পারেনি, অথচ প্যারিস কেবল একটা দেশের রাজধানী নয় সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতির পীঠস্থান। লণ্ডন এবং প্যারিস পৃথিবীর বিখ্যাত দুটি শহরের মানুষজন, শিক্ষা সংস্কৃতির, বাহ্য পার্থক্যটুকু লেখক সুন্দরভাবে তুলনা করেছেন ; তবুও লেখক বিশেষ কোন শহরের প্রতি নিজস্ব প্রীতির প্রকাশটুকু উহ্য রাখতে পেরেছেন। প্রবন্ধ না বলে, এটিকে লেখকের ভ্রমণকাহিনীর পরিপূরক বলাই সঙ্গত। সতীনাথের পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় রচনাটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সরস মন্তব্য এবং ভাষার সৌন্দর্যে রচনাটি খুবই উপভোগ্য।

'ম্যাকারোনির স্মৃতি' বাংলা ১৩৫৭ সনের ৩ জ্যৈষ্ঠ 'দেশ' পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়। এই লেখাটিকেও 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র পরিপূরক বলা চলতে পারে। 'প্যারিস ও লণ্ডন' রচনাটিতে লেখক দুটি প্রাচীন শহরের বাহ্য বৈসাদৃশ্যগুলির মধ্য দিয়ে এই শহরের নাগরিকদেরও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। 'ম্যাকারোনির স্মৃতি' লেখাটিতে তিনি তাঁর ইতালী ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় এই প্রাচীন শহরটির অতীত গৌরবের সঙ্গে বর্তমানের রূপটি তুলে ধরেছেন। এই লেখাটির মধ্যে একদিকে লেখকের যেমন বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পেয়েছে, অপরদিকে তেমনই তাঁর মননশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ী কেবল পর্যটকের দৃষ্টি নিয়ে কোন দেশ ভ্রমণে যাননি, সেই দেশটির ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞানও তাঁর আয়ত্তে ছিল। ফ্রান্স, ইংলণ্ড কিংবা ইতালি প্রত্যেকটি দেশ সম্পর্কে তাঁর পক্ষপাতহীন বর্ণনা ভ্রমণ-সাহিত্য রচয়িতাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আছে। প্রতিটি দেশের অহঙ্কার ও বিনয় আভিজাত্য ও দীনতাকে বোঝার এত সহজ ক্ষমতা সচরাচর বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায় না। সতীনাথ ভাদুড়ী কেবল নিজে একজন সাহিত্যিকই ছিলেন না—দেশ-বিদেশের সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সম্পর্কেও তাঁর অপরিসীম কৌতূহল ছিল, এই কৌতূহলের জন্যেই তিনি অভিনিবেশ সহকারে বিদেশী সাহিত্য পাঠ করেছেন।

অনেক সময় কোন জাতির বিশেষ কোন প্রিয় খাদ্যবস্তুর সঙ্গে তাদের জাতীয় পরিচয় যুক্ত হয়ে থাকে। তাঁর ভাষায়: "পশ্চিমের লোকে বাঙালীকে বলে মছলিখোর, হিন্দুস্থানীদের আমরা বলি 'ছাতু'। মাদ্রাজীদের আজকাল অনেকে 'তেঁতুল' বলা আরম্ভ করেছে।" তেমনি সারা ইউরোপের লোকের কাছে ইটালিয়ানদের পরিচয় ম্যাকারোনি বলে। কেননা ম্যাকারোনি ইটালিয়ানদের প্রিয় খাদ্যবস্তু। খাদ্যদ্রব্যের পরিচয় দিয়ে রচনাটি অত্যন্ত লঘু ভাবে আরম্ভ করলেও লেখক অচিরেই ইটালির সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের শিল্পসাহিত্যের এক ভিন্ন ধরণের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন: "ইটালির বিষয় নিয়ে একলাইনও লেখেননি এমন বড় কবি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেনে বোধহয় নেই। সেক্সপিয়রের বইয়ের অর্ধেকগুলো তো ইটালির বিষয় নিয়ে লেখা। বুড়ো-বুড়ীদের যেমন কাশীতে গিয়ে মরবার নিয়ম, তেমনি রেওয়াজ প্রায় হয়ে উঠেছিল নামজাদা লোকদের ইটালিতে গিয়ে মরবার। ব্রাউনিং, শেলী, কীটস্, ল্যাণ্ডর, হাঙ্গেরীর নেতা কোসুথ, আরও বহু

বিখ্যাত লোক ইটালিতে দেহ রেখেছেন।"

ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেই দেশের ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করা সতীনাথ ভাদুড়ীর এই শ্রেণীর রচনাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। ইটালির বিখ্যাত শহরগুলির বিশেষত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক সেইসব শহরের নানা তথ্য পরিবেশন করলেও রচনাটি কোথাও তথ্য ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেনি। লেখক স্থানে স্থানে কাব্যরসও সৃষ্টি করেছেন। "ভিসুভিয়াসের পাশেই সেণ্ট ভ্যালেণ্টাইনের অশ্রুপূত নেপ্‌লস উপসাগর, প্রেমিক-প্রেমিকাদের তীর্থের জায়গা। নেপ্‌লস ইউরোপের মধ্যে নব-বিবাহিত দম্পতিদের মধুচন্দ্রমা-যাপনের শ্রেষ্ঠ স্থান বলে স্বীকৃত। কারণ এখানকার গাঢ় নীল আকাশ ও নীল সমুদ্রের ছায়া পড়ে প্রেমিক-প্রেমিকার কটা রঙের চোখও নীল মনে হয় ;…"সমগ্রভাবে একটি দেশকে জানার জন্য সতীনাথের এই শ্রেণীর রচনা-গুলির যথেষ্ট মূল্য আছে।

স্রষ্টা সতীনাথের মধ্যে একজন মননশীল সাহিত্য সমালোচক সতীনাথও বর্তমান ছিলেন, একথা তাঁর ফরাসী সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি থেকে জানতে পারা যায়। তিনি কেবল একজন গ্রন্থকীটের মত ফরাসী সাহিত্য পাঠে আত্মমগ্ন থাকেন নি, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে নিজের দেশের সাহিত্যের মধ্যে তার প্রভাব সন্ধান করেছেন। মধুসূদন দত্তের উপর ফরাসী কবি লা ফঁতেনের প্রভাব আবিষ্কার, সতীনাথের গবেষকের অনুসন্ধিৎসার সাক্ষ্য দান করে। 'পড়ুয়ার নোট থেকে' এবং 'মধুসূদন ও লা ফঁতেন' এই দুটি রচনাকেই যথার্থই সাহিত্য প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। মনন-শীলতার সঙ্গে প্রকাশ ভঙ্গীর সরসতায় প্রবন্ধ দুটি আদর্শ সাহিত্য সৃষ্টি বলে বিবেচিত হতে পারে।

সতীনাথ দেশবিদেশের সাহিত্য সম্পর্কে যে কতখানি কৌতূহলী ছিলেন 'পড়ুয়ার নোট থেকে' প্রবন্ধটির মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রুস্তের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস *A La Recherche du Temps Perdu*-র সঙ্গে জোলার উপন্যাসের গুণগত পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন : "জীবনের আপাত তুচ্ছ ঘটনাগুলোর উপর এত গুরুত্ব, তাঁর আগে আর কেউ দেননি। সেগুলোর সঙ্গেও মানুষের যে মন জড়ানো ; আমি মেশানো। আমার মন বাদ দিয়ে কোনো জিনিষের বা ঘটনার কী মূল্য ? অনুভূতির মিষ্টি রঙে রাঙাতে পারলে ছাইমাটিও সোনা হয়ে ওঠে।"

প্রুস্তের সঙ্গে এমিল জোলার পার্থক্য এখানেই। জোলা তুচ্ছতম জিনিসের আড়ালে নিজের সন্ধানী দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন নি। তিনি খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে গিয়ে অনেক সময়ই ভেজাল দিয়েছেন। এই ভেজাল দিয়েই জোলা যেখানে পাঠকের মন জয় করতে চান, প্রুস্ত কিন্তু সেভাবে পাঠকের মন জয় করতে চাননি। তিনি কেবল প্রুস্ত এবং জোলার প্রসঙ্গই আলোচনা করেন নি, অনেক ফরাসী কবির কবিতা থেকে তাঁদের ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতির সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন।

Leconte de Lisle আমাদের ঠাকুর দেবতা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি Henry Cazalis ব্রহ্মা, বুদ্ধ, শিব ও হিন্দু ধর্মের উপর কবিতা লিখেছেন। এই সমস্ত বিদেশী কবি সাহিত্যিকদের কেবল সাহিত্যের বিশেষত্ব নিয়েই সতীনাথ আলোচনা করেন নি, তাদের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যিকদের অন্যান্য দিকের সাদৃশ্যও খুঁজে দেখেছেন।

সাহিত্যের একটা সর্বজনীন আবেদন আছে। একদেশের সাহিত্য অন্যদেশের পাঠকের কাছে ভালোলাগতে পারে এবং অনুবাদ কর্মের মধ্যেই এটা সম্ভব। সতীনাথ বাংলা সাহিত্যে এই অনুবাদের অভাবের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদিও বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদের অভাবের দিকে অনেকে মন দিয়েছেন; কিন্তু সেখানে ক্লাসিক এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বইগুলির অনুবাদের প্রতি প্রবণতাটা বেশী দেখা যায়। নোবেল পুরস্কার না পাওয়া এমন অনেক গ্রন্থ আছে যেগুলিকে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা প্রবন্ধকার লক্ষ্য করেছেন।

সতীনাথের মধুসূদন ও লা ফঁতেন প্রবন্ধটি যথার্থ একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। অপরিণত বয়স থেকেই তিনি ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদ পড়তেন। পরবর্তীকালে তিনি যত্ন সহকারে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং মূল ফরাসী ভাষায় ফরাসী সাহিত্য পাঠ করেন। সতীনাথ ভাদুড়ী ব্যক্তিগত ভাবে বহু ফরাসীগ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি বাংলা এবং ফরাসী উভয় সাহিত্যই গবেষকের মন নিয়ে পাঠ করেছেন এবং মধুসূদনের নীতি-উপদেশমূলক কবিতাগুলির সঙ্গে লা ফঁতেনের কিছু কবিতার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে একথা প্রমাণ করলেও মধুসূদনের সাহিত্য-প্রতিভাকে খর্ব করেন নি। মধুসূদন এবং লা ফঁতেন উভয়েই ঈশপের গল্পগুলি থেকে তাঁদের নীতিগর্ভ কবিতাগুলির উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন,

এই কারণে উভয়ের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। তিনি মধুসূদন দত্তের 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা', 'কুক্কুট ও মণি' প্রভৃতি নীতিগর্ভ কবিতাগুলির সঙ্গে ফরাসী কবি লা ফঁতেনের 'ওকগাছ ও নলখাগড়া' এবং 'কুক্কুট ও মুক্তা' প্রভৃতি কবিতার সাদৃশ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন। সতীনাথ ফরাসী ভাষা এবং সাহিত্যের একজন ভক্ত পাঠক হওয়া সত্ত্বেও ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ভালোলাগা-মন্দলাগাকে কোথাও গোপন করেন নি। নিজস্ব রুচির মানদণ্ডে বিচার করেই তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীতে ফরাসীদেশের লোকেরা মার্জিত রুচির জন্য সর্বত্র প্রশংসিত হলেও, সতীনাথ ভাদুড়ী ফরাসী ভাষার হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থেও স্থূল রসিকতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। ফরাসী জাতির যে গুণটি সতীনাথকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল—সেটি তাদের মানবপ্রীতি। ফরাসী সাহিত্যিকেরা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সব সময় তাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সমগ্রভাবে ফরাসী সাহিত্যের এবং ফরাসী সাহিত্যিকদের এমন নিরপেক্ষ বিচার বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় সচরাচর দেখা যায় না। প্রবন্ধকার সতীনাথের বিশেষত্ব এই যে, তিনি আবেগকে আশ্রয় করে যুক্তি এবং মননের পথ থেকে সরে যাননি। আবার প্রখর যুক্তি এবং গভীর মনন-শীলতার জন্য তাঁর প্রবন্ধগুলি নীরস তথ্যবহুল হয়ে উঠেনি। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানেই যথার্থ প্রবন্ধ রচনার সার্থকতা। সতীনাথ তাঁর প্রবন্ধ রচনার সময়ে এই বিষয়টি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন ছিলেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'হায় রবীন্দ্রনাথ' ; 'উপন্যাস ও ভূগোল' ; 'আমি ও কালিদাস' আত্মভাবনানিষ্ঠ প্রবন্ধের সার্থক উদাহরণ।

প্রবন্ধ সাধারণতঃ বিশ্লেষণধর্মী তথ্যপূর্ণ ও মনন-চিন্তাসম্মত হয়ে থাকে। প্রচলিত যুক্তি বিচারাশ্রিত প্রবন্ধধারার সঙ্গে সতীনাথের এই প্রবন্ধগুলির সাদৃশ্য নেই; কিন্তু প্রবন্ধের নিয়মনিষ্ঠা কঠিন বন্ধন সামান্য শিথিল করে সতীনাথ এই রচনাগুলিকে অসাধারণ রস-সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। 'হায় রবীন্দ্রনাথ' এমনই একটি রচনা।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও লেখকের মনের দরবারে তিনি আসন পেলেন না; কেন না কারো মনের দরবারে আসন পেতে গেলে নিজের ক্ষেত্র ছাড়াও আর একটি বিষয়ে 'অতিরিক্ত যোগ্যতা' প্রদর্শন করতে হবে। আইনষ্টাইন যেমন অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ হয়েও ভাল বেহালা

বাদক ছিলেন, দিনেমার বৈজ্ঞানিক নীলবোর 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েও আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও কোন একটা বিষয়ে অতিরিক্ত যোগ্যতা থাকা চাই। সঙ্গীত, চিত্রকলা এ সবই তাঁর নিজেরই ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথের 'অতিরিক্ত যোগ্যতা'র বিষয়ে প্রবন্ধকার দীর্ঘ গবেষণা করে জানতে পারলেন উদ্যান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষজ্ঞ। তাঁর লেখা 'নীলমণিলতা' কবিতাটি পড়ে লেখক রবীন্দ্রনাথকে 'অতিরিক্ত যোগ্যতা'র সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। লেখকের ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথ বহুদুর দেশ থেকে এই ফুলের গাছটি এনে নিজের বাগানে পুঁতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অতিরিক্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, আমাদের দেশে একটি নতুন ফুলের আমদানি করার জন্য।

লেখক নিজের বাগানের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে এই গাছের যখন একটি চারা আনালেন তখনই তাঁর ভুল ভেঙ্গে গেল। গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম 'পেট্রিয়া' অতি পরিচিত গাছ। এই গাছটিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এতটা মাতামাতি করার কোনো অর্থ হয় না। লেখকের ভাষায়: "হায় রবীন্দ্রনাথ: আমার বাগানের মালী যা জানে তুমি তাও জানো না! বাতিল করে দিলাম, তোমার সবেধন নীলমণি 'অতিরিক্ত যোগ্যতা'র সার্টিফিকেট-খানাকে।" রম্য রচনা হিসাবে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'হায় রবীন্দ্রনাথ' লেখাটি নতুনত্বের স্বাদ দান করে।

সতীনাথ ভাদুড়ী সমালোচনা সাহিত্য নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন, প্রবন্ধটির নাম 'দুইটি খেলা'। সৎসাহিত্য সমালোচনাকে তিনি সৃজনশীল লেখা বলেছেন। সাহিত্যকে পাঠকের কাছে যথার্থভাবে পৌঁছবার জন্য সাহিত্য সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। সমালোচনার পদ্ধতি ভিন্ন হলেও সকল সমালোচকেরই উদ্দেশ্য সাহিত্যের রস গ্রহণের ব্যাপারে পাঠককে সাহায্য করা। সাহিত্যের অমরত্ব সম্পর্কেও তিনি কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। প্রতিভাবান সমালোচকেরা ক্ষণিক এবং মেকী জিনিস বাদ দিয়ে অমর সাহিত্যকে বেছে রাখেন। সাহিত্য সমালোচকদের প্রতি লেখক এই রচনাটিতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। আধুনিককালে সাহিত্যের দরবারে সমালোচকদের ভূমিকা যে নগণ্য নয় একথা তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন।

সতীনাথের বাগান করার নেশা সর্বজনবিদিত। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন : 'Gardening—aesthetics বা hobby নয়। It is a constantly expanding field of experiment।'[২] নানা জাতের গাছ নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর ফুল লতা পাতা নিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে কালিদাসের প্রকৃতি-প্রীতির তুলনা করেছেন। কালিদাস যেভাবে তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতিকে সাজিয়েছেন, লেখকের ধারণায় তা ঠিক; নয় কেন না : 'আমি অকবি, তাই হিসাবী; কালিদাস কবি, তাই বেহিসাবী। লতা-পাদপ-মিলনের তীব্রতম মুহূর্তের স্বাদ নেবার তাঁর আকাঙ্ক্ষা। দ্যূতক্রীড়ায় অর্থলাভ হলে তিনি বোধহয় একদিনের সম্ভোগেই সেটাকে ব্যয় করে ফেলতেন; আর লটারিতে টাকা পেলে আমি নিশ্চয়ই সেটাকে ব্যাঙ্কে রেখে রয়ে সয়ে খরচ করতাম।' 'আমি ও কালিদাস' রচনাটির মধ্যে তিনি বাগান সাজানোর নানা তথ্যের সঙ্গে কালিদাসের সাহিত্যে প্রকৃতির পরিচয় সহজভাবে সাধারণ পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। সতীনাথের প্রজ্ঞা এবং কবিত্বের সংমিশ্রণে এই জাতীয় রচনাগুলি রমণীয় হয়ে উঠেছে।

পাদটীকা

১. সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'সতীনাথ স্মরণে'।

২. সতীনাথ গ্রন্থাবলী : ৪ : পৃ. 'ব'।

অষ্টম অধ্যায়

আঞ্চলিকতা ও ভাষা

লেখকের জনপ্রিয়তা যে তাঁর রচনার ভাষার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল এ কথা স্বীকার করতেই হয়। বস্তুতঃ লেখকের স্বকীয়তা তাঁর ভাষার দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে বলেছেন "রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়। বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।" বিষয়কে আত্মস্থ করেও তাকে সকলের করে তোলা যে কোনো সাহিত্য সৃষ্টির একটি সুনিশ্চিত শর্ত। এই সকলের করে তোলার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ভাবটি বহন করে ভাষা। ভাষাই জনমানসে প্রবেশের তোরণদ্বারটি সর্বাগ্রে উন্মুক্ত করে দেয়।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তা সম্পর্কে দ্বিমত নেই বললেই চলে। Forster তাঁর *Aspects of Novel* [1970]-এ বলেছেন, The final test of a novel will be our affection for it [p 30]. এই বিচারে শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। জনমনে তাঁর অবাধ প্রবেশের মূল মন্ত্রই হল তাঁর স্বচ্ছন্দ, স্বাদু, সহজবোধ্য আবেগকম্পিত ভাষা। 'বুকের ভিতরটা হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল' হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশের এই অনাড়ম্বর সাবলীলতাই বাংলার ঘরে ঘরে শরৎচন্দ্রকে একান্ত আপনার করে তুলেছে।

শরৎচন্দ্রের সব কয়টি রচনাই যে শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে উচ্চাঙ্গের হয়েছে সে বিষয়ে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর কাহিনীর গতি ও ছন্দ সর্বোপরি এক অনায়াস স্বাদুতা একান্তভাবেই তাঁর ভাষার উপর নির্ভরশীল ছিল।

ভাষা বিষয়কে গৌরবান্বিত করে তাকে সুপরিস্ফুট করে তোলে। অপরিচিত, স্থবির ভাষা বিষয়ের শত বৈচিত্র্য ও গভীরতাকেও আবিল করে তোলে। সহজ, স্বচ্ছন্দ অনায়াসে বোধগম্য ভাষাতেও যে গভীরতম ভাবকে প্রকাশ করা চলে রবীন্দ্রনাথই তার সর্বোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিষয়ের দিক থেকে শরৎচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস একান্তভাবে অভিজাত উচ্চবিত্ত এবং কচিৎ মধ্যবিত্তের জীবনকেই বিষয়ীভূত করেছে। শরৎচন্দ্রই সর্বপ্রথম মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে সাহিত্যে সার্বিকভাবে তুলে

ধরেন। তাঁর রচনার প্রেক্ষাপট ছিল গ্রাম। সেই গ্রামে বসবাসকারী উচ্চবিত্ত জমিদার এবং একান্ত নিঃস্ব প্রজার মধ্যবর্তী মানুষগুলিকে তিনিই সর্বপ্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এলেন। তাঁর সংবেদনশীল ও সঞ্চারমান জীবনদৃষ্টি প্রায়শই নিতান্ত নিঃস্ব মানুষগুলির একান্ত বেদনাকেও ছুঁয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি যতখানি হৃদয়াবেগে উত্তপ্ত ছিল, ততখানি কাঙ্ক্ষিত ব্যাপ্তি লাভ করতে পারেনি। কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলেই তার গতি আবর্তিত হয়েছে। তিনি সূচনা হয় ত করেছিলেন কিন্তু সঙ্কেত রাখতে পারেন নি। কি মননে, কি আঙ্গিকে শরৎচন্দ্র কোথাও কোনো বৈপ্লবিক বিবর্তন আনেননি। পরিবর্তনশীল জীবনভাবনার যুগে আবির্ভূত হয়েও তিনি প্রচলিত ধ্যানধারণাকে অপ্রচলিতবোধে ত্যাগ করেননি। এ ছাড়াও শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক কৃতিত্ব যে নারীচরিত্রসৃষ্টিতে, সেই চরিত্রের মধ্যেও তিনি নতুন কোন দিগন্তের সন্ধান আমাদের দেননি। তিনি উদার ভাবপ্রবণ হৃদয় দিয়ে নারীমুক্তির কথা বলেছেন কিন্তু যুক্তি, মনন দিয়ে তাকে তিনি প্রতিষ্ঠা দেননি। তাঁর সৃষ্ট নারী, সেই সর্বকালের চিরন্তন সেবাময়ী নারী, একালের কোন বিদ্রোহিনী নন।

শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব মূলতঃ ছোট ছোট এক একটি ব্যক্তিচরিত্রের পরিস্ফুটনে, সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধে নয়। চরিত্রকে রূপময় করে তোলার এক অনায়াস কৌশল শরৎচন্দ্রের আয়ত্তে ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আমরা তাঁর 'শ্রীকান্ত : ১ম পর্ব' থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারি : "ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, ও কিছু না সাপ জড়িয়ে আছে, তাড়া খেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিছু না সাপ। শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে বলিলাম, কি সাপ ভাই ? ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে। ঢোঁড়া, বোড়া, গোখরো জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে।

"কোথাও ডাঙা নেই দেখছিস্ নে ?

"সে তো দেখছি, কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল, সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না। নিজের কাজ করিতে করিতে বলিল, কিন্তু কামড়ায় না, ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে। আর কামড়ালেই বা কি করব। মরতে একদিন তো হবেই ভাই।"

এই অংশের প্রতিটি কথায় ইন্দ্রনাথ চরিত্র এমনভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে শ্রীকান্তের সঙ্গে পাঠককেও শিহরিত হতে হয়। ভাষার এই অনবদ্য

রূপদক্ষতা আরও মনোজ্ঞ ও শিল্পসুন্দর হয়ে উঠেছে, একই উপন্যাসে বর্ণিত শ্মশানে অন্ধকার রাত্রি বা সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোনের বর্ণনায়।

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বর্ণনামূলক রীতি ও সংলাপাশ্রয়ী নাট্যরীতি উভয়ই গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসে তাঁর সংলাপ পরিমিত, আবেগগর্ভ ও ইঙ্গিতধর্মী। তাঁর নিজের এ বিষয়ে বক্তব্য ছিল। "Dialogue ছোট হওয়া চাই, নির্দিষ্ট হওয়া চাই, কিছুতেই না মনে হয় এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও বেশী বলেছে। এই হল artistic form-এর ভিতরের রহস্য।"[১] সুতরাং বিষয়-গৌরব কিংবা বৈচিত্র্য নয়, শরৎচন্দ্রের লোকপ্রিয়তার অনেকখানি কৃতিত্বই যে তার অননুকরণীয় ভাষার এ কথা অনস্বীকার্য।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শরতোত্তর কালের অপর একজন জনপ্রিয় কথাশিল্পী। যদিও বিষয়ের পটভূমিকা শরৎচন্দ্রের তুলনায় তারাশঙ্করের বিস্তৃততর তবুও কথাশিল্পী হিসাবে জনমানসে সমাদরলাভে তাঁর ভাষাও অনেকাংশে সহায়ক হিসেবে দেখা দিয়েছে। তারাশঙ্কর মূলতঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের আশা-প্রত্যাশার সংঘাতকেই রূপ দিয়েছেন। তাঁর রচনায় ঐতিহ্যমুখী পল্লীসমাজের সঙ্গে বহির্জগতের আঘাতে ক্রমপরিবর্তনশীলতা এবং সেই দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষরূপ সাহিত্যের বীক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যে ভৌগোলিক অঞ্চলকে তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসের ঘটনাবলীর জন্য নির্বাচন করেছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এই বিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য এইরকম: "এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহসমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দু-চোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।"[২]

এই দ্বন্দ্বের সংঘাতে সমগ্র গ্রাম্য-সমাজ সচকিত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাতে শহরের হাওয়া এসে লাগছে। তাই শরৎচন্দ্রের দরদী ভাবপ্রবণ মনের সৃষ্ট পল্লীসমাজের চেয়ে তারাশঙ্করের গ্রামসমাজ অনেক বেশী বাস্তব। তারাশঙ্কর শুধুমাত্র মধ্যবিত্তের জীবনবৃত্তেই আবদ্ধ থাকেননি। তাঁর জীবন সম্পর্কে বহুমুখী আগ্রহ-বিশিষ্ট মন সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবনচর্যাতেও আন্তরিক এবং উৎসুক পদসঞ্চার করেছে। এ প্রয়াস নিতান্তই কৃত্রিম এবং অসফল থেকে যেত যদি না তিনি তাদের মুখের প্রত্যক্ষ ভাষাকেও

সাহিত্যে অবলীলায় গ্রহণ করতেন। এই ভাষাই তাদের জীবন্ত করে তুলেছে। নসু, নিতাই এবং কয়ালীরা তাই বাঙ্গালীর মনে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে।

জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর যখন লেখেন : 'উপকথার ছোটনদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল। কাহারেরা এখন নতুন মানুষ।' তখন তিনি কাহারের ভাষাই যোগান দেন নসুর মুখে : 'না লো দিদি বোন। আমি কি দেখে এলাম শোন্। দেখে এলাম বাঁশবাঁদির বাঁধের বেড়ে বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে, আর কি কচি কচি ঘাস। আর দেখে এলাম সেই ডাকাবুকোকে।'[৩] কিংবা কলকারখানার বিরুদ্ধে বনওয়ারীর চিত্ত যখন বিদ্রোহ করে তার ভাষা : "টেনে নিয়ে ফেলতে ওই কলকারখানার তেলকালি ভরা অ-লক্ষ্মীর পুরী ধরমনাশা এলাকায়। ছেলেগুলো চাষ ছাড়বে, পিতি পুরুষের কুলধর্ম জলাঞ্জলি দেবে।" এই মৃত্তিকাগন্ধী এবং বিষয়ানুসারী ভাষাই যে তারাশঙ্করের উপন্যাসের অন্যতম প্রাণশক্তি এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

যদিও তারাশঙ্করের অধিকাংশ রচনাই আঞ্চলিক বিশেষত্ব নিয়ে এক বিশেষ আস্বাদের বিষয় হয়ে উঠেছে, তথাপি সেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যটুকু কখনই তাঁর উপন্যাসের স্বাদ গ্রহণের পক্ষে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ, সেই রাঢ় অঞ্চল বাংলাদেশেরই এক অঞ্চল। সেই ভাষাও বাঙ্গালীর পক্ষে অপরিচিত সুদূর কোন ভাষা নয়। বরং জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ও স্বাভাবিক বলে উপন্যাসের গতি আরও সাবলীল হয়েছে।

তারাশঙ্করের রচনায় সব সময়ই মনন অপেক্ষা জীবনই প্রাধান্য পেয়েছে এবং মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোকে রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও পাপ মনে করেছেন। টলষ্টয়ের মত মানুষের অন্তরেই মানুষের বিশ্বাসকে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাঁর এই জীবনানুগ ভাষা এবং ভাবের দিক থেকে একান্ত আন্তরিকতার কারণে পাঠকমনে তিনি অনায়াসে স্থান করে নিতে পেরেছেন।

আর একটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তারাশঙ্করের এক শ্রেণীর উপন্যাস যেমন 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' 'কবি','রাধা' প্রভৃতি অনেকটা কথকতার ভঙ্গিতে বিধৃত। এই উপন্যাসগুলির মাধ্যমে শুধুমাত্র যে লেখকের লোকজীবনের সঙ্গে গভীর সংযোগেরই পরিচয় পাই তাই নয়, এরা লৌকিক সাহিত্যধারার সঙ্গেও লেখকের একটি নিবিড় যোগসূত্রের সন্ধান দেয়। লোকসাহিত্যের সঙ্গে এই চিত্তের আত্মীয়তা এবং

জীবনানুসারী অকৃত্রিম ভাষা তারাশঙ্করের সাফল্যের অন্যতম সূত্রস্বরূপ। আবার জীবন-মশাইয়ের মত একটি প্রখর অভিজাত মহিমময় চরিত্রের সকল দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন: "গুমোটে ভরা বায়ুপ্রবাহহীন গ্রীষ্ম অপরাহ্নের স্থির বনস্পতির মতো"—এই অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত উপমাটির দ্বারা তারাশঙ্কর ভাষা প্রয়োগে তাঁর মূল্যীয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানতঃ ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত।"[৪] শ্রুতি-চিত্রময় এমনই একটি পরিবেশের সার্থক রচয়িতা বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রকৃতি-চেতনা রবীন্দ্রনাথের মত মর্ত্যপ্রীতির প্রকাশে বা কবি চিত্তের উষ্ণতায় অনুরঞ্জিত ছিল না। জীবনানন্দের সংকট-বিধুরতা কিংবা কুমুদরঞ্জনের নিরুদ্বিগ্ন পল্লীপ্রীতিও তাঁর চিত্তের দোসর নয়। বিভূতি-ভূষণের প্রকৃতি তাঁর কাছে জীবনের অংশ রূপেই প্রতিভাত। তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি বাংলার প্রকৃতিকে কখনও কখনও জীবনের পরমসত্য রূপে ঈশ্বর ভাবনায় উত্তীর্ণ করেছে, আরণ্যকের নায়ক একস্থানে বলেছে: "কতবার এই ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ-থমকানো সন্ধ্যায় এই মুক্ত প্রান্তরের সীমাহীনতার মধ্যে কোন্ দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি এই মেঘ,এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে,ভানুমতী, মহলিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড় পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত।"[৫]

লেখকের জীবনবোধের সঙ্গে বাচনভঙ্গিমাও দ্রষ্টব্য। বিশাল প্রকৃতির রহস্যময়তার সঙ্গে অলৌকিক প্রতিবেশের বিশ্বাসযোগ্যতা ফুটিয়ে তোলবার জন্য ভাষার মধ্যে যে ভাবগম্ভীর মহিমা রক্ষা করতে হয়, তাতে বিভূতিভূষণ ছিলেন আশ্চর্য রকমের সচেতন। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জীবনের পাশাপাশি মিলে রয়েছে যে অরণ্য-জীবন, সেখানে লেখক সুকৌশলে গল্পের ঋজুতার সঙ্গে অপূর্ব কাব্যময় এক ভাষা প্রয়োগ করেছেন: "এর জ্যোৎস্না, এর বন বনানী, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য এর মানুষজন, পাখির ডাক, বন্য ফুলশোভা সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর এক শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কখনো কোথাও পাই নাই।" বিভূতি-ভূষণের ভাষার এই অনবদ্য প্রসাদগুণ পাঠকের মনেও এক আশ্চর্য শান্তির সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে। বর্ণিত অঞ্চলগুলির নামের মধ্যে মহাপ্রাণ

বর্ণের আধিক্যও রহস্যকে নিবিড় করে তুলেছে। ভাষা ব্যবহারে এই সচেতনতাও বিভূতিভূষণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

চিত্ররূপময় সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস। অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপ দানের একটি বিশিষ্ট রীতি এই উপন্যাসে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে ছোট ছোট ঘটনার ধারাবাহিক চিত্র, এর কাহিনী বিন্যাসে যে কৌতূহল সৃষ্টি প্রক্রিয়া তিনি অবলম্বন করেছিলেন তা বাঙালী পাঠককে আজও আবিষ্ট করে রাখে।

একথা অনস্বীকার্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় তাঁর রচনায় স্থান পায়নি। সমসাময়িক ঘটনাবলী, রাজনৈতিক আবর্তন ও সামাজিক বিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অনেকাংশে উদাসীন ছিলেন। 'অশনি সঙ্কেত' এবং 'অনুবর্তন' ছাড়া তাঁর অন্য কোনও উপন্যাসে কোন সামাজিক অস্থিরতা বা বিপর্যয়ের আভাসমাত্র নেই। এক সুগভীর মর্ত্যপ্রীতি বিভূতিভূষণের সাহিত্যকাশের ধ্রুবতারা স্বরূপ। তাই 'দেবযানে' যতীন স্বর্গের তৃতীয় স্তরে স্থান পেয়েও পুনর্জন্ম কামনা করে, চেয়েছে : "এই পৃথিবীর মাটিতে পৃথিবীর এই মায়ের কোলে সুখে দুঃখে সে আবার যেন মানুষ হয়।"[৩] এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলসূত্রটুকু অবশ্য তাঁর যুগচেতনার মধ্যেই নিহিত ছিল।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনা, অধ্যাত্মভাবনা, প্রেমচিন্তা সবকিছুর মধ্যেই দ্বন্দ্বহীনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবু তাঁর বক্তব্য অতুলনীয়ভাবে স্পষ্ট। তাঁর রচনারীতিও স্বচ্ছ, নির্ভার, শান্ত স্নিগ্ধতামণ্ডিত ও শ্রীময়। তিনি ছিলেন একান্তভাবে সরলতার পক্ষপাতী, তাই তিনি ক্রমশঃ প্রথম দিককার জটিল বাক্যগঠন প্রণালী সংক্ষিপ্ত হ্রস্ব ও অধিকতর গতিশীল করে তুলেছেন। শব্দপ্রয়োগ বিষয়েও তিনি কোনও বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনেননি। অপ্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি স্বভাবতই অনাগ্রহী ছিলেন।

বিভূতিভূষণের বক্তব্যে কোন বিশাল ক্রান্তিদর্শী চিন্তা নেই। বৃহত্তর সমাজজীবনের কোনও মুক্তির ইঙ্গিত, ব্যক্তিজীবনের কোনও দুর্বহ দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয়ে আসেনি। তাঁর উপন্যাসের বিষয়ে ও গঠনে সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে, কিন্তু চিন্তায় যে শৈথিল্য ছিল হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি তাকে পরিপূরণ করে নিয়েছেন। তাই 'আরণ্যক', 'পথের পাঁচালী' কিংবা 'ইছামতী' পাঠকালে এ-প্রশ্ন যে ক্ষণকালের জন্যেও উচ্চারণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত

হতে হয় বিভূতিভূষণের শিল্পকীর্তির সেটাই সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

বিভূতিভূষণ যেমন ভাষা ব্যবহারে রক্ষণশীল ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনই এ বিষয়ে সংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিবাদী ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বাক্যে: "সিঁথির লাল ঘায়ের যন্ত্রণায় সীতার ছটফটানি তুমি যদি দেখতে সুমতি" ('ধাক্কা') যে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার ধাক্কা আছে তা তিরিশ দশকের বাংলা উপন্যাসের প্রতিনিধি স্বরূপ। বস্তুতঃ এই দশকের ঔপন্যাসিকের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যরীতিই পরবর্তীকালের লেখকদের সমধিক প্রভাবিত করেছে। সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে যেমন বলা হয় তিনি লেখকের লেখক ছিলেন তেমনই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক দিক দিয়ে অন্ততঃ একটি সুনির্দিষ্ট ভাষারীতি গঠনের ব্যাপারে অগ্রণী লেখক বলা হয়। পরবর্তী লেখকদের জন্য তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ভাষা-ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন। তাঁর ভাষায় তারাশঙ্করের তথ্যনিষ্ঠা বা বিভূতিভূষণের ভাবমুগ্ধতা নেই, আছে চরিত্রোপযোগী মন্থর গাম্ভীর্য।

বিভূতিভূষণ আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েও এর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পক্ষান্তরে এই যুগের মর্মমূলে প্রবেশ করে তার সমস্ত সংঘাত, যন্ত্রণা গৌরব ও মহিমাকে নির্মম বিজ্ঞানীর মত ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছেন। তার এই সন্ধানে তিনি পূর্ববর্তী সকল ঔপন্যাসিককেই অতিক্রম করে গেছেন এমন কি নিজের প্রাথমিক ভাব দুর্বলতাগুলিকেও ক্রমশঃ বর্জন করেছেন। শেষ জীবনে নিজের সাহিত্যিক সার্থকতা বিচার করে তিনি লিখেছেন: "ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারিনি কিন্তু বাংলাসাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়।"[৭]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কথ্য ভাষার নিপুণ প্রয়োগ ও জেলেপাড়া নিয়ে বর্ণনার মধ্য দিয়ে যে বাস্তবতার সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়ে তাঁর শক্তিমত্তা সর্ববাদিসম্মত। এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর জীবনাচরণের বাঁকে বাঁকে ছড়া-গান প্রভৃতি লৌকিক সংস্কৃতির সাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়ে বাস্তবতার ভিত আরও সুদৃঢ় হয়েছে। যেমন:

'আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোন্ধু কত ঘুমাইবা।

বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা অকাল ফসল রোও
মিয়া কত ঘুমাইবা।'[৮]

গানটির রূপকের মধ্য দিয়ে হোসেন মিঞার নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের প্রতি চিরকালীন বিরুদ্ধতা আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিষয়োচিত ভাষাব্যবহারই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। যে নিরাবেগ ঋজু গদ্যভঙ্গির জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত সেই ভঙ্গিই আবার কবিত্বের আমেজে স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে 'দিবারাত্রির কাব্যে'। লক্ষণীয় বিষয় এই যে সেই কবিত্ব কোন সচেতন প্রয়াসে সিদ্ধ নয়, বিষয়ের মাধ্যম হিসেবে স্বতোৎসারিত। তাঁর ভাষা সর্বক্ষেত্রেই বক্তব্যকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে। অকারণ পল্লবগ্রাহিতা তাঁর একান্ত স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। বক্তব্যবিষয়ে অচঞ্চল নিষ্ঠা ও বিশ্বাস তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনকে সকল কৃত্রিমতার উর্ধ্বে স্থাপন করেছে। কষ্টকল্পিত ভাষার দ্বারা সেই অকৃত্রিম বিষয় কখনও আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি, বরং স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর প্রাখর্য লাভ করেছে। এই কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা-সাহিত্যকে অভ্যস্ত গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দিয়ে এক অভিনব দিগন্তের সূচনা করতে পেরেছিলেন।

সুতরাং বর্তমান আলোচনায় একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেল যে শরৎচন্দ্রের চিত্তদ্রাবী, তারাশঙ্করের জীবনানুসারী, বিভূতিভূষণের ভাবতন্ময় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ানুগ ভাষাই তাঁদের শিল্পসার্থকতার অন্যতম কারণস্বরূপ। পক্ষান্তরে সতীনাথ ভাদুড়ী একজন যথার্থ মননশীল এবং উচ্চকোটীর ঔপন্যাসিক হওয়া সত্ত্বেও ভাষার কারণে অধিক জনসমাদরলাভে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর ভাষায় শক্তি বা বুদ্ধিমত্তার অভাব কখনও ঘটেনি। জীবনের উত্তাপও তাতে যথার্থ সঞ্চারিত, কিন্তু সে ভাষা সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে অনেকখানিই অনধিগম্য ছিল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে প্রখর বাস্তব চেতনাই তাঁর ভাষার বিশিষ্টতার মূলসূত্র তিনি একটি বিশেষ অঞ্চলকে তাঁর রচনার পটভূমিকা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং সেই অঞ্চলের আচার ব্যবহার রীতিনীতির এক সার্বিক পরিচয় তাঁর লেখার মধ্যে রেখে গেছেন।

মানুষের বিচিত্রতর সমস্যা, জীবনের বহু জটিলতা, মানবমনের অপার রহস্য, নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, সংঘাত, সামাজিক আবর্তে অঙ্কুশিত

মানবজীবন, ব্যক্তিত্বের সংঘাত, সমাজধর্ম, প্রকৃতি প্রভৃতিকে নিয়েই উপন্যাসের বিষয়বস্তু গড়ে উঠে। মানুষের বহুবিধ পরিচয় প্রদান করাতেই ঔপন্যাসিকেরা আনন্দ পেয়ে থাকেন। এই মানুষের পরিচিতির সম্পূর্ণতা আনতে লেখকরা অনেক সময়ই তার পারিপার্শ্বিকতাকে অস্বীকার করতে পারেন না। মানুষের আন্তর্জাতিক পরিচয় থাকলেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তার জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। দেশে দেশে প্রকৃতি ভিন্ন। কোন বিশেষ দেশের পরিচয় ধরা পড়ে সেই দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের উপর। মানুষও সম্পূর্ণ হয় তার অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে। বাস্তব সম্পর্কে বিশ্বস্ত লেখক মাত্রেই কিছু পরিমাণে আঞ্চলিক অর্থাৎ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র-চিত্রণে আঞ্চলিক দোষগুণগুলি তাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণেও থাকে। যদিও মানুষের পরিচয় এক নয়, তবু আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রাদেশিক রূপটিই বেশী পরিমাণে থাকে। সতীনাথ ভাদুড়ী বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাঁর পরিচিত অঞ্চলের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হওয়াই স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যের অপর একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত বহু সাহিত্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। পরিবেশ পরিচিতি, স্থানীয় জন-জীবনের লৌকিক আচার-আচারণ, অঞ্চল-ভেদে, প্রাকৃতিক ঋতুর ভিন্নতায়, এমনকি সংলাপে স্থানীয় রীতি-নীতির ছাপ তারাশঙ্করের অধিকাংশ উপন্যাসের সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট ভাবে আছে। বিভিন্ন দিকে তারাশঙ্করের সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর সাদৃশ্য এ বিষয়ে লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকলেও উভয়েই কংগ্রেসের রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন; রাজনৈতিক কারণে উভয়েরই কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। উভয়েই নিজ অঞ্চলের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল মূলে। তারাশঙ্করের জীবনের ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত ছিল। তিনি নিজে উচ্চবংশোদ্ভূত হলেও নাগরালি তাঁর মধ্যে কম ছিল। Aristocrat বলতে যা বোঝায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তা ছিলেন না। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মর্মমূলে প্রবেশ করার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল সহজাত। তিনি কোন বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে আসেন নি। সেইজন্য তাঁর সাহিত্যে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কেবল তাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নয়, দেশ কাল পরিবেশ অঞ্চলের ঊর্ধ্বে যেখানে মানুষের

পরিচয় শুধু প্রাদেশিক নয়, মানব জাতি হিসাবে। তাঁর কাছে ধাত্রী এবং ধরিত্রী একই। অর্থাৎ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক রচনার প্রধান বিশেষত্ব হল তিনি বিন্দুতে সিন্ধুকে ধরে ছিলেন, আঞ্চলিক খণ্ডতায় অখণ্ড বিশ্বকে উপস্থাপিত করেছিলেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর পার্থক্য এখানেই। সতীনাথ ভাদুড়ী পূর্ণিয়া জেলার ভাট্টা বাজার পাড়ায় থাকতেন। শিক্ষা জীবনের সূত্রপাত পূর্ণিয়া অঞ্চলেই এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. এবং আইন পাশ করার পর আইনজীবী পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আইন ব্যবসায়েই আত্মনিয়োগ করেন। সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী খুবই গম্ভীর রাশভারী লোক ছিলেন। সতীনাথ ভাদুড়ী পিতাকে ভয় করতেন এবং অনেক সময় চুপি চুপি খিড়কী দরজা দিয়ে যাতায়াত করতেন। সহপাঠীরাও ভয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতো না। সতীনাথকে বাড়ী থেকে ডাকতে গেলে তারা ভয়ে ভয়ে দূর থেকে খোঁজ নিতো। সতীনাথ যখনই ক্লাসের প্রথম পুরস্কার নিয়ে আসতেন, ইন্দুবাবু গম্ভীর ভাবে বলতেন, 'বেশ আছে, রেখে দাও'। পিতার এই রাশভারী এবং অমিশুক স্বভাব সতীনাথ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি খুব মিশুক প্রকৃতির ছিলেন না। অধ্যয়নের মধ্যেই তাঁর সময় অতিবাহিত হোত। জন-জীবনের সঙ্গে আন্তরিক ভাবে না মিশতে পারলেও তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। যার ফলে বিহারের বিশেষ অঞ্চলের অবিকল প্রতিবিম্ব তুলে ধরতে পেরেছিলেন। আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যে তারাশঙ্করের সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর পার্থক্য এখানেই। তাঁর জীবনাচরণের আত্মনিমগ্নতা সাহিত্য-জীবনে সহজেই প্রতিভাত হয়েছে।

সাহিত্যে 'আঞ্চলিক' কথাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। যে কোন লেখকের রচনাতেই তাঁর নিজস্ব কোনো পরিবেশগত একটি পরিমণ্ডল থাকে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা শুধুমাত্র প্রেক্ষাপটই রচনা করে। যেমন : "শ্রাবণ মাসের সকালবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কলেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় মাছ তরকারির চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান

জ্বালাইবার ধোঁওয়া উঠিয়াছে কিন্তু তবু এত বড় এই যে কাজের সহর কঠিন হৃদয় কলিকাতা ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আলোকের ধারা আজ যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের সূচনায় কলিকাতা শহরের এই বর্ণনা যে অনুষঙ্গ মাত্র তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসেও কলিকাতার উল্লেখ আছে কিম্বা 'শেষের কবিতা'য় দার্জিলিং-এর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন চরিত্রেরই স্থানিক পরিচয়ই একমাত্র পরিচয় নয়। তারা একই সঙ্গে ঘরের এবং বাইরের, তাই তাঁর নায়ক বিশ্বের অধীশ্বর 'নিখিলেশ'।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বচেতনা পরবর্তীকালে উত্তরসাধকদের মধ্যে যথার্থভাবে সঞ্চারিত হতে পারেনি। কল্লোলের প্রবাহে বস্তুতান্ত্রিকতার নব্য উৎসাহে আঞ্চলিক ভূগোল স্পষ্ট রূপ পেতে লাগল। ফলে বাংলা সাহিত্যে গ্রাম-জীবনের রূপকার একদল 'আঞ্চলিক' লেখকের আবির্ভাব হল। কিন্তু এদের অধিকাংশই বাস্তবতার মোহে অঞ্চল বিশেষের অনুপুঙ্খময় বর্ণনায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তি, বর্ণনার সাবলীলতা ও রীতি আকর্ষণীয় হলেও তাঁরা সকলেই 'আঞ্চলিক' নামে অভিধেয় নয়। 'আঞ্চলিক' সংজ্ঞা শুধু মাত্র তাঁর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে যখন সেই বিশেষ লেখকের সৃষ্ট চরিত্রগুলি সেই বিশেষ পরিবেশের সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে, তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সেই বিশেষ আঞ্চলিক ভিত্তির স্বাভাবিক প্রতিশ্রুতি হিসেবে দেখা দেয়। এবং তখনই তা বিশেষ অঞ্চলের হয়েও দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে যায়। এইজন্যই কিউবার সামুদ্রিক পরিবেশের বিশ্বস্ত চিত্র হেমিংওয়ের *Old man and the sea* নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে সার্বজনীন স্বীকৃতি পায় এবং টমাস হার্ডির 'ওয়েসেক্স নভেলস'-এর সুদূর প্রসারী আবেদনও অস্বীকৃত হয় না।

বাংলা-সাহিত্যেও কয়েকটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। তার মধ্যে শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠির দেশ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া পল্লীজীবনের রূপকার হিসাবে শরৎচন্দ্রের রচনায় হুগলী জেলা, মনোজ বসুর রচনায় দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন ও বাদা অঞ্চল সহ খুলনা-যশোহর জেলার চিত্র পাওয়া যায়। বনফুলের রচনায় পাই বিহারের গ্রামজীবনের কিছু খণ্ডচিত্র। বস্তুতঃ তারাশঙ্কর যে অর্থে আঞ্চলিক

ছিলেন, উল্লিখিত কোন লেখকই সেই অর্থে আঞ্চলিক নন। তারাশঙ্কর (যাঁর বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে) মানিক, শৈলজানন্দ, বিভূতিভূষণের রচিত আঞ্চলিক রচনাগুলির সঙ্গে তুলনা করলে সতীনাথের আঞ্চলিকতার বিশিষ্টতার স্বরূপটি নির্ধারণ করা যাবে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটান। কয়লাখনি অঞ্চলের সজীব বাস্তব চিত্রনের মধ্য দিয়ে তিনি একটি বিশেষ ধরণের রচনার সূত্রপাত করেন। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব পরবর্তীকালের অনেকেই স্বীকার করেছেন। তারাশঙ্কর, মানিক প্রভৃতি লেখকেরা কয়লাকুঠির রূপকার হিসাবে শৈলজানন্দের সার্থকতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. সুকুমার সেন বলেছেন : "স্থান-কাল-ভাষা পরিবেশের সৌষ্ঠব যাহাকে ইংরেজীতে বলে 'লোকাল কালার' তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণভাবে দেখা গেল।"[৯]

শৈলজানন্দের বাল্যকাল রানীগঞ্জ অঞ্চলে কেটেছে। সুতরাং এই অঞ্চলটি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল যথেষ্ট। এছাড়া নির্যাতিত দরিদ্র মজুরদের প্রতি তাঁর অসীম সহানুভূতিও ছিল। কিন্তু তাঁর রচনায় আঞ্চলিকতা বিষয়ের পরিবেশগত বিন্যাস মাত্র, ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত নয়। শৈলজানন্দ নিজে তাঁর সাহিত্য সাধনার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন এই ভাবে "কয়লাকুটির দেশ। রবিবার দিন ছুটি পেলেই দুজনে (অন্যজন নজরুল) দুটি খাতা হাতে নিয়ে চলে যাই বহুদূরে। একদিন কয়লা খাদের পাশে সাঁওতালী কুলি ধাওড়ার কাছে আমরা বসে বসে গল্প করছি আমার বেশ মনে আছে দূরে প্রকাণ্ড চিমনির মুখে ধোঁয়া উঠছে, মুখে হেড গিয়ারের চাকা ঘুরছে, তার উপর পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে, মাটির নীচে থেকে কয়লা বোঝাই টবগাড়ী উঠছে। দূরে একটি আম বাগানের পাশে হঠাৎ কোথায় যেন মাদল বেজে উঠলো। এই সব মিলিয়ে আমার মনের মধ্যে একটি অপূর্ব ভাব জাগলো যে আমি আর কিছুতেই তাকে ভুলতে পারলাম না। বাড়ী ফিরে এসেই গল্প লিখতে বসে গেলাম, ...আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লার খনি এবং চরিত্ররা সব সাঁওতাল কুলি মজুর।"[১০]

লেখকের জবানবন্দীতেই আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, কয়লাখনি তাঁর গল্পের পরিমণ্ডলমাত্র, কিন্তু অন্তরাত্মা নয়। কল্লোল যুগের পক্ষে আশ্চর্য সংযম,

সহানুভূতি এবং পরিবেশের সৃজনে মুন্সীয়ানার জন্য তিনি নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাবার যোগ্য। শৈলজানন্দের রচনায় অঞ্চলচেতনার দুটি দিক আছে এক-টিতে রানীগঞ্জের কয়লাখনি ও তার আদিমতা, অপর দিকে রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম্যজীবন এবং পল্লীবাংলার চিরন্তন রূপ। তথ্য ও বিষয়ের যে সম্পৃক্তি তার রূপায়ণে নিষ্ঠা শৈলজানন্দের ছিল না। তাই বাস্তবচেতনার কষ্টিপাথরে তাঁর অঞ্চলগত নির্মোকটি সহজেই খসে পড়ে। এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: "শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আনেনি।"[১১] এই সঙ্গে আমরা এও জানি যে কল্লোলযুগে অভিনব বিষয়বস্তু নিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার মধ্যেই শৈলজা-নন্দের অঞ্চল চেতনা মূলতঃ নিবদ্ধ ছিল ।

পক্ষান্তরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যপ্রেরণা কোন স্থানিক চেতনা সম্ভূত নয়। তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনে বাস্তবতার অন্বেষণ করেছেন। তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' আঞ্চলিক উপন্যাসের দিগন্ত স্পর্শ করলেও কোনও বিশেষ আঞ্চলিক পরিবেশের মধ্যে তিনি তাঁর লেখনীকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বিভূতিভূষণের সাহিত্যে দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা ও যশোহর এবং তারাশঙ্করের সাহিত্যে রাঢ় অঞ্চল যেমন আদ্যন্ত পুনরাবৃত্ত হয়েছে মানিকের রচনায় কখনই তা হয় নি। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে 'পদ্মানদীর মাঝি'-তে আঞ্চলিক জীবন-চিত্রনে মানিক যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন তা বিস্ময়কর। প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় একাত্মতার বিশ্লেষণে তাঁর সমাজসচেতন বাস্তব দৃষ্টির যে সংবেদনশীলতা তা অবিস্মরণীয়। এই উপন্যাসের অঞ্চল-চেতনা অনেক বেশী বাঙ্ময় এবং বিশ্বস্ত। বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে: 'His East Bengal rivers were much more than a novel-setting, they were another horizon of the mind, his villages, described in universal termes, were yet clear in every local feature, his poor people were not what the richer thought of them ; his illeterates did not think the thought of the writer.'[১২]

'পদ্মানদীর মাঝি'তে পদ্মানদী এবং তার তীরবর্তী মাঝিদের যে জীবনকথা অঙ্কিত হয়েছে তা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত। কিন্তু তবু কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক জীবনের মধ্যে তাঁর নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সংহত থাকতে চায়নি ;

কিন্তু বিভূতিভূষণের রচনায় নদীয়া, যশোহর এবং দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার একটি অঞ্চল বলয় বারবার আবির্ভূত হয়েছে। তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসটি অঞ্চল চেতনার একটি নিদর্শন। একটি বিশেষ অরণ্য পরিবেশে তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে স্থাপিত করেছেন। এই চরিত্রগুলি একান্তভাবে স্থানিক পরিচয় সম্বলিত। তাদের জগৎ ও জীবন ওই পরিচিত পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। লেখকের সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসী মেয়ে ভানুমতীর কথোপকথনের মধ্যেই তার ইঙ্গিত রয়ে গেছে :

"ভানুমতীর পৃথিবী কতটুকু জানিতে ইচ্ছা হইল। বলিলাম ভানুমতী কথনো কোন শহর দেখেছ ?

না বাবুজী।

দুয়েকটা শহরের নাম বলতো ?

গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।

কলকাতার নাম শোননি ?

হ্যাঁ বাবুজী।

কোন্ দিকে জান ?

কি জানি বাবুজী।

আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান ?

আমরা গয়া জেলায় বাস করি।

ভারতবর্ষের নাম শুনেছ ?

ভানুমতী মাথা নাড়িয়া জানাইল সে শোনে নাই। কখনও কোথায়ও যায় নাই চক্‌মকিটোলা ছাড়িয়া। ভারতবর্ষ কোন দিকে ?"

এই সংলাপের মধ্যে দিয়ে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে লেখক অনির্দিষ্ট ভারতবর্ষের চেয়ে কোনও নির্দিষ্ট বিশেষ অঞ্চলকে তার রূপরসগন্ধবর্ণসহ চিত্রিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি তার প্রিয় পরিচিত পরিমণ্ডলেই নিজেকে সংবদ্ধ রেখেছেন। যদিও বিপুলব্যাপ্ত পৃথিবীর আকর্ষণ বিভূতিভূষণের শিরা-স্নায়ুতে ; তথাপি ভারতের নানাপ্রদেশ, বিচিত্র অরণ্যাঞ্চলে তিনি যথাসাধ্য পরিক্রমা করেছেন। শারীরিক ভাবে যেখানে যাওয়া সম্ভব হয়নি, সেখানে সাধ্য মতো মানসভ্রমণ করেছেন ও কিন্তু সমস্ত বহির্মুখীনতা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের শেষ তীর্থক্ষেত্র তাঁরই নিশ্চিন্দিপুরের সেই জলঝাঁপি, সেই মুচুকুন্দ ফুল, সেই বৃষ্টিভেজা বনের সোঁদাগন্ধ, ঝড়ের হাওয়ায় গাছের

ডালে দোলা লাগা দুটি বন ধুঁদুল।

বিভূতিভূষণ গ্রাম জীবনের রূপকার, তার দীনতা হীনতা সবই তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন ; কিন্তু তাঁর জন্ম তাঁর রচনায় কোথাও কোন তিক্ততা নেই। পক্ষান্তরে তারাশঙ্করের রচনা "রাঢ়ের কঙ্করাকীর্ণ জলহীন প্রান্তরে মধ্যাহ্ন সূর্যের দাহ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। লোভ, লালসা, কামনা ও স্নেহ সব কিছুই যেন এই খররৌদ্রের রৌদ্ররসে অভিসিক্ত।"[১৩]

তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতা একমুখী এবং সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যেখানেই তিনি তাঁর পরিচিত পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করেছেন, সেখানেই তাঁর ভাষা ও কল্পনা কৃত্রিমতার ভারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। "তারাশঙ্করের শিল্পী মানসের কেন্দ্রীয় বৃত্তভূমিতে আছেন পল্লীর ব্রাহ্মণসমাজ। কিন্তু তাঁর জীবনবোধ ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হয়েছে আপামর সর্বসাধারণের মধ্যে।...তারাশঙ্করের চেতনা স্পর্শ করল সমাজের 'ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন' অন্ত্যজ স্তরকে। সমাজের সর্বস্তরে সম্প্রসারিত হয়ে জীবনবৃত্ত পূর্ণতা পেল। এই অর্থেই তারাশঙ্কর পূর্ণাঙ্গ সমাজজীবনের প্রথম কথাশিল্পী। দেশকালের বিশিষ্ট প্রেক্ষাপটেই তাঁর অধিকাংশ গল্পের উদ্ভব। মৃত্তিকাসম্ভব মানবজীবনই তাঁর অন্বিষ্ট। এই অর্থেই তাঁর সাহিত্যকে বলা হয় আঞ্চলিক। বিশেষ অঞ্চলের নিসর্গ প্রকৃতি এবং তারই প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত মানুষের সুখদুঃখের বাস্তব কাহিনী স্বভাবতই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই সত্য।"[১৪]

তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' সর্বাধিক আঞ্চলিক লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস। মানুষ ও প্রকৃতির সুগভীর একাত্মতা এবং বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞাত জনজীবনের যে নিবিড় অন্তরঙ্গ চিত্র এই উপন্যাসে পাই তার তুলনা বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল। ব্রাত্য মানুষের কথাশিল্পী তারাশঙ্কর কাহারদের উৎসব, আচার, আচরণ, লৌকিক সংস্কারাদি, আশ্চর্য লিপিকুশলতায় বিবৃত করেছেন : "কাহার পাড়ায় স্বামী যদি স্ত্রী থাকতে বিয়ে করে, তবে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে শাঁখা আর নোয়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীকে গাল দিতে দিতে চলে যায়—অন্য কোন কাহার মরদের ঘরে গিয়ে উঠে। সতীনের সঙ্গে ঘর কাহার মেয়েরা করে না। কাহার পাড়ার মেয়েরা ফেলনা নয়, স্বামীকে তাদের ভাত দিতে হয় না, নিজেরাই তারা খেটে খায়।" শুধু কাহার সমাজের রীতিনীতিই নয় তাদের উৎসব পূজা পার্বণ প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয়ও এই উপন্যাসে সার্থকভাবে বর্ণিত হয়েছে :

"নবান্নে এবার হাঁসুলি বাঁকের বাঁশবাঁদিতে খুব ধূম গিয়েছে। নবান্নে তাদের ধূম চিরকালের। সদ্‌জাতের ধূম অনেক, এক পুজোর পর আর এক পুজো। তাতে কাহারেরা আনন্দ করে, পূজাস্থানে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তাদের নিজের ঘরে সে ধূমের দেবতার চরণের চাপ পড়ে না। ওদের ধূম, গাজন, ধরম পুজো, আমূর্তি অর্থাৎ অম্বুবাচী, মা বিষহরির পুজো, ভাদ্রমাসে ভাঁজো পরব, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে লক্ষ্মী। মোটমাট সাতটা পরব।" কিন্তু তবু তারাশঙ্করের অসামান্য সারস্বত সাধনাকে 'আঞ্চলিক' অভিধার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। খণ্ডিত দেশ কালকে অবলম্বন করে রচিত হলেও এক অখণ্ড মানবসত্তাই তারাশঙ্করের ধ্যানের বিষয় ছিল, অর্থাৎ: "তারাশঙ্করের সাহিত্যে মানুষ তার আদিম প্রবৃত্তি যুগসঞ্চিত সংস্কার এবং বংশানুক্রমিক জীবিকা অবলম্বন করেই চিরকালের মানুষ। তাই তারাশঙ্কর বিশেষ ভাবে রাঢ়ভূমির কথাকোবিদ্ হয়েও বাংলার সার্বভৌম জীবনশিল্পী।"[১৫]

কবি-সমালোচকের এই উক্তি বিশ্বের যে কোনো সার্থক আঞ্চলিক সাহিত্যকারের ক্ষেত্রেই সুপ্রযোজ্য। প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করে বলা হয়েছে: 'In spite of the loving exactitude with which he details the characteristic features of wessex life, he never lets us forget that this wessex life is part of the life of the whole human race and is inextricably connected with it.

The Scale of Hardy's drama is as vast its setting is confined'.[১৬]

আরও এক বিষয়ে টমাস হার্ডির সঙ্গে তারাশঙ্করের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই তাঁদের সাহিত্যে চিত্রিত জীবনাচরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। শিশুকাল থেকেই হার্ডির মতই তারাশঙ্করও গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে অন্তরঙ্গ ছিলেন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির পাশাপাশি অতিবাহিত করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন: "ওই সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি। পথে নসুবালার সঙ্গে দেখা হয়, সে চুল বেঁধে নাকছাবি পরে থমকে দাঁড়ায় বলে, হেই মাগো কখন এলা, বলি মনে পড়ল আসতে? ছেলেরা ভালো আছে? তোমার শরীর

এমন কাহিল হল ক্যানে।”[১৭]

তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শৈলজানন্দ কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক রচনায় অঞ্চলানুগত্য জনসমাদর লাভে সার্থক। এঁদের কেউ বাস্তবতার তাগিদে কেউ আন্তর-প্রেরণায়, কেউ বা আত্মার-আত্মীয় পরিজনসুলভ অন্তরঙ্গতায় কোন বিশেষ অঞ্চলের অপরিজ্ঞাত জীবনযাত্রার পরিচয় তাঁদের রচনায় তুলে ধরেছেন। তাঁদের সততা বা নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁদের বিচরণক্ষেত্র ছিল তাঁদেরই জন্মভূমি বা তৎসন্নিহিত কোন অঞ্চল। যার ভাষা, প্রকৃতি, আচার, আচরণের অনেকখানিই তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সাঙ্গীকৃত। ফলে মনের ঐকতান বেসুরো হয়নি। লেখককে তাঁর নিজের মানস পরিমণ্ডল ছেড়ে বিপরীত কূলে তরণী বাইতে হয়নি। এইখানেই সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে উল্লিখিত আঞ্চলিক লেখকদের পার্থক্য। কারণ তিনি যাদের কথা লিখেছেন শুধু যে তিনি তাদের একজন ছিলেন না তাই নয়, তাদের ভাষা, জীবন, আচার-আচরণ সব কিছুই অন্য প্রকৃতির। সতীনাথ জন্মসূত্রে বাঙ্গালী। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য মার্জিত বৈদগ্ধের। তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে নিবিড় অধ্যবসায়ের সাধনায়। শুধুমাত্র আকস্মিকভাবে রাজনীতিতে যোগদান করার পরই তিনি বিহারের গ্রামাঞ্চল এবং সেখানকার ব্রাত্যজনকে দেখবার জানবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু এই সকল অখ্যাতজনের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ কত গভীর ছিল তা বোঝা যায়, যখন দেখি কত নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের জীবনচর্যাকে তিনি সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে তুলে ধরেছেন। অভিজাত এবং কৃষ্টিসম্পন্ন বাঙ্গালী সতীনাথের পক্ষে বিহারের এক অখ্যাত গ্রামের অন্ত্যজ জনের জীবনযাত্রায় এমন সাগ্রহ রূপায়ণ সত্যই বিস্ময়কর। তারাশঙ্করও উচ্চ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনিও অবজ্ঞাত জনসাধারণের নির্বাক মনের কথা বাংলাদেশের আগ্রহী পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে তিনি যাঁদের কথা লিখেছেন তাঁরা ছিলেন তাঁরই দেশের মানুষ। মুখের ভাষা এবং সংস্কৃতির আপাত পার্থক্য সত্ত্বেও তারা একই মৃত্তিকার সন্তান। তারাশঙ্কর তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চাননি কখনও। জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন: “তারাশঙ্কর কুলধর্মে ব্রাহ্মণ ভূস্বামী শীলধর্মে সর্বভৌম মানবশিল্পী।”[১৮]

এই দরদী মানবশিল্পী তাঁর সংবেদনশীল নিরভিমানী মন নিয়ে রাঢ়

অঞ্চলের বিচিত্র ভৌগোলিক ও মানবিক সংস্কৃতির জগতে শৈশব, বাল্য, কৈশোর অতিবাহিত করেছেন। এই আঞ্চলিক পরিবেশ তাঁর সত্তায়, তাঁর সমগ্র চেতনায় অবিচ্ছেদ্যভাবেই সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর চারপাশের ভূ-প্রকৃতি, বিচিত্র জনজীবন এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাঁর সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছে। তাই এর স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখে। অপরপক্ষে, সতীনাথ যাদের কথা রূপায়িত করেছেন জন্মসূত্রে তিনি তাদের আত্মজন ছিলেন না। শৈশব-বাল্য-কৈশোর এদের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে। ফলে যখন তিনি কর্মসূত্রে এদের কাছাকাছি এলেন তখন সেই অভাবটুকু নিখাদ আন্তরিকতায় পূর্ণ করে নিলেন। যে অধ্যবসায় তাঁর জীবন ও চরিত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ তারই সাহায্যে গভীর নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণে এদের জীবনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত দেখে নিলেন। এই দিক দিয়ে সতীনাথের কৃতিত্ব যে অধিক এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

তারাশঙ্করকে প্রথম দর্শনে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন 'সাঁওতালী যুবক'। তিনি নিশ্চিত প্রত্যয়ে দাবি পেশ করেন বাগ্দী কাহার চাষীর সঙ্গে তাঁর ভালবাসার সম্পর্ক। লক্ষণীয় বিষয় এই যে তারাশঙ্করও সতীনাথের মতই রাজনৈতিক কারণে এই সকল মানুষের কাছাকাছি আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তারা তারাশঙ্করের মনের মানচিত্রের বাইরে ছিল না কোনদিনই। পক্ষান্তরে সতীনাথের এই সংযোগ নতুন মেরু আবিষ্কার করার মতই রোমাঞ্চকর। তাঁর এপিকধর্মী উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' জিরানিয়া (বিহারের এক গ্রাম অঞ্চল) অঞ্চলের মানুষের লোকচর্চা, লৌকিক জীবন তাদের প্রবাদ-প্রবচন, ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা-হাসি-রঙ্গ-তামাশা নীতিবোধ, সংস্কার, প্রথা যে অবিকল বাস্তবতায় চিত্রিত হয়েছে তা যে কোনো সৃজনশীল লেখকের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

সতীনাথ এক সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত জগতকে গভীর নিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ করেছেন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী, সংগঠক এবং পরিচালক হিসাবে কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো গোরুর গাড়ীতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শিক্ষাদীক্ষাহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন দরিদ্র গ্রামজীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছেন। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা প্রদর্শনের কোন আতিশয্য তাঁর রচনায় কোথাও প্রকাশ পায়নি।

আঞ্চলিক উপন্যাসে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে পাঠককে চমক দেবার একটা উগ্র ইচ্ছা অল্প শক্তিমান লেখকের ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু সতীনাথের উপন্যাসে কোথাও নিজেকে জাহির করবার প্রয়াস চোখে পড়ে না। তিনি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা, গভীর মনন এবং প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে রামচরিত মানসের নবরূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন। নিরাসক্ত সংযমে আনুপূর্বিক নিজেকে শাসিত রেখেছিলেন। নিজের ক্ষমতা ও লক্ষ্য সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনাও তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। 'ঢোঁড়াই'-চরিত্রটি নিয়ে তিনি অনেক ভাবনা ভেবেছেন। তিনি নিজেও এ-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'ঢোঁড়াইদের চরিত্র মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর। সেইটাকে চেয়েছিলাম এক গণ্ডূষ গল্পের মধ্যে ধরতে। পারিনি। এক সময়ে ভেবেছিলাম যতকাল বাঁচব ঢোঁড়াইদের মনের পরিবর্তনের রূপরেখা এঁকে যাব। মনে মনে এর পরের খণ্ডের নাম হবে ঠিক করেছিলাম 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত'। এ বিষয়ে নিজের অপর্যাপ্ততা ভালভাবে বোঝবার পর সে সংকল্প ছেড়েছি।"[১৯]

সুতরাং নিরভিমান মানুষটির জীবনে বা সাহিত্যে প্রদর্শনেচ্ছা কোন দিনই ছিল না। বাংলার পাঠকসমাজও এই নিরলস সাধক শিল্পীর সম্যক্ পরিচয় কোনদিন পাননি। যে 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'কে সতীনাথ নিজে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করতেন, রসজ্ঞ সমালোচক যে রচনার প্রতি সব সময়ই সশ্রদ্ধ থাকলেও বৃহত্তর পাঠক-সমাজ তার প্রতি আশ্চর্য বিমুখ থেকেছে। 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে'র প্রথম চরণের মাত্র দুটি মুদ্রণ হয়েছে। দ্বিতীয় চরণের পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন রসিক গুণিজন যাঁকে 'লেখকের লেখক' বলে বিস্ময়াভিভূত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বাংলার পাঠক তাঁকে চিরকাল উপেক্ষা করে গেছে। এই নির্মম উদাসীনতার মধ্যেই সতীনাথের বৈশিষ্ট্য-গুলি নিহিত আছে। সতীনাথ যে সকল ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাপেক্ষা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সেগুলিই জনসমাদর লাভে সর্বাধিক বঞ্চিত হয়েছে। 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে'র নিখাদ নিষ্ঠায় চিত্রিত নিশ্চিদ্র আঞ্চলিকতা এবং উপভাষার ব্যবহার বাঙালী পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। বাঙালী পাঠকের সুবিধার জন্য লেখককর্তৃক ফুটনোটের প্রয়োগের সৎ প্রয়াসও বিশেষ সম্বর্ধনা পায়নি, পরন্তু পাঠক আরও বেশী বিড়ম্বিত বোধ করেছেন।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিশেষ কোনো অঞ্চলের অপরিজ্ঞাত

জীবনযাত্রার বিষয় নিয়ে রচিত আঞ্চলিক উপন্যাসের সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক পূর্বাহ্নেই পরিচিত ছিল। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভূখণ্ডের জীবনযাত্রা, উপভাষার সম্পর্কে অস্বাচ্ছন্দ্য এত প্রকট ছিল না। কারণ তা ছিল বাংলারই ভৌগোলিক সীমার অন্তর্গত, অপরিচিত হলেও তা একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল নয়। কিন্তু বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে বিহারের গ্রামজীবনের বস্তুনিষ্ঠ অথচ রসস্নিগ্ধ আলেখ্যটি হিন্দুস্থানী উপভাষার বহুল প্রয়োগে ফুটনোট থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালী জনসমাজের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাল। বাঙ্গালী পাঠকের একটি গরিষ্ঠ অংশ যে স্বচ্ছন্দ রম্যতার আস্বাদনকারী তারা এই আয়াস স্বীকার করে নিতে রাজী হলেন না। কিন্তু যথার্থ রসসন্ধানী সহৃদয় পাঠক যখনই এর আপাত-দুরূহতাকে অতিক্রম করে গেছেন তখন এই বিশাল সুমহান কীর্তিকে তাঁরা শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিতে ভোলেন নি। কারণ শুধুমাত্র আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবেই 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে'র সমকক্ষ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি রচিত হয়নি। অঞ্চলচেতনা এই উপন্যাসের মর্মমূলে গ্রথিত। বাংলায় রচিত অন্যান্য স্বীকৃত আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির সঙ্গে এর একটা প্রভেদ আছে। সাহিত্যিক ও সমালোচক গোপাল হালদার বলেছেন : "ভাষায়, ভাবে, কথায় ইডিয়মে, আচরণে লোকসমাজের সকল দিকের পরিচয় ঢোঁড়াইচরিত মানসে সযত্নে বিধৃত। বাঙ্গালী আঞ্চলিক সাহিত্যের ধারায় নিশ্চয়ই 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' তাই অগ্রগণ্য। আঞ্চলিক সত্যের উপর 'পদ্মানদীর মাঝি'ও এতটা নির্ভরশীল নয়—তাতে পদ্মানদীর আবহাওয়া এত গুরুতর নয়, অপরিহার্যও নয়; 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'ও নয়—উত্তর রাঢ়ের ভাষা-ভাব-কর্ম অনিবার্যভাবে করালী ও বনওয়ারী সৃষ্টি করে না ও সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া'ও নয়।—ওসব উপন্যাসে আঞ্চলিকতা কতকটা আভাসিত করাই লেখকরা নিজেদের প্রয়োজন মনে করেছিলেন, তাতেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে' আঞ্চলিকতা বাতাবরণ নয়, আবহাওয়া নয়, আঞ্চলিকতাই উপন্যাসের বিষয়বস্তু, কথা ও জিরানিয়ার জীবন ধর্মের বিবরণ; বিশেষ অঞ্চলের স্বাদগন্ধ ভাষা ভাব মিশে সার্থকভাবে তা সৃষ্ট হয়েছে। জীবনচর্যার প্রতি এরূপ বিশ্বস্ততা ছাড়া এ স্বাদ গন্ধ লাভ করা যেত না।"[২০]

'ঢোঁড়াইচরিত মানস' উপন্যাসের নির্বাচিত কিছু অংশ থেকে এর অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করার প্রয়াস করা যেতে পারে। উপন্যাসের

প্রারম্ভেই লেখক একটি বিশেষ অঞ্চলের চিত্ররূপময় বর্ণনা দিয়েছেন: "অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরোনিয়া। 'রামচরিতমানসে' এর নাম লেখা আছে, জীর্ণারণ্য।...তখনও যা ছিল, এখনও প্রায় তাই। বালিয়াড়ি জমির উপর ছেঁড়া ছেঁড়া কুলের জঙ্গল। রেলগাড়ী ইষ্টিশানে পৌছবার আগেই ঘুমন্ত যাত্রীদের ঠেলে তুলে দিয়ে লোকে বলে 'জঙ্গল আ গেয়া' জিরানিয়া আ-গেয়া' (জঙ্গল এসে গিয়েছে, জিরানিয়া এসে গিয়েছে)।

তাৎমাটুলির লোকেরা একেই বলে 'টৌন' (টাউন) যেমন তেমন হেঁজিপেঁজি শহর নয়—ভারী সাহার, পীরগঞ্জ থেকেও বড়, বিসারিয়া থেকেও বড়। পীরগঞ্জে কলস্টর (কালেক্‌টর) সাহেবের কাছারি আছে? বিসারিয়ায় ধরমশালা আছে? পাত্রী সাহেবের গীর্জা আছে? ভা-আ-রী সাহার জিরানিয়া। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাস্তা দিয়ে টমটম যায়; পাকা রাস্তা দিয়ে। দোতলা বাড়িও আছে, পাকা দোতলা। চেরমেন (চেয়ারম্যান) সাহেবের।"

এই জীবনানুগ বর্ণনায় জিরানিয়া এবং তাৎমাটুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে এখানকার অধিবাসীদের জীবনাচরণ 'রামকথার'ই মত বিস্তৃত ও মহিমান্বিত রূপে কুশলী লেখনীতে প্রকাশ পেতে থাকে। বাংলা-দেশের স্নিগ্ধ শান্ত ছায়া সুনিবিড় গ্রাম বর্ণনার ঐতিহ্য থেকে সরে গিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক জগতকে সতীনাথ বাংলার পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন। বাস্তব সচেতন শিল্পীর তুলিতে বিহারের প্রকৃতিগত রুক্ষতা ও দৈন্যপীড়িত মানুষগুলি নির্মম নিস্পৃহতায় বর্ণিত হল এইভাবে: "তাৎমাটুলিতে ঢুকতে হবে পালতেমাদারের ডাল থেকে মাথা বাঁচিয়ে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার বাইরের দুর্গন্ধটা ঢেকে যায়—শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধে। খড়ের ঘরগুলো বাঁকা নড়বড়ে। দেশলাইয়ের বাক্‌স পায়ের তলায় চেপটে যাবার পর ফের সোজা করবার চেষ্টা করলে যেমন হয় তেমনি দেখতে। ফরসা কাপড় পরা লোক দেখলে, এখানকার কুকুর ডাকে; কোমরে ঘুনসি বাঁধা ল্যাংটো ছেলে ভয়ে ঘরের ভিতর লুকোয়; বাঁশের মাচার উপর যে কঙ্কালসার রুগ্ন বুড়োটা ল্যাংটো হয়ে রোদ্দুরে শুয়ে থাকে, সেও উঠে বসতে চেষ্টা করে আদাব করবার জন্য।"

লেখকের জাগ্রত দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা পরিবেশ বর্ণনায় জীবনরসের এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদ নিয়ে আসে। এই পরিবেশ বর্ণনার পরেই জীবিকার এবং জীবনযাত্রার প্রশ্ন আসে। সতীনাথ স্বল্পকথায় তারই এক বিশ্লেষণাত্মক

বিবরণী উপস্থিত করেছেন : "তাৎমাটোলার লোকেরা বলে—রোজা, রোজগার, রামায়ণ, এই নিয়েই লোকের জীবন। 'অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে এদের দরকার রোজার। রোজাকে বলে গুণী। রোজগার এদের 'ঘরামি'র কাজ আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়িরই খোলার চাল, আর প্রত্যেক বাড়িতেই আছে কুয়ো। তাই কোনো-রকমে চলে যায়। লেখাপড়া জানে না, কিন্তু রামায়ণের নজির এদের পুরুষের কথায় কথায় বিশেষ করে মোড়লদের। অধিকন্তু, কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ জনসমাজের যে নিজস্ব লৌকিক কতকগুলি ধ্যানধারণা বিশ্বাস থাকে লেখক সেগুলির কথাও সাগ্রহে উল্লেখ করতে ভোলেননি। সেসব গ্রামের সবাই জানে—আশ্বিনের পরে জ্বর হয় বাতাবিলেবু খেয়ে আর আশ্বিনের আগে জ্বর হয় পেয়ারা খেয়ে। কিংবা বৌকামাই মারা যাওয়ার সময় বৌকাকে যখন উপদেশ দেয় : "পীপড় (অশ্বথ) গাছ কোনদিন কাটিস না। ধাঙড় টোলার 'কর্মাধর্মা'র নাচ দেখতে যাস না ...নারকেলের মালা যেখানেই দেখবি তুলে নিস্ ও এঁটো হয় না।"

তাৎমাদের চিকিৎসা মানে ঝাঁড়ফুক, তুক্‌তাক, জড়িবুটি আর টোটকা। এরা সূর্যকে বলে গোঁসাই। এদের বিশ্বাস বাঁশঝাড়ে ফুল ধরা অমঙ্গলের সূচক। অমাবস্যার অর্ধেক রাত্রিতে কন্ধকাটা ভূতের দল বলে—জলে ডুবে মরলে হয় পানডুব্বীভূত। জোনাকী পোকা আসলে খোকাভূতদের চোখ।

এছাড়াও রয়েছে স্থানীয় দেবদেবীর জন্ম ইতিহাস। "একজন পশ্চিমা ফৌজের লোক বহুদিন আগে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে না পেন্সন নিয়ে জিরা-নিয়ার বাজারে একটা রামজীর মন্দির বানিয়েছিলেন। সে যুগে তাঁকে লোকে বলত 'মিলিট্রি বাওয়া'। তাঁর একটা পোষা চিতাবাঘ ছিল। তারই হাতে নাকি 'মিলিট্রি বাওয়ার' প্রাণ যায়। মন্দিরের উঠোনে তাঁর বাঁধানো সমাধি-স্থান আছে। আর এই মন্দিরের নাম হয়ে যায় 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ি'।"

স্থানীয় প্রবাদও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে মুখের কথায়। যেমন : "পেট খারাপ করে মুড়ি, আর ঘর খারাপ করে বুড়ি।" বিবাহাচারের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় ঢোঁড়াই-রামিয়ার বিবাহ প্রসঙ্গে : "তাৎমাটুলির বিয়েতে যারা বরপক্ষ, তারাই কন্যাপক্ষ। ঐ মাহাতোগিন্নী, রতিয়া ছড়িদারের বৌ, দুখিয়ার মা, হারিয়ার বৌ, এরাই পানাকাটিতে যায় ফৌজী ইঁদারা তলায়; এরাই 'গোঁসাই জাগাবার গান'

গায় বিয়ের আগের দিন ; তাদেরই বাড়ির পুরুষরা বরযাত্রী হয়ে এলে সঙ্গে সঙ্গে 'দুয়ার লাগার' অশ্লীল গান আরম্ভ করে।" সতীনাথ ভাদুড়ী বিবাহের সকল খুঁটিনাটি বিষয়েরই বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন : "পাঁচ এয়োতে তেল সিঁদুর গুলে মাটিতে পাঁচটা ফোঁটা দেয়। নাপিত ঢোঁড়াইয়ের আঙুল চিরে রক্ত বের করে দুটো পানের খিলিতে লাগিয়ে দেয়। এইবার নাপিত ধরেছে শক্ত করে রামিয়ার হাতখান, এই নরুন দিয়ে চিরে দিল। টপ টপ করে রক্ত পড়ছে পানের খিলির ভিতর। খুব শক্ত মেয়ে যাহোক। এ পর্যন্ত যত মেয়ের বিয়ে দেখেছে ঢোঁড়াই ছোটবেলায়, সকলেই এই সময় ভয়ে চোখ বুঁজে ফেলে। রামিয়া একবার ভুরুটি পর্যন্ত কোঁচকাল না। আলবৎ হিম্মং বটে। রক্ত দেওয়া পানের খিলি ঢোঁড়াই খাওয়ার রামিয়াকে।"

এই সকল বিবাহের আচার ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন মেয়েলী গীত যা সেই অঞ্চলেরই নিজস্ব সম্পদ। অঞ্চলবিশেষের এমন নিখুঁত অথচ নিরাসক্ত প্রতিচ্ছবি বাংলা উপন্যাসের তালিকায় খুব সুলভ নয়। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' সতীনাথের জীবনের দুর্লভ অভিজ্ঞতার সার্থকতম ফসল। কি গভীর অধ্যবসায় এবং অনুরাগ তন্ময়তায় এই অভিজ্ঞতাকে তিনি কথাসাহিত্যে রূপ দিয়েছেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এ বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য "আঞ্চলিক উপন্যাসে সচরাচর বিশিষ্ট লাক্ষণিকতার অনুপুঙ্খময় বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক হয়ে যান প্রকৃতিবাদী স্বভাবের। অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বলে, দুরূহ অভিজ্ঞতায় যা অর্জন করেছেন তার কোন অংশই বর্জনে মন সায় দেয় না। সতীনাথ সেই প্রকৃতিবাদী চোরাবালিতে একেবারেই ধরা পড়েননি। তাঁর 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'-এ আঞ্চলিকতা বাস্তবিকতারই অন্য নাম, বস্তুনিষ্ঠার শর্ত বজায় রাখার প্রয়োজনে লেখককে নিরুপায় ভাবে আঞ্চলিক লক্ষণকে তুলে ধরতে হয়েছে। এই উপন্যাসে কোথায়ও উগ্র প্রদর্শনেচ্ছার প্রমাণ আমরা পাই না। মানব প্রেমে তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি প্রখর হয়েছে, নিরাসক্ত অথচ সহৃদয় দৃষ্টিতে তিনি যেমন ব্যক্তি মানুষকে তেমনি মানবগোষ্ঠীকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, পর্যবেক্ষণ করেছেন মৃদু, মর্মস্পর্শী কৌতুকের দৃষ্টি দিয়ে।"[২১]

সতীনাথ ভাদুড়ীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। তিনি আজীবন প্রবাসী ছিলেন। বিহারের পূর্ণিয়া জেলাতেই সতীনাথের জন্ম, কর্মস্থল এবং সাহিত্যসাধনা। মৃত্যুও ঘটে এই পূর্ণিয়া জেলাতেই।

যৌবনে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন এবং অনেকবার কারাবরণ করেছেন। এই রাজনৈতিক জীবন তাঁকে মানুষের কাছাকাছি আসবার সুযোগ করে দিয়েছিলো। তিনি বিহারের পথঘাট, মাঠ প্রান্তর,জনজীবন ও তাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভক্তি-সংস্কারের সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেও জনমানস থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েননি। বিহারের সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনাচরণের সঙ্গে সতীনাথ নিজেকে আজীবন সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। কি গভীর মমতায়, অপরিসীম শ্রদ্ধায় ও যত্নে তিনি তাঁর উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রগুলিকে গড়ে তুলেছেন তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বিহারের গ্রামের মানুষের মুখের ও হৃদয়ের ভাষা তাঁর সাহিত্যকর্মে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

তাঁর সর্বাধিক প্রচারিত উপন্যাস 'জাগরী' মূলতঃ রাজনৈতিক আবরণে মানবীয় ইতিহাস। মনে রাখতে হবে আগষ্ট আন্দোলনের দোলা বিহারে যথেষ্ট গভীরে পৌছেছিল। বিশেষতঃ উত্তর বিহারে তার প্রভাব বেশ স্পষ্ট। পূর্ণিয়া শহর তাঁর অন্যতম প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ ছিল। জনজীবনের কোন প্রত্যন্তে যে তা সাড়া জাগিয়েছিল 'জাগরী' উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে তার সাক্ষ্য রেখে গেছে। এই উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলির কথা বাদ দিলেও মেহেরচন্দজী, চন্দ্রদেও, সহদেও, কপিলদেও, দুবেজী, ভূষণপ্রসাদ প্রভৃতি চরিত্র কিংবা জেল ওয়ার্ডের পরিচারিকা বা পরিচারকেরা স্থানীয় জনসমাজের প্রতিভূ রূপে উপস্থিত।

সতীনাথ নিজে এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন "স্থানীয় বর্ণ বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অনেক স্থলে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।" শুধু হিন্দী ভাষাই নয়, এই হিন্দীভাষী মানুষগুলির জীবনাচরণের সবটুকু নির্যাস তিনি সাগ্রহে পাঠকের জন্য সংগ্রহ করেছেন। বিহারের প্রধানতঃ কৃষিজীবী সরল মানুষগুলির আচার আচরণ,রীতি নীতি,সংস্কার উষ্ণ আবেগে সতীনাথের বিভিন্ন গ্রন্থে একান্ত ভাবে লিপ্ত হয়ে আছে। সতীনাথের বাঙ্গালী চেতনা মূলতঃ প্রবাসী বাঙ্গালীদের কেন্দ্র করে বিবর্তিত। তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধ্যান ধারণা বাংলাদেশের প্রতি অস্ফুট মমতা এবং এদেশের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সংস্পর্শের ফলে এদেশীয় আচার সংস্কারের অনুবর্তন প্রভৃতি বিচিত্র মানসিকতা সতীনাথ আশ্চর্য মুন্সীয়ানায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিহারের স্থানীয় জনসাধারণ, বিহার প্রবাসী বাঙ্গালী এবং বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙ্গালীই মূলতঃ সতীনাথের রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও সতীনাথের ভ্রমণ অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু সম্পূর্ণ অন্যদেশী চরিত্র রয়েছে।

'জাগরী' উপন্যাসে 'আওরৎ কিতা'য় অবস্থানকারিণী মায়ের চরিত্রটি সহজ আন্তরিকতায় অনন্য। এমন নিবিড় দরদে এই মাতৃচরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে যে সমগ্র উপন্যাসের রসাস্বাদন এক অসাধারণ মানবিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ চরিত্রটি সম্পর্কে সতীনাথ কোথাও ভাবালুতার প্রশ্রয় মাত্র দেননি। নিতান্তই সাধারণ মানুষ বিলু-নীলুর মা। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুকৌশলে লেখক এক প্রবাসী বাঙ্গালী মায়ের চরিত্রের বিভিন্ন দিকের মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ করেছেন। অকারণ মহিমা আরোপিত হয়নি বলেই এত জীবন্ত, উষ্ণ মমতামেদুর এই চরিত্রটির তুলনা বাংলাসাহিত্যে খুব বেশী নেই।

পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রে বিধৃত 'জাগরী' উপন্যাসটিতেও সতীনাথের স্থানীয় চেতনা প্রখর। মূল চরিত্রগুলির স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে বিহারের সাধারণ মানুষ, লৌকিক আচার-আচরণ এবং সর্বোপরি প্রবাসী বাঙালীর নিখুঁত মনস্তত্ত্ব। পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটিও লেখকের ব্যগ্র সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায়নি। এরূপ একটি সরস পারিবারিক চিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক মায়ের আবেগানুভূতির সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন: "আমি আর নীলু রান্নাঘরের দাওয়াতে খাইতে বসিয়াছি। মা পরিবেষণ করিতেছেন, পরিবেষণ করিয়া মা আমাদেরই সঙ্গে খাইতে বসিবেন। আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, মা, জানো জ্যাঠাইমা তিলবাঁটা দিয়ে একরকম এমন সুন্দর ঝিঙের ঝোল রাঁধেন? 'তা সেখানে খেলেই পারো। এখানে আর খাওয়ার দরকার কী?' কী কথার কী উত্তর। মা স্বভাবতই মিষ্ট-ভাষিণী। তাঁহার কথার এই আকস্মিক ঝংকার আমাকে অবাক করিয়া দিয়াছিল। নীলু হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আজকে মাকে বলেছি কি না যে, তুমি জ্যাঠাইমাকে মা বলো, তাই মা চটেছে।' দেখলে না 'তুমি' বললেন। সত্যই মা বেশি রাগ করলে আমাদের 'তুই' বলেন না।"

অসাধারণ স্নেহময়ী মায়ের এই দুর্বলতাটুকু নিঃসন্দেহে ক্ষমার্হ এবং জীবনানুগ। এই স্নেহের টানেই তিনি সন্তানদের মঙ্গলকামনায় বিভিন্ন ব্রত, উপবাস করেন। চরম মুহূর্তের পূর্বে বিলুর মায়ের ভগবানের কাছে

অসহায় আর্তি, নিঃশর্ত সমর্পণ আর অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি পাঠককে অশ্রুসজল করে তোলে। পরিপূর্ণ মাতৃচরিত্রটি আশ্চর্য ভাবে বিধৃত হয়েছে প্রতিটি ছত্রে ছত্রে : "সবই ভগবানের হাত। সেই ভগবানকে আমি কী হেনস্তাই করেছি। মা পূর্ণেশ্বরী, আমায় সব দোষত্রুটি ক্ষমা করো। তোমারই দয়াতে তো বিলুকে কোলে পেয়েছিলাম তোমার নামেই তো বিলুর নাম রেখেছিলাম পূর্ণ। বাড়িসুদ্ধ সবাই তোমার মন্দিরের মহাপ্রসাদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বলেই কি তুমি আমার উপর বিরূপ? বিলুর অসুখের সময় যে মানত করেছিলাম, সে পূজো পূর্ণেশ্বরীর ওখানে দিয়েছিলাম তো?" মায়ের ভীরু মনে কত সংশয় : "বরহমথানে বিলু হওয়ার সময় যে ইঁটটা বেঁধেছিলাম, তা খোলা হয়েছিল তো?…" স্নেহদুর্বল মায়ের আকুলতার মধ্য দিয়ে লেখক লৌকিক বিশ্বাস, আচার-আচরণের একটি সুন্দর ছবি আমাদের উপহার দেন। জনজীবনের গভীরের সঙ্গে সংযোগ থাকলেই এমন বিশ্বস্ত জীবনচর্যার পরিচয় রচনা করা যায়।

তিনি স্থানীয় বিবাহাচারের বর্ণনাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন : "নীলু, বল্‌ল, এবার কিন্তু দাদা, বকুড়ীকে পাঁচ ঠেংটা আর বাজাব না। তকই-কে-তাকা তুম মকই-কে লাওয়াটাও না। এবার বিয়ের সময়ের গানটা হবে।' দুজনে বাজাতে লাগল। বিলু গাইছে 'কপিলদেওকে পাঁচ বিয়া, ছঠমা চুমৌনা।" বিলু বরপক্ষ। আর উঠোনের অন্য কোন থেকে কন্যাপক্ষ নীলু পাল্‌টা জবাব দিচ্ছে,' বাজাতে বাও ধাই ধাই কপিলদেওকে বহুকে ছঠৈয়া সাঁই।" এই প্রকার 'ফুটনোট' সম্বলিত অজস্র প্রথাই শুধু নয়, প্রবাদ-প্রবচনও এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন 'লিয়ে দিয়ে সাফ' (ঢাকাসুদ্ধ বিসর্জন) তখন্ত্‌ ইয়া তখ্‌তা (সিংহাসন অথবা ফাঁসির মঞ্চ) ইত্যাদি।

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে স্থানীয় সব আচার-বিচার মেনেও বিলুর মায়ের স্নেহ দুর্বল মনে বাঙালীয়ানার অহংকার ও সংস্কার ছিল অটুট। প্রবাসী জীবনে এ-এক বিরল ঐশ্বর্য। "এরা কি একটা ভালো মিষ্টি তোয়ের করতে জানে? জেলে দেখছি তো। আর ওদের দেশেই তো জীবনটা কাটিয়ে দিলাম কিছু জানতে তো আর বাকি নেই। মিষ্টির মধ্যে ঐ এক 'পুয়া' সব পূজোয় আচ্চায়, ঝোলে, অম্বলে সবঘটে আছে। জলে একটু আটা গুলে নিয়ে তাতে একটু গুড় দিয়ে কোনোরকমে ভেজে ফেলতে পারলেই হয়ে গেল 'পুয়া'। না আছে রসে কেলা, না আছে কিছু। দুটো

জিনিস মিলিয়ে তরকারি রাঁধো, ওরা আঁতকে উঠবে। আর তারই সঙ্গে আমি আমার বিলুর বিয়ে দিতাম। এতো আর একদিন দুদিনের কথা নয়। সারা জীবন রসুন আর গোলমরিচ খেয়ে কি আর বাঙ্গালীর ছেলে বাঁচতে পারে ?"

বিলুর বাবার স্মৃতিচারণার মধ্যেও বিহারের অধিবাসীদের সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে : "বিহারে যে অল্প ইংরাজীও শিখিয়াছে সেও মা, বাবা, বোন এই শব্দগুলি নিজের ভাষায় বলিবে না। কাহারও শুনিবে সিষ্টার কী সাদী হইবে। কেহ মাথা নেড়া করিয়াছে কারণ জিজ্ঞাস করো, বলিবে মাদার কী ডেথ হো গয়ী। কথার মধ্যে ইহারা যে বেশি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করে তাহা নয়। তবে বাবুজী, মা, বহীন এই শব্দগুলি নিজের ভাষায় বলিতে কেমন যেন সংকোচ বোধ করে।"

অক্ষর পরিচয় সম্পন্ন এই সরল লোকগুলি ছাড়াও সতীনাথ একেবারে নীচের তলার মানুষগুলির কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে ব্রাত্য এরা নিজেদের ভাগ্যকে নির্বিচারে মেনে নিয়েছে। মানুষের সৃষ্ট সামাজিক বিধান শুধুমাত্র জন্মের অপরাধে সারাজীবন বয়ে বেড়াচ্ছে। প্রশ্নহীন এই সমাজের মর্মস্থলে সতীনাথের দরদী মন অনায়াসে সঞ্চরণ করে ফিরেছে। রাজনৈতিক জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পরবর্তী কালের বিভিন্ন রচনায় সম্মিত আত্মপ্রকাশ করেছে।

শুধু উপন্যাসে নয় বিভিন্ন গল্পেও এর অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। আমাদের সমাজের বিশেষতঃ শ্রেণীবৈষম্য বিহারের জনজীবনে এবং তার প্রেক্ষাপটে তথাকথিত অন্ত্যজের গোষ্ঠীসমস্যা সতীনাথের রচনায় একটি বিশেষ বিষয়। তাঁর 'ঢোড়াইচরিত মানস' উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে এইরকমই একটি মানুষ, যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'জাগরী' ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও অবহেলিত শ্রেণীর প্রতিভূরূপে বাদর বারহ-গামিয়ার বৃদ্ধা মায়ের নিবিড় সজল কাহিনী লেখক আমাদের উপহার দিয়েছেন। তারই একটুকরো : "রহুয়া গ্রামের ভিতর রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে এক বৃদ্ধা, আর কতকগুলি অর্ধোলঙ্গ বালক বালিকা। শুনিলাম বাদর বাহরগামিয়ার মা জাতে মুচি। গ্রামের ভিতর থাকিবার প্রথা নাই সেই জন্যেই তাহাদের বলে 'বাহরগামিয়া'।

"বৃদ্ধা সংকুচিতভাবে আমাকে বলে আপনাকে তো খাতিরদারি কিছু

করিতে পারিলাম না।

"বলি—'এক লোটা পানি পিলাও মাই একদম ঠণ্ডা'। দেখি তোমার কূয়োর জল কেমন। বৃদ্ধা যেন এই অপ্রত্যাশিত অনুরোধে কী করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মুখে সম্মান অপেক্ষা ভীতির চিহ্নই অধিক পরিস্ফুট। জনতার মধ্যে তাহার গ্রামের যে সকল লোক আছে, তাহাদের মুখের দিকে প্রশ্নের ভঙ্গিতে তাকায়। এই কূয়ার জল মাষ্টারবাবুর বেটা খাইবে নাকি? গ্রামের আর কেহ তো ইহার জল ব্যবহার করে না। বলে কী? সে জল আনিয়া দিবে, তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।"

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখেও মানুষের জাতিভেদ কত প্রকট তা নিপুণভাবে 'বন্যা' গল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে। কুশীর দুকূলভাঙ্গা প্লাবনের আলোড়ন থিতিয়ে এলেই মানুষের স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করল। জীবন বেঁচে যাবার পর জীবনধারণের প্রশ্ন যখন মাথা তুলল তখনই শুরু হল সেই চিরাভ্যস্ত শ্রেণীভেদ প্রথা। "গেরস্ত বাড়ীর লোকেরা খাইতে বসিল বাড়ির আঙিনায়; মুসহর, ধাঙর, বাঁতার, তাৎমারা বাহিরের বৈঠকখানার।...মুসলমানরা উঠিয়াছে মসজিদের বারান্দায়।...উচ্চ-বর্ণেরা উঠিয়াছে নৌখে ঝার বাড়িতে।... নিম্নবর্ণেরা উঠিয়াছে সুমুৎ তিয়রের বাড়ি।" এ ছাড়াও বিহারের কায়স্থ সমাজের বিবাহ সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিচারের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় 'ভূত' গল্পে।

এমন চরিত্র আছে যাদের আমরা আমাদের পরিচিতি পরিমণ্ডলে খুঁজে পাই না। 'জলভ্রমি' গল্পের হাসানু শীর্ষবাদিয়া যার শিরায় উপশিরায় ঝিমিয়ে পড়া হাবসীরক্ত কিংবা পাঞ্জাবের ধর্মান্ধ বৃদ্ধের 'ব্যর্থ তপস্যা' অথবা বোম্বাই-এর পরিসংখ্যান বিশারদ শ্রীবাল্টিয়ালার 'শেষ সংখ্যান' এমনকি নেপালের সস্তা গাঁজার চোরাকারবারী পোষ্টমাষ্টারের 'দাম্পত্যসীমান্তে' গল্পেও সতীনাথের নিশ্চিত সচ্ছন্দ পদক্ষেপ। তিনি নিখুঁত মুন্সীয়ানায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনজীবনকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। তাই বাংলা ছোটগল্পের পরিচিত পরিবেশের তুলনায় স্বাদবৈচিত্র্যে তাঁর গল্পগুলি অভিনবত্বের দাবী রাখে।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে জড়িত ছিলেন না। তাঁর বাংলাদেশ সম্পর্কে ধ্যানধারণা মূলতঃ প্রবাসী বাঙ্গালীদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এরকম অনেক চরিত্র তাঁর গল্পে উপন্যাসে আমরা পেয়ে থাকি। বৃহত্তর সমাজবোধে ভাবিত সতীনাথ

আমাদের সমাজ-জীবনের সকল অসঙ্গতিকে আঘাত করেছেন। বিদ্বেষ না থাকলেও তীব্রতার অভাব তাতে নেই। সংযত হৃদয়াবেগে তিনি গোটা ভারতবর্ষকেই আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁর মূল সাহিত্য প্রেরণার শিকড়টি প্রোথিত ছিল যদিও বিহারের রুক্ষ প্রকৃতি আর তার অনগ্রসর মানুষগুলির চিত্তেই। সতীনাথকে স্মরণ করে তাঁর গুণগ্রাহী শ্রীসুধাংশুকুমার চক্রবর্তী বলেছেন: "পূর্ণিয়া ও পূর্ণিয়ার লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোকদের যেমন জানতে পেরেছি সতীনাথের লেখার মাধ্যমে, সতীনাথ ভাদুড়ীকেও বার বার খুঁজে পেয়েছি ধামদাহা হাটে ('চকাচকী' গল্প) নাগর নদীর নড়বড়ে পুলের পাশে, আরুয়াখোয়া বাজারে ('গণনায়ক' গল্প), কুশী নদীর বন্যার পটভূমিকায় রহিতপুরা গ্রামে, হরিণকোল সড়কে ('বন্যা' গল্প) গোবরাহর ঘূর্ণী রিলিফ ক্যাম্পে, ডিউরাস্তার বেড়ায় ঘেরা ধবধবে চূণকাম করা 'আণ্টা-বাংলায়' বা ভঁইসদিয়ারার চরে। সৃষ্টি আর স্রষ্টার এত ঘনিষ্ঠ একাত্মতাকে খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা যায়।"[২২]

সতীনাথের সঙ্গে বিহারের সম্পর্ক এতই নিবিড় যে তাঁকে সাহিত্যসেবিকা আশাদেবী 'বিহারের লেখনী চিত্রকর' বলেছেন: "বিহারের গ্রাম, তার সাদা মাঠ। মানুষগুলো, তার জলাজঙ্গল, উষর অনুর্বর খোয়াফেলা রাঙা পথ, তার ফুলে ভরা অড়হরের ক্ষেত তাঁর লেখাতে নতুন একটি স্বাদে এনে দিয়েছে।"[২৩]

এই একান্ত সত্যটি যেমন সতীনাথের সাহিত্যিক সার্থকতার অন্যতম কারণ, তেমনই অনুরূপ কারণেই অভ্যস্ত বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত পরিবেশ এবং মানুষজন তাঁর জনপ্রিয়তার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, লোকচরিত্র জ্ঞান এবং তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি গভীর মনোনিবেশ সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য সৃষ্টিকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি জনমানসে আশানুরূপ সমাদৃত না হলেও, সাহিত্য বিচারে তার রচনা বিশেষত্বে চিহ্নিত একথা স্বীকার অবশ্যই করতে হয়।

পাদটীকা

১। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ: 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার' পৃ. ৪৭৪।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: 'আমার কালের কথা': পৃ. ৪৫২।

৩। ঐ 'হাসুলীবাঁকের উপকথা' [১৩৫৪] : পৃ. ৪৫২।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'সাহিত্য'।

৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'আরণ্যক'।

৬। ঐ : 'দেবযান'।

৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : 'লেখকের কথা' পৃ. ৩১।

৮। ঐ : 'পদ্মানদীর মাঝি' : পৃ. ৪০।

৯। ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' [৪] পৃ. ২৯০।

১০। জ্যোতিপ্রসাদ বসু সম্পাদিত : 'গল্প লেখার গল্প' : পৃ ৫৪-৫।

১১। দ্রষ্টব্য ৭নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৩০।

১২। Buddhadev Basu : 'An Acre of Green Grass [1948] p. 85.

১৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' : পৃ. ১৯৩।

১৪। জগদীশ ভট্টাচার্য : 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছের ভূমিকা' : পৃ. ৬১।

১৫। প্রাগুক্ত।

১৬। David Cecil : 'Hardy the Novelist'

১৭। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : 'আমার সাহিত্য জীবন'।

১৮। দ্রষ্টব্য ১৪নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৪৬।

১৯। শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত : 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী' ২য় খণ্ড : পৃ. ৪৯২।

২০। গোপাল হালদার : সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য ও সাধনা' পৃ. ৬৪।

২১। ড. অশ্রুকুমার সিকদার : 'আধুনিক এপিক : 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ['শারদীয় পরিচয়'] : পৃ. ২২৯-৩০।

২২। 'সতীনাথের সাহিত্য পূর্ণিয়া' : 'সতীনাথ স্মরণে' পৃ. ১৩৩

২৩। 'সতীনাথ ভাদুড়ী' 'অমৃত' :

★

পরিশিষ্ট

ক. শব্দসূচী